একাদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১

উদ্দালক

সম্পাদক : প্রত্যুষকুমার জানা

উদ্দালক

ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

শারদ সংখ্যা-১৪১৮

দশম বর্ষ ২য় সংখ্যা—জুলাই-ডিসেম্বর—২০১১

সম্পাদক
প্রত্যুষকুমার জানা

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা ৭০০ ০৪৯
দূরভাষ: (০৩৩) ২৫৪১-৪৬১৭, ভ্রাম্যমান দূরভাষ-৯০৫১৮৮৯৩২৬

উদ্দালক সাহিত্য পত্রিকা

সভাপতি
ডঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল

সম্পাদন সহায়ক
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কিংকর মণ্ডল

প্রচ্ছদ
সুবীর সাউ

মূল্য : ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
পাতিরাম, দেজ
প্রজ্ঞাবিকাশ। কলেজ স্ট্রিট

উদ্দালক পাবলিশিং হাউসের পক্ষে সন্তোষ কুমার মণ্ডল কর্তৃক ১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা ৭০০ ০৪৯ থেকে প্রকাশিত এবং সুকান্ত ঘোষ, নবলোক প্রেস ৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬ কর্তৃক মুদ্রিত।
দূরভাষ: (০৩৩) ২৫৫৪-৮২৮৭

সম্পাদকীয়

নিসর্গ-প্রকৃতিতে দেবীদুর্গার আগমনির সুর তারই মাঝে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সিকিম ও উত্তরবঙ্গ। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় ভাবিত বিশ্ব- সমগ্র-রবীন্দ্র রচনায় যে সম্ভাব্য আশঙ্কার কথা ব্যক্ত আজকে মর্মে মর্মে তার বাস্তব প্রতিফলন।

গত 'মহাকাব্য' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পর বেশ কিছু গবেষক, ভবিষ্যৎ অধ্যাপনার স্বপ্নসন্ধানী নবীন প্রাবন্ধিকদের প্রবল আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই উদ্দালকের বর্তমান সাধারণ সংখ্যার পরিকল্পনা।

মেঘনাদবধকাব্যের দেড়শত বৎসর পূর্তির কথা স্মরণে রেখেই পিছনে ফিরে তৎকালীন সমালোচনার ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস যেমন এখানে আছে, তেমনি আশালতা সিংহের জন্মশতবর্ষে তাঁর সাহিত্য কীর্তির পরিচয় বিবৃত হয়েছে। পৌরাণিক ভীষ্ম বহু আলোচিত না হয়ে— 'কাব্যে উপেক্ষিত,' তা সত্ত্বেও চার জন কবির কবিতায় তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে বিদগ্ধ অধ্যাপকের কলমে। নবীন প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে উঠে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী ও কুসুম। তা ছাড়াও বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিকের বিচিত্র, মূল্যবান প্রবন্ধে ভরে উঠেছে উদ্দালকের শারদ সংখ্যা।

উদ্দালকের প্রতিটি প্রবন্ধ লেখকগণের নিজস্ব অভিমত প্রসূত, সম্পাদক হিসাবে যথাযথ ভাবে প্রকাশের দায়ভার পালন করেছি মাত্র। ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের দায় পাঠকদের উপর রইলো।

উদ্দালকের পরবর্তী পরিকল্পনা- 'রস' বিশেষ সংখ্যা। সুধী পাঠকবর্গের কাছে পরামর্শ দানের আবেদন রইলো।

২৭.০৯.২০১১, বেলঘরিয়া

বিনীত
প্রত্যুষকুমার জানা

সূচিপত্র

চন্দ্রাবতী রামায়ণ: সীতায়ন না নারীমহাকাব্য— সনৎকুমার নস্কর ৭

মধুসূদনের সমকালীন মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা (১৮৬১-১৮৭৩)
—সন্তোষকুমার মণ্ডল ২৭

লোকসাহিত্যে মহাকাব্য প্রসঙ্গ: বাংলার লৌকিক ধাঁধা
—সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৪৩

পরিবেশ শিক্ষা: সাম্প্রতিক সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ— উত্তমকুমার মুখার্জী ৫৩

একলা মানুষ: প্রসঙ্গ কয়েকটি রবীন্দ্রগল্প— কিঙ্কর মণ্ডল ৬৫

ছোটগল্পকার নজরুল— রবিন পাল ৭৭

কাহিনী কবিতা ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ— প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত ৮০

জন্মশতবর্ষে আশালতা: সেকালের স্রষ্টা একালের দ্রষ্টা— অরুন্ধতী সুর ৯৯

সুখের সন্ধানে দুখবাদী বৈরাগী— দেবাশীষ বিশ্বাস ১০৮

ভীষ্ম: চারজন কবির চোখে— তরুণ মুখোপাধ্যায় ১১৬

শশী ও কুসুম: বজ্রাহত বটবৃক্ষ ও থেতলানো গোলাপ চারা
—জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপকথা— সোনা মণ্ডল ১৫৯

বাংলা অনুবাদে রুশ সাহিত্য— বিপ্লব মাজী ১৬৯

বাংলা পরিভাষা: সমস্যা ও ইতিহাস— ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৬

চন্দ্রাবতী রামায়ণ: 'সীতায়ন' না 'নারী-মহাকাব্য'?

সনৎকুমার নস্কর

রামকথা কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি কাব্যকথা নয়, শাশ্বত ভারতের গভীর মর্মকথাও বটে। বেদ-উপনিষদাদির পরে রচিত হলেও মহামুনি বাল্মীকিকে আদিকবির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে, তিনিই প্রথম তত্ত্বালোচনার আপাতনীরস পন্থা পরিহার করে নিটোল আখ্যান রচনার ভিতর দিয়ে চিরন্তন জীবনসত্যকে স্পর্শ করেছেন। তাঁর প্রসন্ন আয়ত কবিদৃষ্টিতে মর্ত্য-মানবের প্রবহমান জীবন রসাত্মক বাণীরূপ লাভ করেছে। কবির দর্শন যদি জীবনের সমগ্রতাকে আত্মস্থ করে উদ্ভূত হয়, তাহলে প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ, তাদের আদর্শ, মূল্যবোধ, জীবনযাপনের সমস্ত খুঁটিনাটি রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যেই সর্বপ্রথম মেলে। কবি বাল্মীকি আসলে সুবৃহৎ রামকথার মধ্য দিয়ে সেকালের গোটা ভারতবর্ষকেই উপহার দিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতবাসীর গৃহজীবনের আদর্শ রামায়ণে যতখানি উপস্থাপিত হয়েছে, ভারতজোড়া অন্য কোন আখ্যানে তার জুড়ি মেলা ভার। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ মহাকাব্যের মধ্যে খুঁজে ফিরেছেন ইতিহাসের লুকোনো ইঙ্গিতকে। শিকারজীবী সভ্যতার অবসানে কীভাবে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনর্চযা গড়ে উঠলো, সেই ইতিবৃত্তের হদিস নাকি মেলে রামায়ণের বিবিধ উপাখ্যানে। অনেকটা সময় পেরিয়ে এই কাব্য, এই ইতিহাস রূপান্তরিত হল কাহিনীমুখ্য ধর্মশাস্ত্রে— যখন রামচন্দ্র আর বাল্মীকি-কথিত 'নরচন্দ্রমা' রইলেন না, বিবেচিত হলেন পরমারাধ্য পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র রূপে। পণ্ডিতদের বিবেচনায়, নিছক ক্ষত্রিয়-পুরুষ রামের দেবসুলভ এই বন্দনীয় মূর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল বাল ও উত্তরকাণ্ডের শ্লোকসমূহে পরবর্তী সময়ের কিছু কৌশলী সংযোজন। মধ্যযুগে প্রাদেশিক ভাষায় যখন রামায়ণ অনুবাদের কাজ শুরু হল, তখন ভগবৎ মহিমায় বৃত রামচন্দ্রের এই দেবমূর্তিটি দিনের পর দিন আরো বেশি খোল্‌তাই হয়েছে, তাঁকে সুউচ্চ বেদীতে বসিয়ে দেবপূজার অর্ঘ্য স্তূপীকৃত হয়েছে। আর এমনই এক আপ্লুত সময়ে সৃষ্টি হল রামায়ণী কথার প্রতিস্রোতী এক ভিন্ন বয়ান, যা রামচন্দ্রের চিরায়ত ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে বের করে আনলো তাঁর একটি ছাঁচ-ভাঙা মূর্তি। এ মূর্তির নির্মাতা ছিলেন একজন রমণী— মধ্যযুগের সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন একরকম ব্রাত্য, অপাঙ্‌ক্তেয়। ইনি হলেন পদ্মাপুরাণের লেখক দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা বঙ্গের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

একথা অনস্বীকার্য যে, চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কোন লিখিত পুথি মেলেনি। সেজন্য এই লেখিকার কথা পণ্ডিত সমাজের গোচরে আসে অনেক পরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গ্রাম বাংলার প্রত্যন্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গীতিকাগুলি সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হলে এ কাজে তাঁকে

সহযোগিতা করতে থাকেন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের অধিবাসী প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী মানুষ চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রকুমার স্থানীয় পালা-গায়কদের কাছে গীতিকার অনুসন্ধান করতে গিয়ে ময়মনসিংহেই পল্লী রমনীদের কণ্ঠে চন্দ্রাবতী রামায়ণের সন্ধান পান। গায়িকাদের মুখ থেকে তা সুযোগ মতো অনুলিপি করে নেন এবং মুদ্রণের জন্য কলকাতায় দীনেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন। তারই সুবাদে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র ৪র্থ খণ্ডে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত অংশটি ছাপা হয়। এরপর মৌখিক সাহিত্যের আর এক সংগ্রাহক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক গীতিকার অন্যান্য পালা সংগ্রহের পাশাপাশি চন্দ্রাবতী রামায়ণের মৌখিক রূপটিও সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'-র ৭ম খণ্ডে তা মুদ্রিত করেন। এই দুই মুদ্রিত রূপের মধ্যে কিছু তফাৎ থাকলেও তা যে মূলত অভিন্ন ভাব-কাঠামোয় রচিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। আর একটি কথা, চন্দ্রকুমারের তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সমস্ত সংগ্রহই দীর্ঘ। সেই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। ক্ষিতীশচন্দ্র সংগৃহীত রামায়ণের পাঠটি অনেক সম্পূর্ণ ও সুগঠিত। যদিও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-ঐতিহাসিক সুকুমার সেন এই রচনাটিকে 'ভূয়া' বলে নির্দেশ করে এর অস্তিত্বকেই বেমালুম নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।

রচনাটির সামগ্রিক পরিচয় উপস্থিত করার আগে রচয়িতার ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে দু'চার কথা জেনে নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে ইতিহাস চেতনার অভাবের কারণে হোক কিংবা গোষ্ঠীচেতনার অভ্যন্তরে আত্মবিলোপী প্রবণতার কারণেই হোক, সাহিত্যস্রষ্টারা নিজেদের সম্পর্কে খুব একটা প্রচারধর্মী ছিলেন না। সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল পুরুষের তুলনায় অনেকটাই নীচে। এরকম পরিস্থিতিতে মহিলা কবি চন্দ্রাবতী সম্পর্কে যে তথ্যের ন্যূনতা ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। তবুও বিভিন্ন উৎস থেকে যতটুকু জানা গেছে সেগুলিকে একত্র করলে চন্দ্রাবতী বিষয়ে অল্প কিছু আলো পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে চন্দ্রাবতীর নামে একটি করুণ-রসাত্মক গীতিকা চালু ছিল এককালে। গীতিকা প্রধানত জনশ্রুতিমূলক রচনা। এই রামায়ণ লেখিকার জীবন সম্বন্ধে ওই গীতিকাটিই প্রধান উৎস হিসেবে এখনও বিবেচিত হয়। গীতিকা ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্রাবতীর জীবনকথা সংক্ষেপে এইরকম: ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী বা পাত্রবাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চন্দ্রাবতীর জন্ম। তাঁর পিতার নাম বংশীদাস, মাতা সুলোচনা। বংশীদাস কবি ও পালাগায়ক ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গীয় ধারায় মনসামঙ্গল লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিজ বংশীর কাব্য সম্ভবত ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল। বংশী তাঁর কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছিলেন। অল্প বয়সী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ-সন্তান জয়ানন্দের প্রণয় সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হওয়ার আগে জয়ানন্দের পদস্খলন হয়। এক মুসলমান যুবতীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন ও জয়নুল নাম গ্রহণ করে সেই রমনীটিকে বিবাহ করেন। আশৈশব প্রেমিকের

এই বিশ্বাসঘাতী আচরণে চন্দ্রাবতী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন জীবনে আর কোন পুরুষকেই গ্রহণ করবেন না। তাঁর পিতাও অগত্যা কন্যার অবস্থানকে মেনে নেন এবং শূন্যচিত্ত কন্যার মানসিক শান্তিবিধানের জন্য নির্দেশ দেন— 'শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে'। নয়নচাঁদ ঘোষ বিরচিত 'চন্দ্রাবতী' গীতিকায় এর পরও চন্দ্রাবতীর জীবন-আখ্যান এগিয়েছে চূড়ান্ত নাটকীয়তার উপকরণ সঙ্গে নিয়ে। পিতার নির্দেশানুযায়ী চন্দ্রাবতী যখন শিবপূজা ও রামায়ণ রচনায় আত্মমগ্ন হলেন, তখন জয়ানন্দের জীবনে ঘটলো বিপর্যয়। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা চন্দ্রাবতীকে পরিত্যাগ করে রূপসী ও যৌবনমদমত্তা মুসলমান কন্যাকে গ্রহণের পরে পরেই সম্ভবত বুঝেছিলেন, এ জীবনদায়ী সঞ্জীবনী নয়, বরং প্রাণঘাতী তীব্র হলাহল। তাই নিজের প্রকাণ্ড ভুল বুঝতে পেরে জয়ানন্দ অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছিলেন। শৈশবসঙ্গিনীর সঙ্গে যে বড়মাপের বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেছে এই বোধে জয়ানন্দ আত্মানুশোচনায় পত্র লিখলেন। পত্রের প্রতিটি অক্ষরে ঝরে পড়ল তাঁর মর্মদাহী অনুতাপ ও অবিমৃষ্যকারীর কান্না। পত্রশেষে ক্ষমা চেয়ে অন্তত একবারের জন্য দেখা করার অনুমতি ভিক্ষা করেছেন জয়ানন্দ। কিন্তু সে পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী অতীত প্রেমিকের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও তাঁর পিতা দ্বিজ বংশী তাঁকে দৃঢ় হতে পরামর্শ দিলেন। চন্দ্রার মন থেকে দুর্বলতার সামান্য বাষ্পও উধাও হয়ে গেল। অতঃপর জয়ানন্দ ব্যথিত চিত্তে নিজেই এলেন শিবমন্দিরে চন্দ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ধর্মান্তরিত বিশ্বাসঘাতক জয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করলেন না, মন্দিরের কপাট খুললেন না। তখন সংসারসুখবিরাগী, আশাহত, অনুশোচনাদগ্ধ জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর মন্দিরের দ্বারে করাঘাত করে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে আপন মনের কথা চিঠিতে জানিয়ে চললেন নদীর ঘাটে, আত্মহননের উদ্দেশ্যে। আর চন্দ্রাবতী তাঁর শিবমন্দির এক বিধর্মীর স্পর্শে অপবিত্র হয়েছে ভেবে তাকে শুদ্ধ করার জন্য নদীর ঘাটে চললেন জল আনতে। এই নাট্যোপম কাহিনীর শেষাংশে রয়েছে করুণ ক্লাইম্যাক্স। কলসীতে জল ভরতে আসা চন্দ্রাবতী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন মর্মান্তিক করুণ এক দৃশ্য: নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে জয়ানন্দের দেহ, যেন 'পুন্নমাসীর চান'। আর এই দৃশ্য প্রেমিকা চন্দ্রাবতীকে পরিণত করল 'উমেদা কামিনী'-তে। অনেকে বলেন, এ ঘটনার পর চন্দ্রাবতী আর খুব বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। চন্দ্রাবতী রামায়ণের আদি আবিষ্কারক চন্দ্রকুমার দে জানিয়েছেন যে, রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রাবতীর নামে বেশ কয়েকটি মৌখিক গীতিকাও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আছে যেগুলির মধ্যে 'দস্যু কেনারামের পালা' 'কাজির বিচার' অন্যতম। অবশ্য লেখিকা হিসেবে চন্দ্রাবতীর যাবতীয় খ্যাতি তাঁর সৃষ্ট অসামান্য ত্রি-খণ্ডবিশিষ্ট রামায়ণের জন্য; কেননা এই রামায়ণ প্রচলিত অনুবাদ ধারার রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে আবির্ভূত হয়নি, বরং লেখিকার নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতার কিছু চূর্ণাংশ এতে মিশ্রিত হয়ে লোকউপাদাননির্ভর এক অভিনব নারী-

মহাকাব্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

বাংলা ভাষার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর লেখা রামায়ণ নানা কারণেই বিশিষ্ট। এই প্রথম কোনো নারীর দৃষ্টিকোণে সাহিত্যের বিষয় ও চরিত্র রূপ পেলো। পুরুষ-শাসিত সামাজে নারী যেখানে অধস্তন, সেখানে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা কবি কীভাবে দেখেন সমাজকে, সমাজের নানা বিধিকে, এই লেখায় তা বোঝার একটা সুযোগ তৈরি হল। দ্বিতীয়ত, চন্দ্রাবতী রামায়ণের প্রথম সংকলক তথা আবিষ্কর্তা চন্দ্রকুমার দে জানাচ্ছেন যে, এই পালাগান নাকি ময়মনসিংহ অঞ্চলে কেবল নারীসমাজেই প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ গ্রাম্যরমণীরাই এর রক্ষাকর্তা ও রসভোক্তা। প্রাগাধুনিক পৃথিবীতে এমন খুব কম রচনাই আছে, যা বিশুদ্ধভাবে মহিলাদের জন্যই লেখা হয়েছে। তৃতীয়ত, চন্দ্রাবতীর লেখায় লোক-উপাদানের প্রাচুর্য রচনাটিতে অন্য রকমের স্বাদ এনে দিয়েছে। এর আখ্যান ও চরিত্র যে বাংলার লোকায়ত সমাজের অভ্যন্তরভাগ থেকে উঠে এসেছে তা খুব স্পষ্ট। চতুর্থত, কাহিনী উপস্থাপনার দিক থেকে এই রামায়ণ অভিনবত্বের দাবিদার, যা মূল সংস্কৃত কিংবা অন্য কোন ভাষায় অনূদিত রচনায় দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে সবশেষে উল্লেখ করতে হয় কবি চন্দ্রাবতীর বিশিষ্ট জীবনদর্শনের কথা। পিতৃসত্য পালনকারী রাম নন, বরং জনমদুখিনী সীতাই স্রষ্টার রসদৃষ্টিকে বেশি করে আকৃষ্ট করেন। কাব্য-ভাবনার কেন্দ্রভূমিতে সীতাকে রেখে চন্দ্রাবতী জনপ্রসিদ্ধ রামায়ণের সিদ্ধরসকে নস্যাৎ করেছেন— নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছেন একাধিক কল্পিত কাহিনী ও চরিত্রনির্মাণের সূক্ষ্ম কারিগরীতে।

অনুবাদধর্মী রচনায় অনুবাদকের নিজস্ব কল্পনার স্থান কতটুকু— অনুবাদতত্ত্বের এই জরুরী প্রশ্নটি নিয়ে চন্দ্রাবতী রামায়ণের বিচারে এগোলে দেখা যাবে, যে অর্থে কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাস অনুবাদক কবি হিসেবে স্বীকৃত, চন্দ্রাবতী সে গোত্রে পড়েন না। কোন রকম ভাষিক জটিলতা না রেখেই বলা যায়, চন্দ্রাবতী বাল্মীকির কিংবা অন্য কোন সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করেননি। একথা বলার কারণ এই যে, 'অনুবাদ' শব্দে দৃঢ়ভাবে মূলাশ্রয়ের যে-ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে চন্দ্রাবতীর সৃষ্টিতে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। তিনি বরং রামায়ণের মুখ্য কাহিনীকে অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন স্বাধীন কল্পনার দিকে, প্রয়োজনে গড়ে নিয়েছেন নিজের মতো কাব্য-কাঠামো। বিষয়টি খোলসা করার জন্য একটু মনোযোগ দেওয়া যাক চন্দ্রাবতী-উপস্থাপিত আখ্যানের দিকে।

বাল্মীকি ও বাল্মীকি-অনুসারী যাঁরা তাঁরা কি সংস্কৃত কি দেশীয় ভাষাতে বরাবর সাতকাণ্ড-বিশিষ্ট রামায়ণই লিখেছেন; কিন্তু আলোচ্য রামায়ণটি প্রথমেই সেই সিদ্ধপ্রথাকে চূর্ণ করেছে। এটি কোনভাবেই সপ্তকাণ্ডবিশিষ্ট নয়। এমনকি 'কাণ্ড' (রামায়ণ মহাকাব্যের ক্ষেত্রে যা চিরাচরিত খণ্ড-বিভাজক শব্দরূপে ব্যবহৃত) শব্দটি এখানে বর্জিত হয়েছে। পরিবর্তে আছে মোট তিনটি 'খণ্ড'— যাদের আধারে রামায়ণের মুখ্য ঘটনাগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। এ রামায়ণেরপ্রথম খণ্ডটি 'জন্মলীলা' নামে চিহ্নিত হলেও বাকি দুটিতে কোন শিরোনাম নেই। যতদূর মনে হয় এই নামাঙ্কন সম্পাদকের করা। এছাড়া প্রতিটি খণ্ডে আছে স্বতন্ত্র কিছু অধ্যায়, যেগুলি নামহীন, কিন্তু সংখ্যাবাচী। প্রসঙ্গান্তরে কথকের যাওয়ার জন্য যে এই স্বতন্ত্র অধ্যায়ের আয়োজন সেটা বোঝা যায়। জন্মখণ্ডে আছে মোট ছয়জনের জন্মপ্রসঙ্গ। ক্রমানুসারে এঁরা হলেন সীতা, রামাদি চারভ্রাতা ও কৈকেয়ী কন্যা কুকুয়া। লক্ষণীয়, এখানেও প্রচলিত প্রথাকে ভঙ্গ করেছেন চন্দ্রাবতী। আর্য রামায়ণে আর্যকুলগৌরব রামচন্দ্রের জন্মপ্রসঙ্গকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেই ঐতিহ্য দেশীয় ভাষার অনুবাদকরাও শিরোধার্য করেছেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী এক্ষেত্রে ভিন্নপথের পথিক। তাঁর উদ্দেশ্য ও বিধেয় পুরুষতান্ত্রিক কাব্যভাবনার তুলনায় স্বতন্ত্র। চিন্তার সেই প্রাতিস্বিকতা তাঁকে অন্যভাবে কাহিনীসজ্জায় চালিত করেছে। তিনি সীতার জন্মকথাকে আগে বিবৃত করে পরে রামের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ এনেছেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে নারী-মহাকাব্য রূপে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে এটা একটা বলিষ্ঠ ধাপ। এই রামায়ণ আরো একটি বিচিত্র তথ্য হাজির করেছে, যা জৈন কবিদের রামকথাকাব্যে পাওয়া যায়। সেটি হল সীতা আদতে রাবণ-মন্দোদরীর কন্যা। প্রায় একই রকমের তথ্য রয়েছে বহির্ভারতীয় রামকথায়— খোটানী ভাষায় লেখা ইরানীয় রামায়ণে। তবে এই দুই প্রাচীন রচনার তুলনায় চন্দ্রাবতী আবার কিছুটা ভিন্নতা দেখিয়েছেন সীতার জন্ম-রহস্য প্রসঙ্গে। জৈন রামায়ণে বলা হয়েছে যে, সীতা জন্মানোর পর সে পিতৃবংশের উচ্ছেদের হেতু হবে এই ভবিষ্যদ্‌বানী শুনে তাকে জনকের মাঠে পরিত্যাগ করে আসা হয়েছিল। জনক সেই ভূমি কর্ষণ করতে গিয়ে লাঙ্গলের ডগায় সীতাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। পরে জনকের পত্নী ধারিণী সীতাকে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন। অন্যদিকে খোটানী ভাষায় লেখা ইরানীয় রামায়ণে আছে যে, ব্রাহ্মণদের রাজা দশগ্রীবের অগ্রমহিষী এক কন্যা প্রসব করেছিলেন। জ্যোতিষীরা মেয়ের জন্মলগ্ন গণনা করে ভবিষ্যদ্‌বানী করে যে, সে কন্যা হতে দশগ্রীবের নগরীর উচ্ছেদ ঘটবে। তখন দশগ্রীবের আদেশে সদ্যোজাত কন্যাকে মঞ্জুষায় ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। সেই মঞ্জুষা দেখতে পান এক ঋষি। তিনি তখন মেয়েটিকে তুলে এনে সযত্নে পালন করতে থাকেন। এখন এই দুই প্রাচীন লিখিত গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সন্নিবেশিত সীতার জন্মকথাটির ঘটনাগত অভিনবত্ব বিচার করে দেখা যেতে পারে।

লঙ্কেশ্বর রাবণ অমিত পেশীশক্তির অধিকারী, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান। তিনি ভোগী, দাম্ভিক ও পরপীড়ক। বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও স্বর্ণক্ষুধা তাঁর মেটে না। অহঙ্কারী রাবণ একদা স্বর্গরাজ্যে হানা দিলেন। দেবতাদের বিতাড়িত করে ইন্দ্র ও যমকে বেঁধে

নিয়ে চললেন লঙ্কায়। ব্যভিচারী রাবণ দেবকন্যাদেরও রেহাই দিলেন না। তাঁদের রথে তুলে নিয়ে এলেন প্রমোদভবনে। এরপর শুরু হল রাবণের পাতাল ও মর্ত্য অভিযান। রাবণের ভয়ে সকলেই তাঁর কাছে নতিস্বীকার করলো। সবশেষে রাবণ চললেন মুনি-ঋষিদের তপোবনে। সদাচারী ঈশ্বরব্রতী মুনিদের কাছে নিজের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কর চেয়ে বসলেন। কিন্তু তাঁরা কপর্দকহীন। তখন বিপন্ন হয়ে মুনিরা প্রবল বেদনায় নিজেদের বুক চিরে রক্ত দিলেন একটি পাত্রে ভরে। লঙ্কায় ফিরে এসে সেই পাত্র রাবণ সন্তর্পণে রাখতে দিলেন মহিষী মন্দোদরীকে। জানাতে ভুললেন না এ তীব্র হলাহল, যা খাইয়ে তিনি দেবতাদের হত্যা করবেন। এরপর রাবণ অশোক কাননে প্রমোদ উদ্যানে গেলেন দেবকন্যাদের কাছে ভোগ-লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য। তাঁর আর অন্তঃপুরে মহিষী মন্দোদরীর কথা মনেও রইলো না। তখন মনের দুঃখে মন্দোদরী সিদ্ধান্ত নিলেন আত্মহত্যার। স্বামী কর্তৃক তাঁর নারীত্বের অপমান, পত্নীত্বের অসম্মান ঘোচাবার জন্য সেই মুনিরক্ত 'কালজর' (< কাল জহর) পান করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! নির্ঘাত মৃত্যুর বদলে রানী গর্ভবতী হলেন। অতঃপর দশমাস দশ দিনে মন্দোদরীর গর্ভমোচন হল। তিনি একটি ডিম্ব প্রসব করলেন। সেই অদ্ভুত সংবাদ অবিলম্বে লঙ্কেশ্বরের কানে পৌঁছল। তিনি এর রহস্য জানার জন্য গণক ডাকলেন। গণনার শেষে গণৎকার শোনালেন এই সংবাদ—

> এহি ডিম্বে এক কন্যা গো রাজা আইজ লভিল জনম।
> এহি কন্যা হইব গো রাজা স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ।।
> আর এক কথা গো শুন রাইক্ষসের পতি।
> এহি কন্যার লাইগ্যা বংশে গো নিভ্ব ভিটার বাতি।।
> দৈবের নির্বন্ধ কথা গো রাজা কভু খণ্ডানো না যায়।
> আপনি মইরবা গো রাজা তুমি এহি কন্যার দায়।।

এমন সর্বনেশে ভবিষ্যৎবানী শুনে রাবণ ভীত হবার পরিবর্তে কোপে রুষ্ট হলেন। তাঁর দশ জোড়া চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। তখন আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে রাজসভাসদরা নানা জনে তাঁকে নানা পরামর্শ দিল। কেউ ডিমটি ভাঙতে, কেউ কাটতে, কেউ আগুনে পোড়াতে বললো। অন্তঃপুরে মন্দোদরীর কানে সেকথা যেতে তিনি স্বামীকে বার্তা দিলেন—

> নষ্ট না করিও ডিম্ব গো রাখো আমার কথা।।
> না ভাইঙ্গ না পুইড় ডিম্ব গো আমার মাথা খাও।
> যদি নাই সে রাখো ডিম্ব গো, তবে সাগরে ভাসাও।।

শেষ অব্দি লঙ্কেশ্বর মহিষীর কথাই শুনলেন। কারিগরদের দিয়ে সোনার কৌটো বানিয়ে

তাতে ডিমটি ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। কৌটোটি ভাসতে ভাসতে মিথিলার রাজঘাটের কাছে কূলে ঠেকলো। এই নগরের এক দরিদ্র জেলে মাধব মাছ ধরতে গিয়ে সেই সোনার কৌটোটি নিয়ে বাড়িতে ফিরলো। তারপর মাধব সেটা তুলে দিল তার সতীসাধ্বী স্ত্রী সতার হাতে। সতা সেই সোনার কৌটোটিকে লক্ষ্মীজ্ঞানে পূজার্চনা শুরু করলো। তার ফল ফললো অচিরেই। দরিদ্র জেলে-দম্পতির অনটন আর রইলো না। ধনে-সম্পদে-ঐশ্বর্যে তারা পরিপূর্ণ হয়ে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো। এমতাবস্থায় একদিন রাত্রে জেলেনী সতা স্বপ্ন দেখলো, কৌটোর মধ্যস্থিত ডিম্বটি ভেদ করে যেন এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা তার গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার করছে তাকে মিথিলার রাজবাড়িতে জনক-পত্নীর কাছে রেখে আসার জন্য। স্বপ্নভঙ্গ হলে আর বিলম্ব না করে সতা সেই ডিমটি সহ সোনার কৌটোটি নিয়ে রাজমহিষীর কাছে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে সেটি সযত্নে রেখে দিতে বললো। কেবল ফিরে আসার আগে একটি অনুরোধ জানিয়ে এল—

> স্বপ্ন যদি সত্য হয় গো কন্যা জন্মে ইতে।
> আমার নামেতে কন্যার গো নাম রাইখ্য সীতে।।

অবশেষে শুভ দিনে শুভক্ষণে সেই ডিম ফুটে এক লাবণ্যময়ী কন্যার জন্ম হল। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সেই কন্যার নাম জেলেনী সতার অনুরোধে নামাঙ্কন করা হল— 'সীতা'।

এই দীর্ঘ উপাখ্যান থেকে বোঝা যায়, চন্দ্রাবতী সীতার জন্মকথা বর্ণনায় কোন প্রতিষ্ঠিত লিখিত রামায়ণ দ্বারা অনুভাবিত হননি; তিনি বরং এক্ষেত্রে আকর্ষণীয় লোককথার অনুসারী। রাবণের ঘরেই জন্মেছিল রাবণের মৃত্যুবীজ কিংবা সীতা জন্মানোর পর সীতাকে অশুভজ্ঞানে পরিত্যাগ করা হয়েছিল— এই দুটি স্থূল মোটিফ ছাড়া আর বিশেষ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় না উপরোক্ত তিন রামায়ণে। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, চন্দ্রাবতীর লেখায় লোকায়ত ঐতিহ্যের ছড়াছড়ি। রাক্ষসরানীর ডিম্ব প্রসব করা, সেই ডিমটিকে অখ্যাত কোন মাধব জেলের পাওয়া, মাধবের স্ত্রী সতার লক্ষ্মীজ্ঞানে সোনার কৌটোস্থিত ডিমটিকে পুজো করা ও বিপুল ধনরত্ন লাভ করা, ডিম্বস্থিত বালিকার স্বপ্নাদেশ ও সবশেষে ডিম ফুটে একটি রূপসী কন্যার আবির্ভাব— এই পুরো অখ্যানটাই যেন রূপকথার ফ্যান্টাসি দিয়ে মোড়া। এ কাহিনীর স্রষ্টা যে রামায়ণী কথার চিরাচরিত ঐতিহ্যের তুলনায় লোকায়ত সমাজের রূপকথাধর্মী গল্পের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখতেন তা বেশ বোঝা যায়। আর্য রামায়ণকে এভাবে অগ্রাহ্য করার তাঁর অন্য উদ্দেশ্যও ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরো দু'একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথমত, সীতার নামাঙ্কন প্রসঙ্গ। লাঙ্গলের ফালের সূত্র ধরে ভূমিকর্ষিত কন্যার নাম হয়েছিল সীতা— বাল্মীকি রামায়ণের এই তথ্য দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত-গবেষককেই রামায়ণী কথা বিশেষ একটি ভাবনার দিকে

চালিত করেছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন সীতা আসলে ভূমিজাত শস্য বা এককথায় উন্নত কৃষি, আর নবদুর্বাদল ঘনশ্যাম রামচন্দ্র সেই কৃষির অধিপতি তথা তৎকালীন সবুজবিপ্লবের হোতা সম্পন্ন কৃষক। তাই রামায়ণী-কথা প্রাচীন ভারতবর্ষের কৃষি-সংস্কৃতির মহাকাব্যিক রূপক রূপায়ন। কিন্তু চন্দ্রাবতীর দেওয়া সীতার জন্ম-সংক্রান্ত তথ্য ও নামাঙ্কন প্রসঙ্গ তাঁদের ভাবাবে। সীতা এখানে হলকর্ষণের ফল নয় মুনিরক্তে বীজীভূত স্ত্রীযোনিজ সন্তান। তাকেও কুড়িয়ে পাওয়া যায়, তবে সেটা ক্ষেত থেকে নয়, সমুদ্রের জল থেকে। আগেকার চেনা উপাখ্যানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না বলেই হয়তো তাঁর কাহিনীতে চন্দ্রাবতী এনেছেন জেলেনী সতাকে। রাজকীয় আভিজাত্য কিংবা মহিমা নয়, সীতার নামের সঙ্গে এক দীনদুঃখী মানবীর যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই অতি তুচ্ছ অথচ সুমহান বিষয়টিকে চন্দ্রাবতী এখানে ঘটনার সামান্য মোচড়ে দুর্দান্তভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, চন্দ্রাবতী তাঁর কল্পিত লোকায়ত কাহিনীটিকে এমনভাবে গেঁথেছেন, যেখানে সীতার অলৌকিক জন্মের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকাই বেশি। সীতা মন্দোদরীর শরীরজাত কন্যা, কিন্তু তার জন্মের সঙ্গে রাবণের প্রত্যক্ষত কোন সংযোগ নেই। আবার মন্দোদরী তাকে জন্ম দিলেও ডিম্বরূপী সীতা সতার দ্বারা রক্ষিতা। এই উপকাহিনীর উপান্তে দেখা যায়, জনকমহিষীর পরিচর্যায় ডিম ফুটে কন্যারূপে সীতার আবির্ভাব ঘটছে এবং তিনিই আবাল্য তাকে পালন করছেন। অর্থাৎ জননী মন্দোদরী, ধাত্রী সতা ও পালয়িত্রী জনকমহিষীর সূত্র ধরে এ রামায়ণে সীতা হয়ে উঠেছেন পুরুষের প্রায়-সংস্পর্শরহিত এক নারী। মূল আখ্যানকে এড়িয়ে এভাবে লোককথার আশ্রয়ে কবি চন্দ্রাবতী সীতার জন্ম-প্রসঙ্গকে যে-কৌশলে উপস্থাপিত করলেন, তাতে কি তাঁর স্বতন্ত্র মনোভঙ্গি ধরা পড়ে না? রচনাটিকে নারীমুখ্য কাব্যরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটাও কি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নয়?

কেবল সীতার জন্ম-প্রসঙ্গই নয়, রামপ্রমুখ চার ভ্রাতা ও তাঁদের ভগিনী কুকুয়ার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনায় চন্দ্রাবতী যথেষ্ট অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষণীয়, এই দুই ক্ষেত্রেও সীতার উপাখ্যানের মতো লোক-উপাদানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করেছেন। তবে সত্যের অনুরোধে বলতে হবে যে, জন্মখণ্ডে কবি স্পষ্টত ঘোষণা করেছেন রামচন্দ্র হলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার; তাঁর তিন অনুজও নারায়ণের বাকি তিন অংশের প্রকাশ। জন্মখণ্ডের এই তথ্যটি কেবল বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এই অভিনব রামকথাকে দৃঢ়সূত্রে বেঁধে রেখেছে। যাইহোক, চন্দ্রাবতীর বর্ণনা একটু অনুসরণ করা যাক। সসাগরা ধরিত্রীর অধিকারী হয়েও অপুত্রক দশরথ মনোদুঃখে কাতর। সন্তানলাভের জন্য তিনি পুরোহিত বশিষ্ঠের পরামর্শ মতো বিপুল ব্যয়ের রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। কিন্তু সে যজ্ঞও বিফলে গেল। তখন তিনি ব্যথিত চিত্তে যোড় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে অনাহারে পড়ে রইলেন। এমন সময়ে সেখানে এক মুনির আবির্ভাব ঘটলো। তিনি রাজার কাতরোক্তিতে বিগলিত হয়ে ঝোলার মধ্য থেকে একটি 'অকালের অমৃত ফল (অসময়ের আম?) দান

করলেন। মুনি জানালেন, এই ফল ভক্ষণে রাজমহিষীরা পুত্রবতী হবেন। রাজা সেই ফল পাটরানী কৌশল্যাকে দিলে তিনি বাকি দুই রানী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে অংশবিশেষ খেতে দিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে রাজা দশরথ তিন পত্নীর গর্ভে চারপুত্র লাভ করলেন। ফলভক্ষণে নারীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়া— এটি একটি লোককথার বহুপ্রচল মোটিফ, যা চন্দ্রাবতী তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। একইভাবে কৈকেয়ী-কন্যা কুকুয়ার জন্মকাহিনীও অভিনবত্বের দাবিদার। এখানে উল্লেখ থাকুক যে, সংস্কৃত কিংবা প্রাদেশিক ভাষার কোন রামায়ণেই কুকুয়ার উপস্থিতি নেই। দশরথ-তনয়া রূপে যিনি আছেন তিনি হলেন শান্তা, যিনি পরে রাজা লোমপাদের দ্বারা পালিত হন এবং বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু শান্তা নয়, কুকুয়ার কথাই বলেছেন চন্দ্রাবতী, যার জন্মরহস্য তার চারভ্রাতার মতোই অলৌকিক। আগের ফলবৃত্তান্তের অনুবৃত্তিস্বরূপ যেন এ এপিসোডের সূচনা। যে অকালের অমৃত ফলের শাঁস খেয়ে রানীরা পুত্র সন্তান লাভ করলেন, তার বীজটি রয়ে গিয়েছিল কৌশল্যার কাছে। দুর্বুদ্ধি কুঁজি দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে যুক্তি দিল—

> কৌশল্যা পাঠাইল ফল গো কাটিয়া বাঁটিয়া।
> বীজ নাই সে দিল কেনে গো দেখহ ভাবিয়া।।
> অমৃত ফলের আঁটি গো কৌশল্যা রাইখ্যাছে যতনে।
> ফলের শাঁস খাইয়া পুত্র পাইলে গো আঁটি খাইব গোপনে।।
> রাজারে কইয়া কথা গো তুমি আঁটির ভাগ লও।
> আমার কথা শুন রানী গো যদি নিজের ভালা চাও।।

স্বল্পবুদ্ধি কৈকেয়ী মন্থরার যুক্তি ও পরামর্শকে সার মানলো। দশরথকে বলে কয়ে কৌশল্যার কাছ থেকে সেই ফলের আঁটি এনে একাই ভক্ষণ করলো। কবির মতে, অমৃত ফলের বীজটি ছিল অত্যন্ত তিক্ত। সেই বীজ খেয়ে কৈকেয়ী আর একটি গর্ভ ধারণ করলেন। যথাসময়ে তাঁর উদরে এক কন্যার জন্ম হল। তার প্রসব সময়ে নানা দিকে বিবিধ অশুভ লক্ষণ প্রকট হল। চন্দ্রাবতীর ভাষায়— 'লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানে আইস্যা গো অলক্ষ্মী জনমিল'। নবজাতা কন্যার নাম রাখা হল কুকুয়া। জননী ও জাতিকার স্বভাবধর্ম যে ক্রমশ অভিন্ন হয়ে উঠবে দুই নামের ধ্বনিসাম্যে তার ইঙ্গিত দিয়ে জন্মখণ্ডের কল্পিত কাহিনীতে ছেদ টেনেছেন চন্দ্রাবতী।

আলোচ্য রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডটি উপস্থাপনা কৌশলের দিক থেকে অভিনবত্বের দাবিদার। কবি জন্মখণ্ডে গল্প বলার যে-রীতি গ্রহণ করেছিলেন, এ খণ্ডে তাকেই হুবহু অনুসরণ করেননি। প্রথম খণ্ডে যেখানে তিনি সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায়, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর সেই স্থান দখল করেছেন এ কাব্যের মুখ্য চরিত্র সীতা। বস্তুত, আখ্যানধর্মী কাব্যে যে স্বাভাবিক নাটকীয়তা থাকে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় জন্মখণ্ডে; পক্ষান্তরে

নাটকীয় একোক্তির আকারে লেখা হয়েছে যেন দ্বিতীয় খণ্ডটি। এখানে একমাত্র বক্তা সীতা। সীতাকে কথক করে তোলার ক্ষেত্রেও চন্দ্রাবতী এই খণ্ডের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পটভূমিটি এই: লঙ্কাযুদ্ধের পর সীতাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুখে কাটছে তাঁদের দিন। সখি পরিবৃতা সীতা অন্তঃপুরে অবস্থান করেন। একদিন কয়েকজন সখি সীতার কাছে জানতে চাইল তাঁর অতীত জীবনের কথা। সখিদের অনুরোধে তিনি উপুড় করে দিলেন তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতার ডালি। পরিণত-বয়স্ক এই সীতা তাঁর ফেলে আসা সময়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেখানে কখন অজান্তে তৈরি হয়ে গেছে দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়— বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহোত্তর জীবন। সখিদের অনুরোধ রক্ষা করে সীতা যখন আত্মকথনে প্রবৃত্ত, কবি তখন এই দুই অধ্যায়কে দুটি স্বতন্ত্র কাব্যাংশে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট জনকরাজার রাজপুরী মিথিলা, বাকিটা অযোধ্যা-কেন্দ্রিক। অবশ্য কবি বনবাস যাত্রার পর্ব থেকে কাহিনী বলতে শুরু করেছেন দ্বিতীয় অংশে। দ্বিতীয় অংশটি আবার প্রথম অংশের তুলনায় প্রকরণে পৃথক। প্রথম অংশটি যদি হয় সাধারণ কাব্য-একোক্তি (Poetic monologue), সেখানে দ্বিতীয় অংশটি লেখা হয়েছে বারমাস্যার ঢঙে। বনবাস-গমন থেকে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত কাহিনী এই অংশের উপজীব্য। লক্ষণীয়, চোদ্দ বছরের দীর্ঘ সময়কে চন্দ্রাবতী প্রতীকী কৌশলে মাত্র বারমাসের ছোট্ট ফ্রেমে ধরতে চেয়েছেন এবং দুর্দান্তভাবে তাতে সফলও হয়েছেন। অনেকেই জানেন, ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা দীর্ঘদিন ধরে নারী-জীবনাশ্রিত সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ করে বিরহবেদনা প্রকাশে বারমাস্যা এক অনন্য কাব্য-মাধ্যম। সীতা যে জন্মদুঃখিনী এই লোকায়ত অভিজ্ঞানটিকে কবি এখানে ব্যবহার করে তাঁর মুখ দিয়ে জীবনের নানা বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরেছেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের পাশাপাশি দ্বিতীয় খণ্ডটিকে আরো একটি বিশেষ ভূমিকায় ব্যবহার করেছেন বুদ্ধিমতী লেখিকা। সেটি হল অযোধ্যা থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত মুখ্য ঘটনাগুলির সংযোজনার কাজ। একটু খেয়াল রাখলে দেখা যাবে, বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের বিষয়বস্তু চন্দ্রাবতী স্থূলভাবে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর 'জন্মখণ্ড'-এ; আর উত্তরকাণ্ডের উপজীব্য রাখতে চেয়েছিলেন তৃতীয় তথা শেষ খণ্ডে। এতে মধ্যবর্তী বাকি পাঁচটি কাণ্ডের মুখ্য ঘটনাসমূহ বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। আমাদের মতে, সেই সম্ভাব্য অসম্পূর্ণতাকে প্রতিরোধ করেছে এই মধ্যখণ্ডটি। আকারে ছোট, কিন্তু অযোধ্য অরণ্য সুন্দর কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাকাণ্ডের মোটা গল্পাংশটুকু এখানে সূত্রাকারে পাওয়া যায়। এবং অবশ্যই তার প্রেক্ষণবিন্দু হয়েছেন সীতা। অর্থাৎ এই পাঁচটি খণ্ডে যে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সীতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রচিত হয়েছে কবির কলম সীতার অভিজ্ঞতার বিবরণসূত্রে কেবল সেগুলিকেই মৃদুভাবে স্পর্শ করে গেছে। এতে যেমন একদিকে পুং-মহাকাব্যের স্বভাব-কাঠিন্য ও বহিরঙ্গ

বজ্রনির্ঘোষকে পরিহার করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি নারী-মহাকাব্যের স্বাভাবিক পেলবতা ও সৌকুমার্যকে রক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই খণ্ডে সীতার ব্যথিত করুণ চোখ দিয়ে দেখা নানা ঘটনার বর্ণময় মিছিল কেমন যেন সেলুলয়েডিক চলৎছবির মতো হাল্কা রেশ রেখে শ্রোতার মনোজগৎ থেকে পিছলে পিছলে গিয়েছে। আর্য রামায়ণের কোন অংশে সীতাকে তো বটেই, এমনকি 'নরচন্দ্রমা' রামকেও এতটা প্রাধান্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় চলমান ঘটনাধারাকে দেখানোর চেষ্টা হয়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দ্বিতীয় খণ্ডের এই কৌশল অভিনব। নারী-মহাকাব্যে নারীর ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব অনুভব প্রাধান্য পাবে এটাই প্রত্যাশিত, আর সেই প্রত্যাশাকে চমৎকার আঙ্গিক প্রকরণে পূরণ করে দেন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

শেষ খণ্ডে কবি আবার ফিরে গেছেন সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায়। এই অংশে উপাখ্যান শুরু হচ্ছে এমন একটি ঘটনা দিয়ে, যা কোন রামায়ণেই লেখে না। রাম ও সীতা সখি সমভিব্যাহারে দুইজনে পাশা খেলছেন বাজি রেখে। কখনো হারছেন রাম, কখনো সীতা। সীতা পরাজিত হলে শর্ত অনুযায়ী তিনি রামকে 'প্রেম আলিঙ্গন' দেবেন। একবার পণে হেরে গেলেন সীতা। সখিরা কৌতুকে তাঁকে বসিয়ে দিলেন শ্রীরামের কোলে। রামচন্দ্র পত্নীকে স্নেহচুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে মধুর বচনে বললেন, 'যাহা ইচ্ছা মনোমত গো বাইচ্ছা লও বর'। সীতা চমকিত হলেন। কিন্তু তিনি ধন-সম্পদ-অলঙ্কার কিছুই চাইলেন না, কেবল ধীরে ধীরে বললেন—

> বহুদিন হইতে আমার গো ইচ্ছা জাগে মনে।
> আরবার বেড়াইব গো পুণ্য তপোবনে।।
> তমসা নদীর কথা গো সদাই মনে পড়ে।
> কমল কাননে হংসী গো সেথায় খেলা করে।।

রাম সীতার মনোভাব বুঝলেন এবং সীতার বনভ্রমণের আশু ব্যবস্থা করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। লক্ষ্মণই হবেন তাঁর অরণ্যযাত্রার সাথী। কিন্তু তার পরে পরেই ঘটলো বিষম বিপদপাত। বিশ্রামরতা সীতার শয়নমন্দিরে সুযোগমতো এসে দেখা দিল কুকুয়া। ননদিনীর মনে দারুণ কৌতূহল অশোকবনে সীতা কেমন করে দিন কাটিয়েছে সেই গোপন কথাটা জানার। সে বারবার ভ্রাতৃজায়াকে অদ্ভুতদর্শন দশমুণ্ড রাবণের মূর্তি এঁকে দেখাতে অনুনয় করতে লাগল। অগত্যা সীতা নাছোড়বান্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ব্যজনীর উপর লঙ্কেশ্বরের আবছা এক মূর্তি আঁকলেন। জনকনন্দিনী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শ্রান্তিবশত পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লে সেই ফাঁকে দুষ্টবুদ্ধি কুকুয়া তাঁর বুকের উপর পাখাটি রেখে দাদা রামচন্দ্রকে ডাকতে গেল। ফল যা ঘটবার তাই-ই ঘটল। রাম ভগিনী কুকুয়ার কথা বিশ্বাস করলেন এবং 'সীতা অসতী' এই জ্ঞানে তাঁকে চিরতরে বনে নির্বাসন দিতে মনস্থ করলেন। পরদিন প্রাতে লক্ষ্মণকে ডেকে সীতাকে নির্বাসনে দিয়ে

আসতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ সবকথা শুনে ব্যথিত হলেও অগ্রজের নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না। সীতাকে রথে চড়িয়ে লক্ষ্মণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বেচারী সীতা তখনও জানতে পারলেন না রামতন্ত্র বনভ্রমণের অছিলায় তাঁকে অরণ্যে নির্বাসন দিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার যে কত নির্দয় নিষ্ঠুর হতে পারে, চন্দ্রাবতী রামায়ণ কাহিনীর পুনর্বিন্যাসে তা দেখালেন। আরও একটি কথা এখানে অনুধাবনযোগ্য। সেটি হল, চন্দ্রাবতী তাঁর কাব্যের রামকে নারায়ণের অংশ বলে স্বীকার করে নিয়েও বাল্মীকি রামায়ণের মতো তাঁকে ধর্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় করে তোলেননি। বাল্মীকির রাম সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন লোকাপবাদ ও প্রজানুরঞ্জন এই দুই কারণে। কিন্তু চন্দ্রাবতী-অঙ্কিত রামের মধ্যে প্রজাকল্যাণের আদর্শ নেই। তৎপরিবর্তে তিনি ষড়রিপুর শিকার। তাঁর ভিতর ক্রোধ, মোহ ও মাৎসর্য এই তিন দোষ প্রবল। এই রাম অবিবেচক, হঠকারী। এই রামে স্থিরপ্রজ্ঞার অভাব, বরং তিনি স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন। এরপরেও কাহিনীর পরবর্তী অংশে চন্দ্রাবতী দেখাবেন রাম কীভাবে সর্বসমক্ষে সীতাকে অনলে প্রবেশ করে সতীত্ব পরীক্ষার কঠোর অসাধারণ দক্ষতার উন্মোচন করতে পেরেছেন সেই অখ্যাত চরিত্রটির ঈর্ষা ও হিংসাবৃত্তির মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিটিকে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। কেউ কেউ এ চরিত্রের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর ব্যাহত জীবনের একটি আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের মতে, কুকুয়া নারী হয়ে যেমন সীতার জীবনে অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল, তেমনি চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রেম-সম্পর্কের মাঝখানে হঠাৎ উদ্ভূত এক মুসলমান কন্যা চন্দ্রার জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছিল। আর তাই রামায়ণ-লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাব্যে তির্যকভাবে ফুটিয়ে তুলতে নাকি স্বকপোলকল্পিত কুকুয়ার আবির্ভাব। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে, এ রামায়ণ যতটা না মূলের অনুসারী, তার তুলনায় অনেক বেশি চন্দ্রাবতীর জীবন-সম্ভূত রচনা।

কেবল এই একটি ক্ষেত্রে নয়, চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সঙ্গে রামায়ণ-লেখিকার জীবনের আপতিক কিংবা গভীর সংযোগ আরো কয়েকটি জায়গায় হয়তো দেখানো সম্ভব। রাম কর্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্তা সীতা যে পিতৃপ্রতিম বাল্মীকি মুনির স্নেহাশ্রয় পেয়েছিলেন, ভুলতে চেয়েছিলেন এক নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার বেদনা, তার সদৃশ হতে পারে জয়ানন্দ-প্রবঞ্চিতা চন্দ্রাবতী কর্তৃক পিতা বংশীদাসের আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা। চন্দ্রাবতীকে পরিত্যাগ করার পরেও যেমন জয়ানন্দের প্রয়োজন পড়েছিল তার প্রণয়িনীর কাছে আসবার, তেমনি সীতাকে বনে বিসর্জন দেবার পরে অযোধ্যার মঙ্গলের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করার প্রাক্কালে রামেরও প্রয়োজন পড়েছিল সীতার। প্রয়োজন ও পরিস্থিতির মধ্যে তারতম্য থাকলেও এই দুই ঘটনায় দূরান্বয়ী মিল অনেকের চোখে ধরা পড়তে পারে। একইভাবে রাবণ-উপেক্ষিতা মন্দোদরীর সঙ্গে জয়ানন্দ-পরিত্যক্তা চন্দ্রাবতীর মানসিক অবস্থাও তুলনীয়

হতে পারে। জয়ানন্দের বিশ্বাসঘাতকতা চন্দ্রার প্রণয়িনী-সত্তাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করে, স্ত্রী বর্তমানে রাবণের দেবকন্যা উপভোগও তেমনি মন্দোদরীর পত্নীসত্তাকে নিদারুণভাবে অপমানিত করে। এ ক্ষেত্রে মন্দোদরীর অবস্থা চন্দ্রাবতীর থেকেও বেশি শোচনীয়। কারণ আবাল্য প্রেমিক জয়ানন্দের দ্বারা প্রবঞ্চিতা হবার পর চন্দ্রাবতী তবুও শিবার্চনা ও রামায়ণ রচনার মধ্য দিয়ে এই দুঃখকে ভুলতে চেয়েছিলেন, পক্ষান্তরে রাবণ কর্তৃক উপেক্ষিতা মন্দোদরী দুঃখ ভোলার কোন অবলম্বন না পেয়ে 'কালজর' খেয়ে আত্মহননের পথে জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা জুড়োতে চেয়েছিলেন।

এক হিসেবে দেখতে গেলে এই রামায়ণে চন্দ্রাবতী শাশ্বত এক মহাকাব্যের নব রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোয়। রবীন্দ্রনাথের মতো সম্ভবত তাঁর কাছেও রামায়ণী কথা ছিল গৃহাশ্রমের কাব্য। মানবজীবন ও সমাজের নানা সম্পর্কের উপরে এর কাহিনী যে আলোকপাত করে চন্দ্রাবতী আরো একবার সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির বিভিন্ন বিন্যাসে। অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের ওপরেই সবচেয়ে বেশি আলো ফেলতে চেয়েছেন তিনি, যা কিনা আমাদের দেশের গৃহজীবনের ভিত্তি। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, কাহিনীর মধ্যে তিনি মোট তিন জোড়া দাম্পত্যের সরাসরি উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন। এগুলি হল রাম-সীতা, রাবণ-মন্দোদরী ও মাধব-সতার দাম্পত্য। এই তিনের বাইরে রয়েছে আরও একটি দাম্পত্য জীবনের আভাস। সেটি কৈকেয়ী-কন্যা কুকুয়ার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাম-সীতা কিংবা রাবণ-মন্দোদরী মহাকাব্যটির পরিচিত চরিত্র হলেও, বাকিরা কবির স্বকপোলকল্পিত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মাধব-সতা কিংবা কুকুয়ার দাম্পত্য লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আর্য মহাকাব্যে প্রবেশ করেছে। এবার এতগুলি দাম্পত্য-চিত্রের পাশাপাশি আর একটি অসম্পূর্ণ ছবি আলগোছে রাখতে চাই। এই দুই নারী-পুরুষ প্রথাসিদ্ধ দম্পতি নন, কিন্তু তার সম্ভাবনা ছিল চূড়ান্ত। তাদের গভীর প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হওয়ার প্রাক্-মুহূর্তে পুরুষটির বিশ্বাসঘাতকতা শেষ করে দিল সেই ভাবী-দাম্পত্যের বিপুল সম্ভাবনা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আমরা এখানে এ রামায়ণের লেখিকা চন্দ্রাবতী ও তাঁর আবাল্য প্রেমিক জয়ানন্দের কথাই বলছি। জয়ানন্দ রূপের নেশায় মন থেকে চন্দ্রার কথা সহজে মুছে ফেলতে পারলেও চন্দ্রাবতী তা পারেননি। জয়ানন্দের এই প্রত্যাখ্যান কি চন্দ্রাবতীকে পুরুষ-বিদ্বেষী করে তুলেছিল, যার কারণে তিনি সারাজীবন অবিবাহিতই রয়ে গেলেন? নাকি, প্রেমাস্পদের প্রতি গভীর অভিমান ও তাঁর অতীত প্রেমের অমলিন স্মৃতি তাঁকে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে বরণ করে নিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল? এ প্রশ্নের কোন পাকা উত্তর নেই। যাইহোক, উপরোক্ত চারটি দাম্পত্য সম্পর্ককে চন্দ্রাবতী দেখতে চেয়েছেন নিজের জীবনাভিজ্ঞতার নিরিখে এবং সেই নিরীক্ষণ থেকে তাঁর জীবনবোধের গভীরতা টের পাওয়া যায়।

চন্দ্রাবতী এখানে যে-চারটি দাম্পত্য চিত্র অঙ্কন করেছেন, বলাবাহুল্য, তারা সবাই এক গোত্রের নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে হর-গৌরী, রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, এমনকি বিবাহ-সম্পর্ক-বহির্ভূত রাধা-কৃষ্ণ— এই সমস্ত যুগল সম্পর্কগুলি দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন রকম মর্যাদা পেয়ে এসেছে। সংস্কৃত রামায়ণের সূত্রে রাম সংযতচিত্ত, মহাবীর, ধীর স্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, কান্তিমান, রাজনীতিজ্ঞ এক আদর্শ পুরুষ। সীতা তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী। তিনি ত্যাগে, তিতিক্ষায়, সহিষ্ণুতায়, কোমলতায়, সেবাব্রতে ও সর্বোপরি পাতিব্রত্যে অতুলনীয়। এই সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়েছে হরধনু ভঙ্গের মতো পৌরুষের কঠোর পরীক্ষা দিয়ে। সীতাও রামকে ভালোবেসেছেন নিঃস্বার্থভাবে, মনে-প্রাণে। সেজন্য কৈকেয়ীর দেওয়া রামের বনবাস, সীতা হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন এই ভেবে যে, 'যেখানে স্বামী সেখানে স্বর্গ'। চন্দ্রাবতীও তাঁর সীতা চরিত্রচিত্রণে সীতার এই ভাবমূর্তি থেকে বিচ্যুত হননি। আত্মকথন-রত সীতার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

কি করিব রাইজ্য সুখ গো রাজ সিংহাসহনে।
শত রাজ্যপাটের সুখ গো আমার প্রভুর চরণে।।

স্বামীর প্রতি এই গভীর ভালোবাসাই তাঁর পাতিব্রত্যের মূলকে সুদৃঢ় করেছে। সমানভাবে, রামচন্দ্রও বনবাস-যাপনে কোথাও সীতাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেননি। রাবণ সীতাকে হরণ করলে ইক্ষাকুকুলের সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য নয়, প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে ফিরে পাওয়ার জন্য বিপুল কৌশল ও প্রচেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করেছেন। কিন্তু সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর কুকুয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পত্নীর প্রতি যে-ব্যবহার করেছেন তা সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কবি এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আসলে তথাকথিত বিবেচক রামের অবিমৃষ্যকারী মূর্তি উন্মোচন করেছেন। নিরপরাধা সীতার দুঃখে যেখানে বিশ্বপ্রকৃতি বিষণ্ন ও রোরুদ্যমান, রাম সেখানে সীতাকে নির্বাসনে দিয়েও সামান্য কাতরতা বোধ করেন না। সীতার প্রতি রামের এই দুর্ব্যবহার তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান কর্তৃকও সমালোচিত হয়েছে, যা মূল রামায়ণে কোথাও মেলে না। বস্তুত, দাম্পত্যের এই ছবিটি কোমলে-কঠোরে বর্ণময়। দেখা যাচ্ছে বনবাসী রাম সীতার প্রতি যতখানি স্নেহপ্রবণ ও দায়িত্বশীল, অযোধ্যায় রাজসুখে আচ্ছন্ন রাম ততটাই নির্দয় ও অবিবেচক। সীতার প্রতি তাঁর প্রেম ও ঐকান্তিকতা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে, যখন তিনি নিজের হাতে অগ্নিপরীক্ষার জন্য সজ্জিত চিতাতে অগ্নি সংযোগে অগ্রসর হয়েছেন। দাম্পত্যের এই ভগ্ন চিত্রকে তুলে ধরে হয়তো লেখিকা রঘুকুলগৌরব শ্রীরামচন্দ্রের দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ন্যায়পরায়ণতার ইমেজটিকে ভাঙলেন, বুঝিয়ে দিলেন সম্পদশালী রামের তুলনায় বনবাসী রাম ছিলেন সীতার প্রতি অনেক বেশি দায়িত্বশীল ও প্রেমময়। সীতার এত কাছে থেকেও সীতার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ধারণা না থাকাটা তাঁর অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। বাল্মীকির

'নরচন্দ্রমা'-র তত্ত্বটিকে সম্ভবত এভাবে চন্দ্রাবতী বর্জন করতে চেয়েছিলেন।

এবার একটি নষ্টদাম্পত্যের ছবির কথা বলা যাক। এই দম্পতিরা হলেন রাক্ষসরাজ রাবণ ও তাঁর পত্নী মন্দোদরী। ব্রহ্মার বরে রাবণ অপরিসীম শক্তির অধিকারী। তিনি সেই শক্তিকে ব্যবহার করেছেন পরপীড়নের কাজে। তাঁর দাপটে স্বর্গ-মর্ত-রসাতল তটস্থ। শক্তির দম্ভে দেবতাদের যেমন হেনস্থা করেন, তেমনি কামুক স্বভাব এই রাজা পরনারীকেও রেহাই দেন না। বহুভোগী রাবণ তাঁর ব্যভিচারিতার চূড়ান্ত করে চেয়েছেন স্বর্গ থেকে দেবকন্যাদের বলপ্রয়োগে ধরে নিয়ে এসে অশোকবনে উন্মত্ত কামোপভোগের মাধ্যমে। অথচ এই দুর্দম প্রকৃতির পুরুষটির পত্নী মন্দোদরী একেবারেই পতিগতপ্রাণা এক নারী। স্বামী-সমাগমের জন্য তাঁর মনে প্রতীক্ষা তৈরি হয়, কিন্তু অন্য-বিলাসী রাবণের স্ত্রীর কথা মনেও পড়ে না। তাঁর এই বহুগামিতা স্ত্রী মন্দোদরীকে কাতর করে, ক্ষুব্ধ করে। পত্নীত্ব তথা নারীত্বের এই দুঃসহ অপমান সহ্য করতে না পেরে মন্দোদরী আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষ পান করেন। মূল রামায়ণ-বহির্ভূত এই কাহিনী রচনা করে চন্দ্রাবতী আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থা নির্দেশ করতে চেয়েছেন, একই সঙ্গে আত্মহননের প্রসঙ্গ সংযুক্ত করে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অসহায় নারীর প্রতিবাদের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির হদিস দিয়েছেন। এখানেও যেন চন্দ্রাবতীর নিজের ভাগ্যহত জীবনের সঙ্গে মন্দোদরীর বেদনা-কাতরতার একটি সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। আবাল্য প্রেমিক জয়ানন্দের অন্যাসক্তি চন্দ্রাবতীর বিশুদ্ধ প্রেমকে নিদারুণভাবে অপমান করেছিল, তাঁর প্রেমিকা-সত্তা এমন ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছিল যার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বিহ্বল, নির্বাক হয়ে যান। বোঝা যায়, উপরোক্ত দুটি সম্পর্কে পারস্পরিক বিশ্বাসের আর কোন স্থান ছিল না; আর বিশ্বাসহীনতাই তো নষ্ট দাম্পত্যের আসল সূতিকাগার।

এই দুই পৌরাণিক দাম্পত্য জোড়ের পাশাপাশি এবার উল্লেখ করি কবি-কল্পিত আর দুই দাম্পত্য সম্পর্ক। এদের মধ্যে প্রথমটি হল মিথিলার অখ্যাত দুই জেলে-জেলেনী মাধব আর সতার দাম্পত্য। হাড়ভাঙা শারীরিক শ্রমে ধীবরবৃত্তি করে অতি কায়ক্লেশে সংসার চলে তাদের। ভাঙা বেড়ায় ঘেরা লতাপাতা আচ্ছাদিত সামান্য কুঁড়েয় বাস। এতই দারিদ্র্য যে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবে মাধব অর্থধনে ধনী না হলেও স্ত্রী ধনে ধনী। কর্মঠ স্ত্রীর সাহচর্যেই এই প্রকট দারিদ্র্যের মধ্যেও মাধব এক অদ্ভুত সুন্দর দাম্পত্য রচনা করেছে। স্ত্রী সতা মাছের চুপড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি সওদা করে ফেরে অক্লেশে। মাধবের সমস্ত দুঃখকষ্টের অংশীদার সেই নারী, যে তার প্রেম-ভালোবাসা-আন্তরিকতা-বিশ্বাস দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে দীনাতিদীন মাধবকে। সংসারের দারিদ্র্যের জন্য সতা কখনো স্বামীকে দায়ী করেনি। বরং সব কিছুর অভাব থাকলেও স্বামীর প্রতি আস্থা বা আনুগত্য, নিরঙ্কুশ অধিকার ও সর্বক্ষণের সান্নিধ্য সতাকে চরম সুখে সুখী করেছিল। সতার প্রতি মাধবের অনন্য প্রেম তাদের এই সুখী দাম্পত্যের মূল কারণ। চন্দ্রাবতী তাঁর

স্বকপোলকল্পিত এই দম্পতির সুখ অন্বেষণ করেছেন বিপুল বিত্তের সমারোহের মধ্যে নয়, পারস্পরিক বিশ্বাস, আনুগত্য ও অকপট ভালোবাসায়। লেখিকার জীবনদর্শনের সারসত্যটি যেন অভিপ্রকাশিত হয়েছে এই দুই বাক্যে—

সতী নারীর সাধু পতি গো যদি থাকে ঘরে।
খাওনের পিন্ধনের দুঃখ গো নাই সে অন্তরে।।

আর আছে কুকুয়ার অসফল দাম্পত্যের দৃষ্টান্ত। এটিও মূল রামায়ণ বহির্ভূত প্রসঙ্গ এবং কবি তার স্পষ্ট ছবি কোথাও হাজির করেননি, কেবল বর্ণনায় আভাস দিয়েছেন মাত্র। রাজনন্দিনী হওয়া সত্ত্বেও কুকুয়া স্বভাবে খল ও কুঁদুলে। স্বামীগৃহে সে যেন এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। শ্বশুর শাশুড়ি, ভাসুর, দেবররা তার দু'চক্ষের বিষ। সেই অপছন্দের তালিকা থেকে বাদ যায়নি তার হতভাগ্য স্বামীও। সে 'ঔষধ' খাইয়ে স্বামীকে পাগলে পরিণত করেছে। স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন কি কুকুয়ার কাছে আকাঙ্ক্ষিত নয়? সে কি আত্মকেন্দ্রিক? সে কি কেবল নিজেকেই ভালোবাসে? বছর দশেক হল কুকুয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করছে- এই সংবাদ দানের ভিতর দিয়ে চন্দ্রাবতী আত্মপরায়ণা এই নারীর স্বামী-সংস্পর্শহীন নির্জলা জীবনের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন কাব্যিক এই চরণে— 'সধবা হইয়া গো কার্যদোষে রাঁড়ী'। খুব স্পষ্টভাষায় বলে না দিলেও বোঝা যায়, উপরোক্ত চারটি দাম্পত্য চিত্রের মধ্যে কবি কোন্‌টিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করেন। সম্পদের প্রাচুর্য নয় বরং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস, আভিজাত্যগর্বিত বৈভব নয় বরং নির্ভরতাপূর্ণ অনুগত্যই পতি-পত্নীর হার্দিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে। চন্দ্রাবতী তাঁর নিজের জীবনটিকে পরিমাপনী করে এই চারটি দাম্পত্য সম্পর্ককে সূক্ষ্মভাবে মেপেছেন এবং মাধব-সতার অভাবময় সুখী দাম্পত্যকে শ্রেয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে করেছেন। এই জীবনবোধ আর্য রামায়ণের প্রচলিত দাম্পত্য আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র, এবং এভাবেই চেনা আখ্যানকে ভেঙে নতুন করে কাহিনীর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে চন্দ্রাবতী তাঁর ভাবনার অভিনবত্ব প্রমাণ করেছেন।

সাহিত্যের প্রাকরণিক বিচারেও চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রচলিত বর্গ বিভাজনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা বইটিকে রামায়ণের অনুবাদ ধারার মধ্যে ফেলে বিচার করেন, যা একেবারেই অসিদ্ধ। চন্দ্রাবতী সংস্কৃত কোন রামায়ণেরই মূলানুগ অনুবাদ করেননি এবং বোধহয় সেটা তাঁর অভিপ্রায়ও ছিল না। আর সেজন্যই তাঁর কাহিনী-বয়নে মাধুকরী বৃত্তির চিহ্ন বর্তমান। প্রচলিত মহাকাব্যিক আখ্যানের তুলনায় তাঁর রচনায় লৌকিক উপাদানের পরিমাণ বেশি। আগেই দেখিয়েছি যে, সীতা কুকুয়া রাম লক্ষ্মণ ভরত প্রমুখের জন্মকথায় তিনি কতটা লোকজ ভাবনার দ্বারা চালিত। লোকায়ত জীবনের এই অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে পাশাখেলার মতো লোকক্রীড়ার উল্লেখে। সখি-পরিবৃতা রাম ও সীতা অন্তঃপুরে বসে বাজি রেখে পাশা খেলছেন— এ নিতান্তই কবির লৌকিক কল্পনা। বাজির সূত্র ধরে এসেছে শৃঙ্গার রসের লঘু প্রলেপ যা আর্ষ রামায়ণী গাম্ভীর্যের স্থলে লোকজীবনের সাদামাটা হাস্য-পরিহাসকে উপস্থাপিত করে। এ রামায়ণেও রাম-সেবক হনুমান উপস্থিত। তবে একটু ভিন্নভাবে বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসের মতো প্রভুর প্রতি ভৃত্যের প্রশ্নহীন আনুগত্য দেখাননি চন্দ্রাবতী। কুকুয়ার দ্বারা সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে রাম সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার সামনে ঠেলে দিলে প্রভুর প্রতি হনুমান ক্ষুণ্ণ হন এবং প্রথা-বহির্ভূতভাবে রামের সমালোচনা করেন। আর রামভক্তের সাত্ত্বিক মহিমা ঘুচে যায় তখন যখন লব-কুশ বনের মধ্যে এই মহাবলীকে বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে চলে এবং ভার লাঘবের জন্য কুশ তার ল্যাজ কেটে দেবার প্রস্তাব দেয়। চন্দ্রাবতীর কাব্যে লোকায়ত আবহ আবারও ধরা পড়েছে বাংলার বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর উল্লেখে। কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র জন্ম নেবার পর রাজকুমারের মঙ্গল কামনায় যেসব দেবীর পূজা হয়েছিল তাদের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, বনদুর্গা, সুবচনী, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী ও ডরায়্যা ডাকিনী অন্যতম। এঁরা বাংলার শিশু-রক্ষয়িত্রী অপৌরাণিক দেবী হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত ও পূজিত। একটি উত্তর-ভারতীয় আখ্যানকে এভাবে চন্দ্রাবতী বাংলাদেশের পল্লীনির্ভর গল্পে রূপান্তরিত করেছেন।

প্রসঙ্গের ছেদ টানি চন্দ্রাবতীর রামায়ণটির প্রাকরণিক গোত্র-বিচারের কথা দিয়ে। বাল্মীকির রচনাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন মৌলিক মহাকাব্যের একটি অসামান্য ভারতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকৃত। সে গ্রন্থকে অনুসরণ করে বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝা যে ভাবানুবাদ বাঙালী পাঠকের সামনে পেশ করেছিলেন কবি তাকে 'পাঁচালি' বলে উল্লেখ করলেও এ রামায়ণ বঙ্গীয় জাতীয় মহাকাব্যের অভিধা লাভে সক্ষম হয়েছে। এই নিরিখে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ মূলানুসারী কোন অনুবাদ নয়, এমনকি মূল বাল্মীকি রামায়ণের ভাবগত প্রতিধ্বনিও তার মধ্যে ধরা পড়েনি। বাল্মীকি যেখানে তাঁর আখ্যানে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন 'রমোদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ' এই সত্য, সেখানে চন্দ্রাবতী বোধহয় আখ্যানসূত্রে বলতে চেয়েছেন এই কথা— 'ন তু রাবণাদিবৎ ন তু রামাদিবৎ'। অর্থাৎ তাঁর চোখে রাম ও রাবণ দুই-ই অনাদর্শ, দুই-ই সমালোচনাযোগ্য পুরুষ। এই 'চোখ' যে ভিন্ন এক অবস্থানে রক্ষিত চন্দ্রাবতীর কাব্য পরিকল্পনায় ও চরিত্রচিত্রণের বিভিন্ন মাত্রায় সেটা বোঝা যায়। পাপাধারী রাবণের মতো রাম হয়তো বহুগামী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চরিত্রে ভ্রান্তিও কম নেই। চন্দ্রাবতী-চিত্রিত এই রাম সন্দেহপরায়ণ, বোধবুদ্ধিহীন, অবিবেচক এক পুরুষ। প্রজাদের সংশয় দূর করতে নয়, ভগ্নী কুকুয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে বনবাসে প্রেরণ করেছেন। সীতার সতীত্বের পরীক্ষাতেও এই রামকেই বেশি সক্রিয় হতে দেখা যায়। এভাবে কাহিনীর মধ্যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন করে চন্দ্রাবতী রঘুকুলবীর রামচন্দ্রের মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যদ্যোতক চরিত্রগৌরবকে ম্লান করে সীতার অশেষ দুঃখভোগের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত

করেছেন। কবির এই প্রেক্ষণবিন্দুর পরিবর্তন রচনাটির গোত্রবিচারে অন্য এক সম্ভাবনার দিকে পাঠককে ঠেলে দেয়। বাল্মীকির রামায়ণ ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখ দিয়ে দেখা কোন এক অশেষ গুণসম্পন্ন পুরুষের মহনীয় কার্যকলাপ। আর চন্দ্রাবতী তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে অপর লিঙ্গের দৃষ্টি নিয়ে। এই কারণে আখ্যানটি সীতার দিক থেকে মূলত উপস্থাপিত। এই কারণে 'নরচন্দ্রমা' রাম নন, জনমদুখিনী সীতাই তাঁর কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। রচনাটিকে নারীপ্রধান করে তোলার উদ্দেশ্যে আরো তিনটি নারী চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এঁকেছেন চন্দ্রাবতী। এঁরা হলেন মন্দোদরী, সত্য ও কুকুয়া। উপস্থাপিত আখ্যানে এই তিন নারীর বিশেষ ভূমিকা ও চরিত্রের বিশিষ্টতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সীতার সঙ্গে এই তিন নারীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রাজা দশরথের তিন রানী ও কৈকেয়ী-দাসী মন্থরা ছাড়া সীতার সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছেন আর এক নারী, তিনি জনক-মহিষী। এইসব নারী চরিত্রের প্রেক্ষাপটে রাম চরিত্রের বদলে অবতলবর্তী সীতাকে কবি করে তুললেন সবিশেষ উজ্জ্বল, সীতার 'জন্মদুখিনী' অভিধাটিও কল্পিত কাহিনীর বয়ানে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চন্দ্রাবতী। সীতা জন্মের পূর্ব লগ্ন থেকেই অবিচার ও নিগ্রহের শিকার। স্বামীপ্রেম-বঞ্চিতা মন্দোদরীর গর্ভে তার ডিম্বরূপে জন্ম। জ্যোতিষীর গণনা শুনে রাবণ ডিম্বটিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হলেন। অবশেষে মন্দোদরীর অনুরোধ রক্ষা পেয়ে ডিম্বরূপী সীতাকে কটরাবদ্ধ হয়ে অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যেতে হয়েছে। সীতার বিবাহ-পরবর্তী বধূজীবনও সুখের ছিল না। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম বনবাসে যেতে বাধ্য হলে স্বামীগতপ্রাণা সীতাও হাসিমুখে বনবাস দুঃখ বরণ করে নেন। অতঃপর ঘটলো রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। নারীত্বের সে আর এক লাঞ্ছনা। লঙ্কাযুদ্ধ শেষে সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলেও কুটবুদ্ধি সম্পন্না কুকুয়ার চক্রান্তে আবার দুঃখভারাক্রান্ত হয়েছে সীতার জীবন। অথচ এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রাবতী সীতাকে শান্ত, নিরুত্তাপ করেই রেখেছেন। যে রামের অবিবেচনায় তাঁর অরণ্যে নির্বাসন, সেই স্বামীর প্রতি কোথাও কোনও রাগ-দ্বেষ-অভিমান নেই, বরং সবকিছুকে 'কপালের দোষ' বলেই গণ্য করেছেন সীতা। বনে নির্বাসনের অন্তিম মুহূর্তে দেবর লক্ষ্মণের মারফতে আন্তরিকভাবেই জানিয়েছেন শ্রীরামের চরণে 'কোটি নমস্কার'। একইভাবে রামের মুখে সতীত্বপরীক্ষক অনলে প্রবেশের কথা শুনে এই সীতা কোন শঙ্কাবোধ করেন না, কেবল ব্যথিত হন প্রিয়তমের চাঁদমুখের বদলে শুকনো মুখ দেখে। রামচন্দ্রের এই নিরানন্দের কারণ যদি সীতা হয়ে থাকেন, আর অগ্নিপরীক্ষায় যদি সে মুখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তবে স্বামীর সুখের জন্য সীতার অনলে প্রবেশ করতে আপত্তি নেই। আসলে আত্মসুখ নয়, রামের সুখই এক্ষেত্রে সীতার অন্বিষ্ট। চন্দ্রাবতী সীতা চরিত্রে এই গভীর স্বামীপ্রীতিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন, যার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে চৈতন্যোত্তর কালের ভাবসাধিকা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী রাধার।

প্রিয়তমের জন্য আত্মবলিদানের এমন দৃষ্টান্ত কি আমরা এই কাব্যের রচয়িত্রীর ব্যথিত জীবনের মধ্যে খুঁজে পাই না?

প্রেমিকা নারী হিসাবে সীতার এই চরিত্র-গৌরবটুকু তুলে ধরা ছাড়া চন্দ্রাবতী তাঁর কাব্যে সীতার সংগ্রামী সত্তাটিকেও তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী মহাকাব্যগুলি যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা-সম্বলিত হবে। চন্দ্রাবতী জানতেন তিনি এক অমর মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণের নতুন এক পাঠ নির্মাণ করতে অগ্রসর হয়েছেন, যেখানে পুরুষের তুলনায় নারীরই প্রাধান্য। মূলত পুরুষ সংগ্রাম করে বহির্জগতে, নারীর লড়াই অন্দরে।পুরুষের হাতিয়ার ধাতব অস্ত্র, নারীর সহায় সহিষ্ণুতা ও ক্রন্দন। নারীমুখ্য এই কাব্যে চন্দ্রাবতী রণক্ষেত্র বর্ণনায় এই আবশ্যিক প্রসঙ্গটি সীতা ও অন্যান্য রমণীদের তরফ থেকে অন্যভাবে সংস্থাপিত করেছেন। তবে এ যুদ্ধ পুরুষের অস্ত্র ঝনৎকারসমৃদ্ধ দৈহিক বল প্রদর্শনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নয়, বরং আপন অন্তরের গভীরে তীব্র রক্তক্ষরণের মানসিক যুদ্ধ। এ বিষয়ে একজন গবেষিকা লিখেছেন, 'সীতা এখানে ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে শারীরিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু অন্তরঙ্গে সংসার রণক্ষেত্রে মানসিক যুদ্ধে সে আসক্ত লিপ্ত। সেই যুদ্ধ ঠিক রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও নয়, এ যুদ্ধ হল রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বহীনতা, বুদ্ধিহীনতা, অবিবেচনা প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধে সীতার অস্ত্র তাই হয়ে উঠেছে রামের প্রতি তার একগামিতা, নির্ভেজাল প্রেম, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিজের প্রতি অসম্ভব আস্থা, আর অদ্ভুত এক নীরবতা।' ('চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ'— কোয়েল চক্রবর্তী) সীতার জীবনে এই সংগ্রাম এক-একটি পর্যায়ে এক-একভাবে রূপ নিয়েছে। জননী মন্দোদরীর প্রতিরোধ সত্ত্বেও ডিম্বরূপী সীতার বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে ভেসে যাওয়া, রাবণ কর্তৃক আহৃতা হয়েও মানসিক তেজে নিজের শুচিতা বজায় রাখা কিংবা অরণ্যে নির্বাসিতা হয়ে লব-কুশকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বড় করে তোলার আয়োজনে সীতাকে যেসব মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কেবল রণক্ষেত্রে ঢাল-তলোয়ারের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। এই একই লড়াই, স্বল্প হলেও, মন্দোদরী চরিত্রে উপস্থিত করেছেন কবি। সঙ্গে প্রবল মানসিক বেদনাও। স্বামীর দুরাচারিতার কারণে যিনি অপমানিত হয়ে নিজেই জীবন থেকে বিদায় নিতে চাইলেন, বোধহয় ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তা থেকে মুক্তি মিলল না তাঁর। আরো যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য বিধাতা তাঁকে গর্ভবতী করলেন। কিন্তু মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা ঘটলো না তাঁর। মন্দোদরীর উদর থেকে ডিম্ব প্রসূত হলে রাবণ স্ত্রীর মাতৃত্ব ও বাৎসল্যকে গুরুত্ব না দিয়ে আপন স্বার্থ সুরক্ষার কারণে ডিম্বটিকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিলেন। বহুবল্লভ রাবণের কাছে যে স্ত্রীর মূল্য কিছুই ছিল না, এই নিষ্ঠুর ঘটনায় তার স্বাভাবিক জননীত্বকেও অস্বীকার করা হল। নিক্তির বিচারে, মন্দোদরীর অবস্থানটি যেন সীতার তুলনায় আরো বেশি দুর্বল, আরো বেশি করুণ। চন্দ্রাবতী রামায়ণের উপাখ্যানভাগে

এভাবেই বারে বারে স্থান পেয়েছে বঞ্চিত লাঞ্ছিত নারীর কথা। পুরুষ সমাজে নারীর অবস্থান কী, তারা কতটা ও কীভাবে পুরুষতন্ত্রের শিকার হয় নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে চন্দ্রাবতী তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর রচিত রামায়ণে। যেকালে এ দেশে নারীবাদের কেউ নাম শোনেনি, অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারতো না, সেকালে গ্রামীণ এক সংস্কৃতিতে লালিত নারীর মধ্যে এ জাতীয় বোধ কেমন করে কোথা থেকে উদ্ভূত হল, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বোঝা যায়, এক অন্য রকমের সৃজনী-প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা চন্দ্রাবতী, আর সেই প্রতিভার টুকরো ইস্পাতটিকে আরো ক্ষুরধার আরো শানিত করে দিয়ে গেছে তাঁর ভাগ্যহত জীবন। ভারতবর্ষের আদি মহাকাব্যের সুপরিচিত আখ্যানকে দেখতে চেয়েছেন অন্যরকম দৃষ্টিকোণে, যা আজকের তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'নারীবাদী' বলে চিহ্নিত হতে পারে। বিষ্ণুর অবতার রাম নন, বরং লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সীতাই তাঁর ভাবনার ভরকেন্দ্র। এই জন্মদুখিনী নারীকে কেন্দ্রভূমিতে রেখে তাঁর এই বিনির্মিত সৃষ্টি সত্যসত্যই হয়ে উঠেছে অভিনব, প্রাতিস্বিক— যা 'রামায়ণ' নামের প্রতিস্পর্ধী হয়ে 'সীতায়ন' অভিধা লাভের যোগ্য এবং একই সঙ্গে নারী-মহাকাব্য হয়ে ওঠার দৌড়ে এ রচনা অনেকটাই এগিয়ে। আজকের নারীবাদীদের সাহিত্যোপভোগের নান্দীপাঠ ঘটতে পারে এই লৌকিক, মৌখিক, প্রায়-অপরিচিত একটি শীর্ণ অবয়বের রচনার মধ্য দিয়ে। চন্দ্রাবতীর একালের সন্ততিরা তাঁদের চিন্তাবিশ্বকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করে নিতে পারেন এই তথাকথিত ভুয়ো ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ মধ্যযুগীয় রচনায়।।

মধুসূদনের সমকালীন মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা (১৮৬১-১৮৭৩)

সন্তোষকুমার মণ্ডল

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি প্রথম ৫টি সর্গ সংকলিত হয়ে মেঘনাদবধকাব্য ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। মাত্র ছ'মাস পরে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ঘটে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। এক বছরের মধ্যেই মেঘনাদবধকাব্যের এক সহস্র কপি নিঃশেষিত হওয়ায়, পরের বৎসর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'মেঘনাদকাব্য' প্রকাশিত হল। এ প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্ত বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে ৪ জুন ১৮৬২ তে এক পত্রে লেখেন,

> "Meghnad is going through a second edition with notes, and a real B.A has written a long critical preface, echoing your verdict= namely, that it is the first poem in the language."
>
> (পত্রসংখ্যা ৭৭, সাহিত্য সংসদ 'মধুসূদন রচনাবলী')

হেমচন্দ্রের সম্পাদনায় মেঘনাদবধকাব্য পুনরায় প্রকাশিত হতে চলায় মধুসূদন যতই খুশি হন না কেন, রাজনারায়ণের সমালোচনা-প্রতিভার প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি আস্থাবান ও নির্ভরশীল ছিলেন। তার মন্তব্যের জন্য সর্বদা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। মেঘনাদবধকাব্য রচনাকালীন নানা চিঠিপত্রে রচনা-অংশ প্রেরণ করে মন্তব্য জানতে চেয়েছেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার আগেও রাজনারায়ণকে উপরোক্ত পত্রে আরো লেখেন 'Remember your friend and take care of his fame.' প্রিয় বন্ধুর কাছে মধুসূদনের এই প্রত্যাশা অনেকটা দুরাশাই বলতে হয়। মধুসূদনের জীবনীকার গোলাম মুর্শিদ 'আশার ছলনে ভুলি' গ্রন্থে স্পষ্টতই মন্তব্য করেন,

> "কবি অবশ্য ভুল প্রত্যাশা করেছিলেন। পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যেও রাজনারায়ণের মেঘনাদ-সম্পর্কিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি।" (পৃ ২৩৪)

মধুসূদনের জীবৎকালে মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কিত রাজনারায়ণের সমালোচনা উভয়ের মনোগত অভিজ্ঞান পত্রের আধারেই রয়ে গেছে। সমকালীন কোন সাময়িকপত্রে কিংবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

তবে ঐ সময়ের কিছু পত্র-পত্রিকায় মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উঠে এসেছে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকায় বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য বলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরের বছর মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হলে 'বঙ্গমিহির' পত্রিকা মন্তব্য করে যে মেঘনাদবধকাব্যই বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৭৮৩ খ্রিঃ) "মেঘনাদবধকাব্য বিশ্লেষণ করে তার আর্বিভাবের গুরুত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

... "বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধহয়, সরস্বতীও তাহা জানিতেন না।"

"— শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

...আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না, আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।"

(সাহিত্যসাধক চরিতমালা-২/ পৃ. ৫৮-৫৯)

—এ সমালোচনা একান্তভাবেই আবেগতাড়িত। প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি।

কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রশস্তিবাক্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লালবিহারী দে 'ইন্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকায় তার অত্যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে হোমার-ভার্জিল-মিল্টন না পড়ে তাদের চেয়েও মধুসূদনকে বড় বলার জন্য তার অজ্ঞতাকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন,

"মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হইলে আমার পরম বন্ধু ও সমাধ্যায়ী কবিকুলগৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্তের প্রার্থনানুসারে তাহার দোষগুণ বিষয়ে ইংরাজীতে এক পত্র লিখি তাহাও উমেশবাবুর (উমেশচন্দ্র দত্ত) দ্বারা অনুবাদিত হইয়া এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।"

(সাহিত্যসাধক চরিতমালা-৪/ পৃ. ৮১)

'মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচন' নামে সেটি বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ডে সংকলিত হয়েছিল।

অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেঘনাদবধকাব্য— সমকালের সমালোচনায়' প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাথ সোমের মধু-স্মৃতি' গ্রন্থসূত্রে মন্তব্য করেন,

"প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল অনেক আগে।' মধু-স্মৃতি'তে নগেন্দ্রনাথ সোম জানাচ্ছেন যে সমালোচনাটি মেঘনাদবধ প্রকাশিত হবার অল্পপরেই রচিত

এবং এর ইংরাজী অনুবাদ মধুসূদনকে পত্রাকারে পাঠানো হয়।"

(মধুসূদন: ব্যক্তি ও সৃষ্টি/সম্পা. সুকুমার রায়,
ঘোষ দস্তিদার পাবলিশিং/১৯৯৫; পৃ. ৭০)

প্রবন্ধটির লেখক স্বয়ং রাজনারায়ণ বসুর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত ভূমিকায় ব্যক্ত মন্তব্যের সূত্রে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, নগেন্দ্রনাথ সোমের মন্তব্য ও তাতে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন অযৌক্তিক। আসল ঘটনাটি ঠিক তার উল্টো। রাজনারায়ণ প্রথমে ইংরেজিতেই পত্রাকারে লিখে মধুসূদনকে প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে তার রচনাসংকলনের অভিপ্রায়ে সুহৃদ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রবন্ধকারে ঈষৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে বংলা ভাষায় তার অনুবাদ করেন। প্রবন্ধটির পাদটীকায় ঈষৎ পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'মেঘনাদবধকাবের সমালোচন' নামে তা ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জীবনীকার গোলাম মুর্শিদের হিসাব মতো কুড়ি বছর পর বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মূল রচনা মধুসূদন সম্পর্কে রাজনারায়ণের মূল্যায়ন তাঁর সমকালে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশের অব্যবহিত পরে লেখা, তাই সমালোচনার ক্রম মেনে প্রবন্ধটির মূল্যায়নের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে। মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর 'মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচন' প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা। রাজনারায়ণের পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও বিশ্লেষণী শক্তির সমন্বয়ে আমরা অতি মূল্যবান সমালোচনার দর্শন পাই। মধুসূদন বরাবরই রাজনারায়ণের সমালোচনার কেন এত অনুরাগী ছিলেন, এই প্রবন্ধটির পাঠক মাত্রেই তা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন।

রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধকাব্যের সর্গ ধরে ধরে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রাচ্য আলংকারিকদের মতো তিনি অলংকার নৈপুণ্য, রস নিষ্পত্তি, সৌন্দর্য-দৃষ্টির ক্ষেত্রগুলিকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি আবার মেঘনাদবধকাব্যের রচনাশৈলীর দুর্বলতা প্রসঙ্গে ভাবের পরস্পর অনৈক্য, বর্ণনার অতিদীর্ঘতা এবং নীতিগত মহাকাব্যের অভাবকেই সূচিত করেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর সমালোচক দৃষ্টিতে খণ্ডিত বিশ্লেষণই ধরা পড়েছে, মেঘনাদবধকে সামগ্রিকতা মণ্ডিত করে দেখার প্রয়াস পাননি। ফলে তাঁর সমালোচনায় যুগ ও জীবনের অভিঘাত তথা কাব্যের নাড়ী স্পন্দন (Pulse-bit) ধরা পড়েনি।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাসাহিত্য সমালোচনা রীতির রূপকার। অন্তত আরো দশবছর সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা সমালোচনাকে আধুনিকতামণ্ডিত হবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ"-এর মধ্যদিয়ে সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত। তার দশবছর পর

১৮৬২ তে রাজনারায়ণ উপরোক্ত প্রবন্ধটি পত্রকারে ইংরেজিতে লিখেছিলেন। তবে সমালোচনার এই আদি পর্বে রাজনারায়ণের এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য রীতির তুলনামূলক আলোচনাও (comperative study) এসে গেছে। অর্থাৎ আধুনিক সমালোচনারীতির আভাস ঐ প্রবন্ধেও ধরা পড়েছে।

রাজনারায়ণ বসু রচনার শুরুতেই মেঘনাদবধকাব্যকে অদ্বিতীয় সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন।

> "বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করলে তাঁহার 'মেঘনাদবধকাব্য' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

(মেঘনাদবধকাব্যচর্চা/পৃ. ৩২৪)

সমালোচকের দৃষ্টিও উদ্ধৃতিটিতে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তিনি মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের সভাবর্ণনাকে 'অতিশোভন' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় সর্গের সন্ধ্যাবর্ণনার মনোহারত্ব, তৃতীয়সর্গে প্রমীলার যুদ্ধ সজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং ৪র্থ সর্গে পঞ্চবটী বনে স্বামীর সঙ্গে সীতার সুখভোগ বর্ণনায় ও আনন্দকর বিজনবাসের বিবৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পঞ্চমসর্গে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনাও চমৎকার। সপ্তম সর্গে প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

রাজসভার বর্ণনায় মধুসূদন রাজকীয় ঐশ্বর্য দীপ্তি প্রকাশক শব্দ ও উপমাচিত্রের প্রয়োগে ধ্রুপদী কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রাজসভার মধ্যমণি রাজা দশানন— 'হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃ-পুঞ্জ।' রূপ-ঐশ্বর্য ও তেজ প্রকাশক এক অসাধারণ নৈসর্গিক চিত্রকল্প। তাকে ঘিরে শতশত পাত্রমিত্র সভাসদ। রত্নখচিত সভাতলের বর্ণনায়— 'সরস কমলকুল বিকশিত যথা' কিংবা সভাগৃহের বর্ণনায়— নানা বর্ণের সারি সারি স্তম্ভের উপর স্বর্ণছাদ, 'ফণীন্দ্র যেমতি বিস্তারি অযুত ফণা' ইত্যাদি উপমাচিত্রে বর্ণনাকে ভাস্কর্য শিল্পে রূপ দিয়েছেন। অতঃপর ঝালর, চামর, ছত্র দৌবারিকের ভূমিকায় সভার অলংকরণ চাতুর্যে ঐশ্বর্য-বৈভবকে বাড়িয়ে তুলেছে। রাজসভাবর্ণনায় সভার মধ্যমণি রাবণ ও তার সভাসদ, সভাতল, সভাগৃহ ও সভার আনুষঙ্গিক বর্ণনায় পরস্পর সাপেক্ষ সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান উপমাচিত্রের যথাযথ প্রয়োগে ভাস্কর্যশিল্প হয়ে উঠেছে। রাজনারায়ণ বসু সভাবর্ণনায় মধুসূদনের শৈল্পিক দক্ষতা কোথায়, তা দেখাননি ঠিকই, কিন্তু তিনি তা অন্তরে অনুভব করে একে 'অতিশোভন' বলে মন্তব্য করেছেন।

নিসর্গ চিত্রের বর্ণনা বিশেষত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণনা মহাকাব্যের আবশ্যিক শর্ত হিসাবেই গৃহীত হয়েছে। ২য় সর্গের শুরুতে সূর্যাস্তের বর্ণনায় মধুসূদন লিখেছেন,

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠগৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হাম্বা রবে;
আইলা সুচারু-তারকা-শশীসহ হাসি,
শর্করী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুমি কি ধন পাইলা;

সপ্তম সর্গে মধুসূদন সূর্যোদয়ের বর্ণনায় লিখেছেন—

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্নভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুন্দর লহরী
নিকুঞ্জে। বিমলজলে শোভিল নলিনী;
শূন্যে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।'

এই উভয়বিধ বর্ণনাই একই ছাঁচে ঢালা। এখানে রোমান্টিক কবির নিসর্গবিলাস নেই। ভাষার তুলিতে যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি, তাতে রহস্যের কোন ব্যঞ্জনা নেই, তা আমাদের পরিচিত দৃশ্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতো প্রাকৃতিক ঘটনায় প্রকৃতির অনিবার্য ক্রিয়াকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। এতে আবেগ নেই, ক্লাসিককবির সংযম ও ভাব গভীরতা ধরা পড়েছে। রাজনারায়ণ বসু এই বর্ণনাকে মনোহর ও রমণীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধকাব্যের ১ম সর্গে ভগ্নদূত মকরাক্ষ বীরবাহুর বীরত্ব মহিমার বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন,

> 'মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না— "ধন্য শিক্ষা তব কবিবর।"

৩য় সর্গে প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনাতেও অশক্কিনী নারীর বীর্যব্যক্তিত্বের

মহিমাময় প্রকাশ ঘটেছে। সপ্তমসর্গে রাক্ষসদের রণসজ্জারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মধুসূদন দত্ত এই সর্গের রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। যে সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,

> "রাক্ষসদিগের রণসজ্জা বর্ণনা যারপরনাই উৎসাহকর এবং যথার্থ হোমারোপম। যুদ্ধবর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমারের যে সর্গে গ্রীক্ ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়।"

যুদ্ধবর্ণনায় হোমারের গুণাবলীকে গ্রহণ করলেও তার দুর্বলতার দ্বারা প্রভাবিত হননি; হোমারের বর্ণনায় দেবতারা বীর্যব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠ নয়। মধুসূদন দৈববলে বলীয়ান রামচন্দ্র-লক্ষ্মণকেও নবার্জিত মূল্যবোধে বীরত্বের গৌরব দান করেননি ঠিকই কিন্তু তাদের অপরিণত রূপে অঙ্কন করেননি। ইন্দ্রের মুখে ইন্দ্রজিৎ-ভীতিকে বোঝাতে গিয়ে লেখেন,

> 'পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
>
> ততোধিক ডরি আমি তারে।'

— মন্তব্যে রাজনারায়ণ একদা পত্রে ইন্দ্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তুলেছিলেন। আলোচ্য নিবন্ধে এ জাতীয় কোনো অভিযোগ নেই। বরং বানরদের মানব-বীরদের ন্যায় বর্ণনা করার জন্য মধুসূদনের রুচির প্রশংসা করেছেন। মধুসূদন ভূয়োদর্শী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি হোমারের যুদ্ধ বর্ণনার পৌণপুনিকতাকে বর্জন করে মিল্টনের অনুসরণে পরোক্ষে বর্ণনা ও সংবাদে যুদ্ধের আবহ দৃষ্টিতে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ্রের কারুণ্য তাই মধুসূদনে ধরা পড়ে না।

করুণরসের দৃষ্টিতেও মধুসূদনের সাফল্য তর্কাতীত। মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সর্গেই রাজনারায়ণ বসু একমাত্র সন্তান বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদার আর্তিতেই করুণরসের সুনিপুণ উৎসার অনুভব করেছেন। চিত্রাঙ্গদার— 'বরজে সজারু পশি বারুইর যথা' উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'উপমাটি পাইলে হোমারও সৌভাগ্য মনে করিতেন।' চতুর্থ সর্গে অশোকবনে বন্দিনী সীতার কারুণ্যকে এমন ভাবসৌন্দর্যে পরিস্ফূট করেছেন মধুসূদন যে রাজনারায়ণ প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাননি। তাঁর চিত্তে করুণরসের উদ্রেক করে অশ্রুপাতে বাধ্য করেছে। করুণ ও শোকরস বর্ণনা বীর রসের মতোই মহনীয় হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণ ধর্মরক্ষার্থে প্রিয় ভাইপো মেঘনাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠলেও তার পতনে হৃদয়ধর্মে বিভীষণের বিলাপ 'অত্যন্ত শোকোদ্দীপক' হয়ে উঠেছে। নবম সর্গে তেজস্বিনী প্রমীলা অন্যায় সময়ে মেঘনাদের হত্যার প্রতিবিধিৎসায় জ্বলে ওঠেনি, স্বামীবিহনে সর্বস্ব হারানোর আর্তনাদে ফেটে পড়েনি, গভীর বেদনায় প্রমীলা বাক্যহারা, সহমরণে নির্বিকার আত্মসমর্পণ— গভীর শোকের এমন শৈল্পিক আয়োজন বড় কবির লেখনিতেই ধরা পড়ে। রাজনারায়ণ বসু হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণে করুণরসের উৎসভূমিকে চিনিয়ে দেন।

রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধকাব্যে মধুসূদনের প্রথমশ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন। ১. ভাবের পরস্পর অনৈক্য ২. বর্ণনার অতিদীর্ঘতা এবং ৩. নীতিগর্ভ মহাবাক্যের অভাব। এই ত্রিবিধ ত্রুটিকেই রাজনারায়ণ মেঘনাদবধকাব্যের উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠা দানের প্রয়াস পেয়েছেন।

মেঘনাদবধকাব্যে নানা কারণে ভাবের পরস্পর অনৈক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথমত মধুসূদন রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি তাঁর আন্তরিক পক্ষপাত গোপন করেননি, তাদের বাহুবলের ভূয়সী প্রশংসা ও বীর্যব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙালির মনোরঞ্জনের জন্য রাম-লক্ষ্মণাদির প্রতি মমতা ও বাহুবল প্রকাশেও কার্পন্য করেননি। রাজনারায়ণ বসু ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করে লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন প্রসঙ্গে মেঘনাদবধকাব্যে পংক্তি উদ্ধার করেছেন—

> 'বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
>
> শার্দ্দুলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
>
> নিষাদ' ইত্যাদি।

নিজের শিবিরে ফিরে গেলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বীরত্বে কৃতার্থ চিত্তে বলেছেন,

> "লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে
>
> হে বাহুবলেন্দ্র। ধন্য বীরকুলে তুমি!' ইত্যাদি।

একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মধুসূদন লক্ষ্মণচরিত্রে পরস্পর বিপরীত গুণের কথা বলছেন, রাজনারায়ণের মতে এতে ভাবের পরস্পর অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। কবির স্পষ্ট মতামতটি এতে ধরা পড়ে না। রাজনারায়ণের এই মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করতে পারি না। রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব নিজেই বহু চিঠিতে জানিয়েছেন, কাব্যেও তার বহু নিদর্শন আছে। কিন্তু অন্তত এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকৃত অভিযোগ আনা যায় না। প্রথমে উদ্ধৃত মেঘনাদবধকাব্যে অংশবিশেষ কবির বর্ণনামাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি রামচন্দ্রের উক্তি। কোন চরিত্রের উক্তিকে কবির বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। ইন্দ্রজিৎ নিধনে লক্ষ্মণের কৃতিত্বে ও বীর্যব্যক্তিত্বে রামচন্দ্রের এজাতীয় মন্তব্যই তার চরিত্রানুগ। এর মধ্যে কোন শ্লেষের ছোঁয়া নেই। তবে দ্বিতীয় অভিযোগ— বর্ণনার সারল্য উপর্যুপরি উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে কোথাও কোথাও নষ্ট হয়েছে, এতে কোন দ্বিমত নেই। তৃতীয়ত, বিপরীত ভাবোদ্দীপক বিষয়ের যুগপৎ বর্ণনায় পাঠকচিত্তে কোনো বিশেষ ভাবের আবেশ তৈরির অন্তরায় হয়ে উঠেছে। ফলে মাধুর্য নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি বিন্যস্ত একাধিক পরস্পর বিপরীত ভাবের পংক্তি তুলে ধরে রাজনারায়ণ ভাবের অনৈক্যকে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। অশোকবনে বন্দিনী সীতা স্মৃতিচারণের সূত্রে পঞ্চবটী বনে বালিকাসুলভ আমোদপ্রিয় লঘুচপল সীতার হরিণের সঙ্গে নৃত্য, কোকিলের সঙ্গে

দীক্ষাগণ, মধুমক্ষিকা ও হনুমানকে শ্রীমতী-কামচারী বলে সম্বোধন, সীতার সম্পর্কীয় সম্বোধন ব্যবহার করে। রাজনারায়ণের কাছে তা মান্যতা পায় নি।

মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে দ্বিতীয় ত্রুটি 'বর্ণনার অতি দীর্ঘতা' এক্ষেত্রে নরক বর্ণনা ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। রাজনারায়ণ বসু নরক বর্ণনায় অন্যান্য প্রাচীন কবিদের সঙ্গে তুলনা করে মেঘনাদবধকাব্যের ক্ষুদ্র অবয়বে তা দীর্ঘ বলেই মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ বর্ণনার ত্রুটিটি রাজনারায়ণের দৃষ্টিতে গুণগত নয়, পরিমাণগত।

মেঘনাদবধকাব্যের তৃতীয় ত্রুটি 'নীতিগর্ভ মহাবাক্যের অভাব।' এ প্রসঙ্গে তিনি হোমার ভার্জিল কে স্মরণ করেছেন। মহৎ কাব্যের অন্যতম প্রধান গুণই হল, তার শক্তি লোকসমাজে সময়মত কথোপকথনে উদ্ধৃত হয়। অর্থাৎ প্রবাদ প্রবচনে পরিণত হয়। কিন্তু মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্যে তা অপ্রতুল। ভারতচন্দ্রের বহু বাক্য যেমন প্রবাদের রূপ নিয়েছে, মধুসূদনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। রাজনারায়ণ এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রকে মধুসূদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

তা সত্ত্বেও মেঘনাদবধকাব্যই যে নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য তা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন। মধুসূদন যুগন্ধর কবি, তিনিই নবযুগের সৃষ্টিকর্তা। রাজনারায়ণ বসু গেটের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্মন ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেই রূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন।' অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাষাকে সুসংহত, সুদৃঢ় করে তাকে প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর করে তোলেন। মহৎসৃষ্টির লক্ষণই হল বার বার পাঠেও তা 'পুরাতন' বা 'অরুচিকর' হয়ে ওঠে না, নতুন ভাবনায় ও চেতনায় পাঠককে উদ্বোধিত করে। মেঘনাদবধকাব্য নিয়ে সমালোচকের তাই বিস্ময়ের শেষ নেই।

> "পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে, এত অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমারের ইলিয়েড্ ও মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে"

মেঘনাদবধকাব্য গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের পর ইংরেজি ভাষায় রচিত রাজনারায়ণ বসুর এই সমালোচনাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, ইতোপূর্বে পত্রপত্রিকায় যা লেখা হয়েছে, তা আংশিকতা দোষে দুষ্ট, আবেগতাড়িত। মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে এক পত্রে লিখেছিলেন,

> "I find there are many metrical blemishess in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should like to run through one and I to do the needful."

(পত্র, ৭২, মধুসূদন রচনাবলী,
সাহিত্যসংসদ, সম্পা. ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃ. ৫৫০)

প্রথমপ্রকাশের একবছরের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হওয়ায় মধুসূদন সংস্কারের কাজে হাত দেন। ৯ই জুন ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যান্ডিয়া' জাহাজে চেপে ইউরোপ যাবার আগেই মেঘনাদবধকাব্যের প্রথমখণ্ডের সংস্কার সাধন করেছিলেন। অতঃপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সটীক মেঘনাদবধকাব্য দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৬৯ ও ১২৭০ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার পূর্বেই তিনি বিদেশে চলে যান। হেমচন্দ্র মধুসূদনকৃত প্রথম সংস্করণের পাঠই সম্পাদনা করেছিলেন।

হেমচন্দ্র মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে মধুসূদনের প্রত্যাশা মত 'a long critical preface' রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে তাকে দীর্ঘায়িত করতে পারেননি। তাতে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপসন্ধান ও মধুসূদনের কৃতিত্ব অন্বেষণেরও প্রয়াস পেয়েছেন। তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যত্রয় এই ছন্দে রচিত কিন্তু কবিত্ব গুণে মেঘনাদবধকাব্য সর্বোৎকৃষ্ট। 'তেজস্বিতা' ও 'উদ্ভাবকতাকে হেমচন্দ্র মধুসূদনের কবিত্বশক্তির দুই প্রধান লক্ষণ বলে বিবেচনা করেছেন। এই দুই গুণেই তিনি ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভাকে ছাড়িয়ে যান। তা সত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞ ও কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের বাইরে ভারতচন্দ্রের মতো লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠের অভ্যাস নিশ্চয়ই একটি অন্যতম কারণ সেই সঙ্গে শব্দের দুরূহতা, অলংকারের বাহুল্য অন্যতম কারণ। কিন্তু হেমচন্দ্র মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যে নিহিত শক্তির সন্ধান পেয়েছেন বলেই একে 'অত্যুৎকৃষ্ট' বিশেষণ দান করেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের কাছে মেঘনাদবধকাব্য বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হবে, তা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উল্লেখ করেন। সেই ভবিষ্যৎবাণী আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি পাঠকবর্গের কাছে সবিনয় নিবেদন করেন,

> "অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়া মনোনিবেশ পূর্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পরও যদি নিন্দা করেন ক্ষতি নাই; কিন্তু ব্যঞ্জন চাকার মত চাকিয়া যেন নিন্দা না করেন।"

(প্রথম সংস্করণের (2nd edition) ভূমিকা)

হেমচন্দ্র মেঘনাদবধকাব্যের আদ্যোপান্ত পড়েই প্রশংসার পাশাপাশি এর নিন্দাও করেছেন। কাব্যের ভালোমন্দ বিচার প্রসঙ্গে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন,

> কাহাকে ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটী খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন উৎপ্রেক্ষা কোন কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটী, কোন্ পদটী উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপনা করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্ঠি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ঠ হয়।"

হেমচন্দ্রের অভিযোগ মধুসূদন দত্ত পদবিন্যাসকালীন শব্দের হ্রাস বা দীর্ঘতা ছাড়.
প্রয়োগের উপযোগিতা নির্ণয়ে দৃষ্টি দেননি, ফলে উৎপ্রেক্ষাগুলি যথাযোগ্য হয়
হয়নি। এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রকে তিনি মধুসূদনের উচ্চে স্থান দিয়েছেন।

মধুসূদন ও ভারতচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি এক প্রকার নয়। তাই কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি
উভয়ের তুলনা করলে প্রতিভার প্রতি অবিচার হয়। হেমচন্দ্র মধুসূদনের কাছে অন্য
করেও মধুসূদনের দৃপ্তপ্রকৃতি ও কাব্যৌদার্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সমালোচক হিসাবে হেমচন্দ্রের কোনো দৃঢ় প্রত্যয় ধরা পড়ে
অসংগত নিন্দা ও অকারণ প্রশংসা স্ববিরোধী হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর মধুসূদন দত্ত ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬২-১৮৬৭ এই পাঁচবছরে মেঘনাদবধকাব্যের কো
সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। মধুসূদনের অনুপস্থিতিই এর অন্যতম কারণ। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত
ছ' মাসের মধ্যেই মেঘনাদবধকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ (3rd edition) প্রকাশিত হয়
আগস্ট ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্করণেও মধুসূদন কিছু পাঠ বদল করেছিলেন। প্র
প্রকাশের ব্যয়ভার বহনের জন্য মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্য রাজা দিগম্বর মিত্রকে উৎ
করেছিলেন, কিন্তু প্রবাসকালে প্রত্যাশা মতো অর্থ সাহায্য না করায় ক্ষিপ্ত মধুসূদন
খণ্ডের ২য় সংস্করণে উৎসর্গ পত্রটি বর্জন করেন। এই সময় দ্বিতীয় খণ্ডের কো
সংস্করণ হয়নি।

অতঃপর চার মাস পরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর ১ম খণ্ডের ৩য় সংস্ক
(4th edition) ও দ্বিতীয় খণ্ডের ২য় সংস্করণ (3rd edition) একই সঙ্গে মুদ্রিত
প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে সম্পাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম সংস্করণের মুখবন্ধ
প্রত্যাহার করে 'ভূমিকা' শিরোনামে নতুন একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ সংযোজন করে

এই কর্মপ্রয়াসেই স্পষ্ট মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে সম্পাদকের ধ্যানধারণা
বদল ঘটেছে। ১ম সংস্করণের মূল্যায়নকে তার যথাযথ বলে মনে হয়নি। পরিবর্তি
মূল্যায়নে তিনি লিখেছেন,

> "পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে মেঘনাদবধের শব্দবিন্যা
> অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য এবং সে কথা ব্যক্ত করতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষা
> হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কা
> দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলী
> মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত।"

(মেঘনাদবধকাব্য চর্চা/পৃ. ২২১

হেমচন্দ্র অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন, সে ভাবা কখনো সাহিত্যের বিষয় ও
অভিপ্রায় নিরপেক্ষ হতে পারে না। মেঘনাদবধকাব্যের বিষয় ভিত্তি ও কবির অভিপ্রায়
অনুধাবনে সক্ষম হলে তিনি কখনোই বিদ্যাসুন্দরের ভাষার গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত হতেন না।
আসলে ১ম সংস্করণের ভূমিকায় যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল, ৩য় সংস্করণে তা অপনোদনের
প্রয়াস পেয়েছেন।

তিনি ১ম সংস্করণে শব্দের উপযোগিতাকে ভিত্তি করে মধুসূদনের বিরূপ সমালোচনা
করেছিলেন, ৩য় সংস্করণে রসের উপর ভিত্তি করে মধুসূদনের কবিপ্রতিভার ভূয়সী
প্রশংসা করেন।

> 'ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই রচনার মূল উদ্দেশ্য;— ভয়, ক্রোধ,
> আহ্লাদ, করুণা, স্নেহ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ
> করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোনো বিশেষ
> রসে পরিপূর্ণ থাকে তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযুষ পান
> করিয়াই লোকের চিত্তকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার
> প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকর্তা যে অসামান্য
> কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—
> সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে
> পাওয়া যায় না।"

ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তায় হেমচন্দ্র মুগ্ধ ছিলেন। লোকপ্রিয়তাকেই কাব্যের চরম
সাফল্য বিবেচনা করে তার পরিপাটি সর্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাসে তাকেই প্রতিভার পরম
শক্তি বা বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত মূল্যায়নে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের পরিপাটি
শব্দবিন্যাসের গুণে বিদ্যাসুন্দরের সজীবতাকে স্বীকার করেও মন্তব্য করেন,

> 'গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবি কৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন
> ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল।'

কবিকৌলিন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ কল্পনাসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি
বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা বা দৃষ্টি নন্দন ও শ্রবণসুভগ— মধুসূদনে ঢের আছে কিন্তু ভারতচন্দ্রে
বিরল। হেমচন্দ্র ৩য় সংস্করণের ভূমিকায় ভারতচন্দ্রের তুলনায় মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব
প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন।

অতঃপর তিনি মেঘনাদবধকাব্যের চারটি দোষের কথা উল্লেখ করেন। তবে তা
শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নয়। পূর্বের অভিযোগ তিনি তুলে নিয়েছেন।
বাক্যের অন্বয়গত ত্রুটি তুলে ধরেছেন তিনি।

প্রথমত, বাক্যে ব্যবহৃত কর্তা ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনামাদির অন্বয় বিপর্যস্ত

হওয়ায়, তা ভাবার্থ উপলব্ধির অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, মূল বিষয় বা উপমেয়ের একাধিক উপমান একত্রিত করেছেন, যা স… উপযোগী হয়ে ওঠেনি।

তৃতীয়ত, তিনি প্রথাবহির্ভূত ভাবে নামধাতুজ ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করে, তার … প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। শান্তিলা, ধ্বনিলা নীরবিলা, পবিত্রিলা ইত্যাদি।

চতুর্থত, — বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে শ্রুতিকটূ হয়ে উঠেছে।

হেমচন্দ্র প্রদর্শিত ত্রুটিগুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ কিন্তু উপভোগ্যতার প্রশ্নে তেমন অন্ত… নয়। বাক্যের অন্বয় গদ্যশিল্পীর মতো কবি কখনো মান্য করেন না। অন্বয়কে ভেঙে তা… নতুন ছাঁচে ফেলে সাজানোর কৌশলের মধ্যেই কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে। একাধি… উপমা যদি রসভঙ্গ না করে তবে তা দোষের নয়। বরং এতে মধুসূদনের কল্পনাশক্তি… বিস্তার ভাবনার ভাস্কর্যকে বাড়িয়ে দেয়। প্রথা বহির্ভূত নামধাতুজ ক্রিয়ার বহুল ব্যব… প্রথম পাঠকের কাছে অনভ্যাসজনিত কারণে বিসদৃশ মনে হতে পারে, কিন্তু ত… শ্রুতিমাধুর্যও অস্বীকার করা যায় না। মেঘনাদবধকাব্যে বিরাম যতি সংস্থাপনের বাহু… আছে সন্দেহ নেই, তা হুবহু মান্য করে পাঠ করাও শক্ত। তবে তিনি বেশ কিছু পং… উদ্ধার করে শ্রুতি-কঠোরতার অভিযোগ এনেছেন। তাদের একটি— 'রক্ষোবধূ মা… রণ; দেহ রণ তারে / বীরেন্দ্র।'— এখানে 'বীরেন্দ্র' শব্দের পর বাক্য শেষ হওয়… পদাবলীর স্রোতভঙ্গহেতু 'শ্রবণ-কঠোর' হওয়ায় যে অভিযোগ করেছেন, প্রকৃতপ… বীরেন্দ্র শব্দের ধ্বনিগাম্ভীর্যই এখানে 'রণের' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অতঃপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপযোগিত্বের বিচার বিশ্লে… করেছেন। তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরের পরে বিরাম যতি… প্রয়োগ ঘটিয়ে অমিত্রাক্ষর ধ্বনিপ্রবাহের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সৃজনের কথা ব্যক্ত করেছে… বিরাম-যতির প্রয়োগ স্বতন্ত্র্যই পয়ার থেকে অমিত্রাক্ষরকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। হেমচন্দ্র… প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলাভাষার সম্পাদনাকে প্রথম স্বীকৃতি দান করেন। কিন্তু নি… স্বীকরণ করতে পারেননি। বোধকরি, তিনি ঠিকঠাক বোঝেননি বলেই অমিত্রাক্ষর ছ… স্বাচ্ছন্দবোধ করেননি, দীর্ঘ পয়ারে কাব্য রচনা করেছেন।

'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' পত্রিকায় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সরাসরি মেঘনাদবধকাব্য সমালোচ… না হলেও মধুসূদনের কবি প্রতিভার অবমূল্যায়নের প্রয়াস দেখা যায়। সেখানে রঙ্গল… বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মধুসূদনের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে— '... in a poetast… like Mr. Dutta, is simply intolerable. Mr. Dutta is wild, irregular, eccentr… Babu Rangalal is neat, elegant and idiomatic.

(বাংলাসমালোচনার ইতিহাস/অরুণকুমার মুখোপাধ্যা…
পৃ. ৫…

মেঘনাদবধকাব্যের কবিকে 'poetaster' বা নগন্য কবি হিসাবে প্রতিপন্ন করার মধ্যে সমকালে মধুসূদনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হতে হয়। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে মেঘনাদবধকাব্যের পুনঃ পুনঃ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় তার গ্রহণযোগ্যতাও অস্বীকার করা চলে না। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ মেঘনাদবধকাব্যের ৪র্থ সংস্করণ (5th edition) এবং তার চার মাস পরেই ২০ জুলাই ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৫ম সংস্করণ (6th edition) প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের জীবৎকালে এটিই শেষ সংস্করণ হলেও তার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। তবে গ্রন্থটিকে কেউই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। বন্ধুবর রাজনারায়ণ কিংবা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভূয়সী প্রশংসা করেও দ্বিধান্বিত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এককথায় মধুসূদনের সমকালে মেঘনাদবধকাব্য পাঠকচিত্তে মিশ্রপ্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। এমনকি মেঘনাদবধকাব্যকে ব্যঙ্গ করে প্যারোডি রচনা করতেও দ্বিধা করেননি। জগদ্বন্ধু ভদ্র রচিত ১২৭৫ সালের ১২ আশ্বিন অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' তারই উদাহরণ।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'কবিচরিত' (প্রথমভাগ) গ্রন্থটি প্রাচীন কবিদের আলোচনার মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে তিনি মধুসূদন-রঙ্গলাল প্রমুখদের আলোচনার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি বলেই মন্তব্য করেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদকীয় ভূমিকা, রামগতি ন্যায় রত্ন প্রণীত বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের The Calcutta Review (No. 104) পত্রিকায় 'Bengali Literatures' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কবি-লেখকদের পাশাপাশি মধুসূদন সম্পর্কেও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা হয়েছিল। তা থেকে মনে হয় 'কবিচরিতে'র দ্বিতীয়ভাগও প্রকাশিত হয়েছিল। কেন না, দ্বিতীয়ভাগেই মধুসূদনের আলোচনা পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। পরে জানা যায় সেটির লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বোধকরি প্রবন্ধটিতে সমকালে প্রতিষ্ঠিত দুই ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই বঙ্কিম স্বনামে আত্মপ্রকাশে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও সাহিত্যরসিক। তিনিই বাংলাসাহিত্য সমালোচনার আদর্শমান প্রস্তুত করেছিলেন। অকারণ স্তুতি কিংবা নিন্দার পথ পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিতে মেঘনাদবধকাব্যের দোষগুণ বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। 'Bengali Literature' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

"... the Meghanadabadh is Mr. Dutta's great work. ... To Homer and

Milton, as well as to Valmiki, he is largely in debted in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali Literature."

বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো হোমার-মিল্টন-বাল্মীকির চেয়ে মধুসূদনকে বড় কবি বললেন না, রাজনারায়ণের মতো গেটের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করলেন না, হেমচন্দ্রের মতো প্যারাডাইস লস্টের তুলনায় মেঘনাদবধকাব্যকে নিকৃষ্ট অভিধা দিলেন না, বললেন, হোমার-মিল্টন বাল্মীকির কাছে নানাবিধ গৃহীত ঋণ নিজের মতো করে ব্যবহার করে অভিনব এক মহৎদৃষ্টি সম্পন্ন করলেন। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যা অদ্বিতীয় সম্পদ। কাহিনী, চরিত্র ঘটনা যা তিনি হোমার-মিল্টন-বাল্মীকি থেকে গ্রহণ করেছেন তা মধুসূদনের হাতে 'trancreation' বা অনুসৃজন হয়ে উঠেছে। কাহিনী হয়ে উঠেছে মধুসূদনের নিজস্ব, জাতীয় সংস্কারে আঘাত হেনেও মধুসূদনসৃষ্ট চরিত্রেরা পাঠকের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। অতিলৌকিক ঘটনা অপূর্ব কৌশলে বর্ণিত হয়েছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা-অলংকারের প্রাচুর্য থাকলেও তা সৌন্দর্যে মাধুর্যে গাম্ভীর্যে ভীষণতায় মহাকাব্যের উপযোগী হয়ে উঠেছে। অব্যর্থ শরসন্ধানে তিনি অমিত্রাক্ষরের উপযোগী শব্দচয়ন ও তাতে ভাবের প্রবাহমানতাকে গতিময় করে তুলেছেন। পূর্ববর্তী সমালোচকদের মতো বঙ্কিম খণ্ডদৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা করলেন না, লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের সত্যরূপ উদ্ভাসিত হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধে মেঘনাদবধকাব্যের যথাযথ মূল্যায়নে তিনটি কথা বলেছেন। এক, দুরূহ শব্দের বহুল প্রয়োগ। দুই, উপমাদি প্রয়োগের পৌণঃপুণিকতা এবং তিন, শ্রুতিকটু নামধাতুজ শব্দের ব্যবহার। এই তিনটি অভিযোগই প্রকান্তরে পূর্ববর্তী সমালোচকেরা করেছেন। কাব্যের দুরূহতা আর দুর্বোধ্যতা এক নয়। শব্দ শিক্ষিত পাঠক সহজেই শব্দার্থের দুরূহতা অতিক্রম করতে পারবেন। মেঘনাদবধকাব্যের পাঠকের অবশ্যই বাংলা ভাষায় যথেষ্ট অধিকার থাকতে হবে। উপমাদির পৌণঃপুণিকতা এবং নামধাতুজ ক্রিয়ার প্রয়োগ সর্বত্র শ্রুতিকটু হয়ে উঠেছে এমন নয়। এগুলি মধুসূদনের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি নির্মিতির সহায়কও বটে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু (২৯ জুন, ১৮৭৩) বছরে প্রথম প্রকাশিত হল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।' গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে প্রদত্ত তারিখ ১২ই আষাঢ় শকাব্দ ১৭৯৫। মধুসূদনের মৃত্যুর পূর্বেই গ্রন্থটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

রামগতি ন্যায়রত্ন মেঘনাদবধকাব্যের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে সমকালে সাহিত্যপ্রেমী

'বাঙ্গালাবিনোদীদিগের' দুটি দলে বিন্যস্ত করেছেন। একদল মেঘনাদের অতি প্রশংসাকারী, অন্যদল অনর্থক নিন্দুক। রামগতি কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে 'ঘোল ষাঁড়ে'র মতো উভয়দলেই থাকবার পক্ষপাতী। কেননা, প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই তার অভিপ্রায়।

রামগতি ন্যায়রত্ন মেঘনাদবধকাব্যের 'কবিত্ব', 'পাণ্ডিত্য', 'সহৃদয়তা' ও 'কল্পনাশক্তি'— চারটি গুণের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই চতুর্গুণে মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্যকে সর্বোৎকৃষ্ট রত্নের মর্যাদা দিয়েছেন।

> "বাঙ্গালায় বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিত রূপ সম্ভাব বিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইনি সেরূপ করেন নাই; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহন করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটিকে যেরূপ বীরপুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদ স্বরূপ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে।"
>
> (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব/পৃ. ২১৯-২২০)

পূর্বসূরিদের মতো রামগতি ন্যায়রত্নও মেঘনাদবধকাব্যের কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের নিজস্ব নিয়মে গঠিত নামধাতুজ ক্রিয়া তার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। 'মরি কিবা', হায়রে যেমতি' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের বহুল ব্যবহার রামগতির নিকট হাস্যস্পদ বলে মনে হয়েছে। উপমার রূপকাদি অলংকারের প্রয়োগ উৎকৃষ্ট হলেও কোথাও কোথাও তা উৎকট হয়ে উঠেছে। তিনি মাইকেলের বিরুদ্ধে— অভিধান দেখে অপ্রচলিত কঠিন শব্দচয়নের অভিযোগ এনেছেন। দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগে মেঘনাদবধকাব্য 'প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা' চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা আয়ত্ত করতে পারেননি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কেও রামগতি ন্যায়রত্ন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। মেঘনাদবধকাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোনো কৃতিত্ব নেই বলেই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে মিত্রাক্ষরের মতো পংক্তিশেষে ভাব সমাপ্তি ঘটে না এবং এই ছন্দের ওজস্বিতা গুণসম্পন্ন, সে সম্পর্কে সচেতন হয়েও তিনি তা সম্পূর্ণরূপে মান্য করেননি। মিত্রাক্ষরেও বীররসের উৎসার সম্ভব। মধুসূদন নতুন কিছু আমদানি করে তার প্রবর্তক হওয়ার অভীপ্সা চরিতার্থ করতেই বাংলায় মিল্টনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আমদানি করেছেন বলেই তাঁর অভিমত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

> "অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে, ও রূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম,

তাহা ছন্দের গুণে নহে— কবিত্বের গুণে।'

(বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তা
/পৃ. ২২

রামগতি ন্যায়রত্নের মতো অনেকেই মধুসূদনের সাহিত্যিক বিদ্রোহ তথা সংস্কা বিরুদ্ধতার মধ্যদিয়ে ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ তাঁর সমকা মেনে নিতে পারেননি। মেঘনাদবধকাব্যের কাব্যগুণকে স্বীকার করেও নিন্দাবাদে মুখ হয়েছেন। আসলে মেঘনাদবধকাব্য সমকালের সাহিত্যরুচির অনুকূল ছিল না, তাই তা যথাযথ মূল্যায়নে সমকালের সাহিত্য-বোদ্ধারা ব্যর্থ হয়েছেন। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই তা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনিই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে শক্তির কেন্দ্রবিন্দুটিকে অনুধাব করেছিলেন। সেই ছন্দ মধুসূদনের কবিত্বকে সাফল্যে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে বলেই, তি তার বিরূপ সমালোচনায় বিরত থেকেছেন।

লোকসাহিত্যে মহাকাব্য প্রসঙ্গ: প্রসঙ্গ বাংলার লৌকিক ধাঁধা

ড. সৌগত চট্টোপাধ্যায়

প্রচলিত ধারণায় লোকসাহিত্য সংহত সমাজের নিরক্ষর মানুষের রচনা। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন জাগে, এ হেন মানুষজন কর্তৃক সৃষ্ট লোকসাহিত্যে মহাকাব্য প্রসঙ্গের অবতারণা হল কি করে? মহাকাব্য-পাঠ ব্যতিরেকে তো আর যাই হোক পৌরাণিক ঘটনা অথবা চরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মহাকাব্য-ভিত্তিক ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা অথবা লোকনাট্য, গীতিকা প্রভৃতি রচনা করা। এক্ষেত্রে তাই প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, নিরক্ষর মানেই কিন্তু অশিক্ষিতকে বোঝায় না, জ্ঞানলাভের একমাত্র মাধ্যম যে গ্রন্থপাঠ তাও নয়, দেখে অথবা শুনেও শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব। লোকসাহিত্যের রচয়িতারাও ঠিক তেমনিভাবে মহাকাব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন বলে সহজেই অনুমান করা চলে। এখনও গ্রামে গঞ্জে যাত্রা, পাঁচালি, কথকতার আসর বসে, চণ্ডীমণ্ডপ অথবা বারোয়ারিতলায় রামায়ণ-মহাভারত কিংবা অন্যান্য পুরাণপাঠের আয়োজন আজও লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। এবং তখন যে এর প্রসার ছিল আরো ব্যাপক তা হলফ করেই বলা যায়। মিডিয়ার প্রসার যখন ছিল না তখন এসব লোকমাধ্যম থেকেই গ্রামের সাধারণ মানুষ বা সংহত লোকসমাজ চিত্তবিনোদন ও শিক্ষা দুয়েরই খোরাক সংগ্রহ করতেন। এসব আসর থেকেই লোকসমাজ পুরাণের নানা ঘটনা ও চরিত্র সর্ম্পকে তাঁদের ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন, যার রূপায়ণ ঘটেছে তাঁদের রচিত লোকসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি বিভাগে। তবে পুরাণের অবিকৃত রূপ যে সর্বদাই এগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তা নয়, তাই কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, এগুলির মধ্য থেকে পৌরাণিক তথ্য সংগ্রহ করা খুব একটা নিরাপদ নয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, 'নিরাপদ' না হলেও লোকসমাজ যে কেমনভাবে ধ্রুপদী পুরাণের সঙ্গে নিজেদের 'কল্পনা যুক্ত করে' দিয়ে লোকসাহিত্যের 'কাল্পনিক রূপ নির্মাণ করেছেন তাও লক্ষ্য করার, এও লক্ষ্য করার, রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে তাদের আগ্রহী মানসিকতাও। রামায়ণ মহাভারত অথবা সেই সবের অনুষঙ্গ কেমনভাবে আমাদের লৌকিক ধাঁধায় আত্মপ্রকাশ করেছে তার কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করা গেল।

কথিত হয় প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। প্রথম জীবনে বাল্মীকি ছিলেন দস্যু রত্নাকর। পথের মাঝখানে পথিকদের আক্রমণ করে তিনি সর্বস্ব লুঠ করতেন। একদিন নারদকে এইভাবে আক্রমণ করতে গেলে নারদ তাঁকে মহাপাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, বলেন যাদের প্রতিপালন করতে গিয়ে তিনি আজ মহাপাপে লিপ্ত সেই পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রাদি কেউই কিন্তু তাঁর মহাপাপের ভাগ নেবেন না, সমস্ত পাপ তাঁতেই বর্তাবে। গৃহে ফিরে রত্নাকর সকলের কাছে নারদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখেন নারদের কথাই ঠিক, যাদের প্রতিপালন করতে গিয়ে

তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছেন তাঁরা কেউই তাঁর পাপের ভাগ নিতে সম্মত নন। নিরুপায় রত্নাকর তখন নারদের কাছে পাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলে নারদ তাঁকে 'রাম' নাম জপ করতে বলেন। কিন্তু মহাপাপে লিপ্ত রত্নাকরের জিহ্বায় পবিত্র 'রাম' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার বদলে কেবলই 'মরা মরা' উচ্চারিত হতে থাকে। ক্রমে 'রাম' শব্দটি উচ্চারিত হয় এবং দীর্ঘ যাট হাজার বছর তপস্যা করে তিনি সাধনায় সিদ্ধ হন। তপস্যাকালে তাঁর শরীর বল্মীক আচ্ছাদিত হয়ে ওঠে বলে তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। এভাবেই দস্যু রত্নাকর ক্রমে ভাবরত্নাকর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হন। ধাঁধায় কিন্তু অন্য কথা বলা হয়েছে লক্ষ্য করি:

মুখেতে বলিতে রাম আম উচ্চারিল,
কত শত প্রাণী বধ হস্তেতে করিল।
নারদ গুরুর কৃপায় পরম তপস্বী,
হইল খ্যাত ত্রিভুবন নামটি বল কি।
পূর্বে তার পিতামাতা যে নাম রাখিল,
সে নাম পাইয়া লোপ কি নাম হইল।

ধ্রুপদী পুরাণের অবিকৃত রূপ যে সর্বদা ধাঁধায় প্রকাশ পায়নি, এই ধাঁধাটি তার প্রমাণ। মূল রামায়ণে যেখানে বাল্মীকির জিহ্বায় প্রথম 'রাম' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার বদলে 'মরা মরা' উচ্চারিত হওয়ার কথা শোনা যায়, সেখানে এ ধাঁধাটিতে দেখা যাচ্ছে 'আম' উচ্চারিত হওয়ার প্রসঙ্গ। হয়তো এমনও হতে পারে, যে অঞ্চল থেকে ধাঁধাটি সংগৃহীত সেখানকার লোকসমাজ তাদের প্রাপ্ত তথ্যই প্রকাশ করেছেন কোনো বিকৃতি না করে। তবে একথাও ঠিক যে অনেক সময়ে লোকসমাজের মধ্যে পুরাণকাহিনী এমনভাবে প্রচলিত হয় যার সঙ্গে 'পুরাণের মৌলিক রূপের নানাভাবেই বিচ্ছেদ ও বিভিন্নতা' বিদ্যমান।

রামায়ণে নায়ক আর কেউ নন, স্বয়ং রামচন্দ্র। রাজা দশরথের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। সূর্যবংশে তাঁর জন্ম। অজ রাজার নাতি বলেও তিনি জগতে বিদিত। অজ রাজা ছিলেন মহারাজ রঘুর পুত্র এবং দশরথের পিতা। বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীকে তিনি বিবাহ করেন। ইন্দুমতীর গর্ভেই দশরথের জন্ম। একটি ধাঁধায় রামচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে:

সূর্যবংশে জন্ম তার অজ রাজার নাতি
রাবণের বৈরী হয় সীতাদেবীর পতি।

অজ-ইন্দুমতীকে নিয়েও ধাঁধা শুনতে পাওয়া যায়:

ফুলের আঘাতে কাদের মৃত্যু হয়েছিল
স্ত্রী পুরুষের কিবা নাম শীঘ্র করি বল।

ইন্দুমতীর ফুলের আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অজ রাজা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছিলেন। একদিন কুসুমোদ্যানে ভ্রমণকালে একটি পদ্মের মালা নারদের বীণাচ্যুত হয়ে ইন্দুমতীকে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং তিনি স্বর্গে ফিরে যান। লৌকিক ধাঁধাটিতে কিন্তু ফুলের আঘাতে উভয়ের মৃত্যুবরণের কথাই বলা হয়েছে। ধ্রুপদী পুরাণের মৌলিক রূপ যে সর্বদা ধাঁধায় প্রকাশ পায়নি এই ধাঁধাটি তার আরও একটি প্রমাণ।

রামচন্দ্র-পত্নী সীতাদেবীকে নিয়েও বেশ কয়েকটি ধাঁধা রচিত হতে দেখা গেছে। রচিত ধাঁধাগুলিতে সীতার অবর্ণনীয় দুঃখের জীবন, তাঁর সতীত্ব প্রভৃতিই লোককবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে বিশেষভাবে। সীতা ছিলেন জন্মদুঃখিনী। রাজনন্দিনী ও রাজকুলবধূ হওয়া সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কলঙ্কিনী সন্দেহে তাঁকে পাতালপ্রবেশ করতে হয়েছিল। মিথিলারাজ জনক হল্ দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময়ে লাঙলের রেখায় তাকে প্রাপ্ত হন এবং সেই থেকে নিজের কাছে রেখে লালন পালন করতে থাকেন। অযোনিসম্ভবা সীতা পরিচিত হন জানকী রূপে। হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেন। বিবাহের পর রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলে বিমাতা কৈকেয়ী তাঁর পূর্বের কথামতো দুটি বর দশরথের কাছে চেয়ে বসেন। এক বরে তাঁর নিজপুত্র ভরত রাজা হবে এবং অন্য বরে তাঁর সতীনপুত্র রামচন্দ্র বনবাসে যাবে। কৈকেয়ীর প্রার্থনায় অবশেষে রামচন্দ্রের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ নিশ্চিত হয়। বনবাস যাত্রায় অনুজ লক্ষ্মণ সহ পত্নী সীতাদেবীও রামচন্দ্রের অনুগমন করেন। শুরু হয় সীতার কষ্টের জীবন। রাজপ্রসাদ থেকে এসে তিনি উপনীত হন পঞ্চবটীর কুটিরে। এখান থেকেই ছদ্মবেশী রাবণ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে লঙ্কায় উপনীত হন। অশোককাননে বন্দি হন সীতা। সেখানে বিভীষণপত্নী সরমার সাহচর্য লাভ করেন। অবশেষে নানা ঘটনার অবসানে দীর্ঘ যুদ্ধের পর রাবণ সবংশে নিহত হলে হনুমান সীতাকে উদ্ধার করেন। রামচন্দ্র তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হলে স্বয়ং অগ্নি তাঁকে রক্ষা করে কালিমাহীন প্রমাণ করেন। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে ফিরে আসেন অযোধ্যায়। অতঃপর সীতা সন্তানসম্ভবা হন। ইতিমধ্যে ভদ্র নামক জনৈক ব্যক্তির কাছে রামচন্দ্র জানতে পারেন প্রজাদের মনে সীতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্র প্রজাদের সন্তোষ বিধানের জন্য সীতাকে ত্যাগ করতে উদ্যত হন। তাঁকে রেখে আসা হয় বাল্মীকির তপোবনে। সেখানেই লব ও কুশের জন্ম। রামচন্দ্র দীর্ঘদিন পর বাল্মীকির কাছে প্রস্তাব পাঠান সীতা যদি সত্যই নিষ্কলঙ্ক হন তাহলে যেন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দিতে রাজি থাকেন এবং সেজন্য দয়া করে যেন তিনি ও সীতা তাঁকে ভুল না বোঝেন। সীতা তখন আর দুঃখ সইতে না পেরে ধরিত্রীকে বিদীর্ণ হতে বলেন এবং তাতেই তিনি

চিরদিনের মতো আশ্রয় গ্রহণ করেন। সীতার এই পাতালপ্রবেশকে কেন্দ্র করে একাধিক ধাঁধাই রচিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল:

জনমদুঃখী কহে তারে জন্ম দিল বাপে
সে সময়ে মা ছিল না বলে সর্বজনে
সতী হয়ে কলঙ্কিনী সন্দেহে সকলে
সহিতে না পারে দেবী চলে ধরাতলে।

রামচন্দ্র ও সীতার জীবনকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে এসে যায় লক্ষ্মণ ও ভরতের কথা। এঁদের ভ্রাতৃপ্রেমের নজির পাওয়া ভার। বনবাসকালে সীতার পাশে আদর্শ দেবরের মতোই ছিল লক্ষ্মণের অবস্থান। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাঁকে সেভাবেই আঁকা হয়েছে, আঁকা হয়েছে আদর্শ দেবর, যোগ্যভ্রাতা ও বীরপুরুষ রূপে। অন্যদিকে ভরতও রামায়ণে চিত্রিত হয়েছেন অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্য অনুজ রূপে। পুষ্যা নক্ষত্রে মীন লগ্নে তাঁর জন্ম। বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে ভরত ও শত্রুঘ্নের রামচন্দ্রের সঙ্গে একদিনেই বিয়ে হয়। তাঁর স্ত্রী মাণ্ডবী, দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল। অগ্রজ রামচন্দ্রের বনবাসের পর তাঁর পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে ভরত অযোধ্যা শাসন করেছিলেন বলে কথিত হয়। এই লক্ষ্মণ ও ভরতকে নিয়ে দুটি ধাঁধা যথাক্রমে:

১. পশু নয় পশু সাথে করেন ভ্রমণ
কখনো বা যোগী বেশ কখনো রাজন।।
ভ্রাতৃভক্ত বীরপুরুষ আদর্শ দেবর
ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করহ সত্বর।

২. সূর্যবংশে জন্ম তার, অজ রাজার নাতি
দশরথের পুত্র, নয় সীতাদেবীর পতি।
রাবণের বৈরী নয় লক্ষণের জ্যেষ্ঠ
বুঝিয়া সভার লোক কর নির্দিষ্ট।

শত্রুঘ্নকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধায় মধুদৈত্যের পুত্র লবণরাক্ষস বধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দেবতা প্রদত্ত শূলের জন্য মধুদৈত্যের ন্যায় তার পুত্রও অজেয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মহর্ষিরা লবণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে রামের আদেশে শত্রুঘ্ন তাঁকে বধ করেন। অতঃপর লবণের মথুরা রাজ্য নিজ পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে অর্পণ করে সরযু নদীতে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ধাঁধায় অবশ্য এতকথা বর্ণিত হয়নি, কেবল শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণবধের প্রসঙ্গটি উচ্চারিত হয়েছে মাত্র:

লবণ দৈত্যে বধ করে কোনজন
রামায়ণে লেখা আছে করহ প্রমাণ

হনুমানও রামায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রামায়ণ মতে কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে তার জন্ম। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে সুগ্রীবই হনুমানকে রাম-লক্ষ্মণের কাছে প্রথম পাঠান। সীতা উদ্ধারে রামকে তিনি পরম সহায়তা করেন। রামভক্ত হনুমান বলে তাঁর খ্যাতি জগতে বিদিত। তিনি ছিলেন মহাপেটুকও বটে। কথিত হয়, ''হনুমান বায়ুর ন্যায় বেগবান ছিলেন। বৃক্ষ উৎপাটিত ও পর্বত বহন করতেন। প্রশান্ত পর্বতের ন্যায় ছিল তার আকৃতি এবং স্তম্ভের মতো দৈর্ঘ্য''। বীর হনুমানকে নিয়ে রচিত ধাঁধায় অবশ্য হনুমানের এতসব গুণাবলী চিত্রিত হয়নি, কেবল তার বীরত্ব ও পেটুক স্বভাবই লোককবিদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল অধিক। যেমন একটি ধাঁধা:

পঞ্চাশ মন চাউলের অন্ন করিল ভক্ষণ
কেবা হেন পেটুক বীর বলহ এখন।
ভগবানের ভক্ত সেই রামায়ণে আছে।
কি নাম হয় তার বল সভা মাঝে।

রাবণ, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং রাবণের অন্যতমা মহিষী মন্দোদরীকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হতে দেখা গেছে। রাবণের অস্বাভাবিক মুখাকৃতিই ধাঁধা রচয়িতাদের ধাঁধা রচনায় বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশ্রবার ঔরসে নিকষার গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁরা তিনভাই ও এক বোন। বোনের নাম শূর্পণখা। রাবণের 'দশ মাথা, কুড়ি হাত, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কেশ প্রদীপ্ত এবং ঠোঁট লাল', কুবের তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। অধিকাংশ ধাঁধাতেই তাঁর ওই দশ মাথা ও কুড়ি হাতের উল্লেখ পাই, কোনো কোনো ধাঁধায় আবার পাচ্ছি কেবল তাঁর কুড়ি কান ও কুড়ি চোখের উল্লেখ। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের প্রসঙ্গ পাচ্ছি কেবল একটি ধাঁধায়:

সন্ন্যাসীর বেশে কন্যা হরিল কোনজন
শূন্য পথে উড়ে যায় আপন ভবন।
সেই কন্যা হেতু হইল কাহার মরণ
কোন জন হয় ভাই বলহ এখন।

ধাঁধায় অনেক সময়ে উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করতে অপ্রয়োজনীয় পংক্তি অথবা শব্দ বিশেষ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও ধাঁধার প্রথম পংক্তিটি সেরকম বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু তা যে নয় তা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত 'রাবণ ও মন্দোদরী' শীর্ষক পর্যায়ের আরও কয়েকটি ধাঁধা দেখলে বোঝা যায়। ধাঁধাগুলি পাঠ করলে সহজেই অনুমিত হয় এমন একটি ধাঁধার উত্তর যিনি দিতে পারবেন তাঁকে চুন খয়ের সাজিয়ে বাটা পান যেন পারিতোষিক দেবেন বলেই প্রশ্নকর্তা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন:

খয়ের ক্ষুদি বাটার পান
স্ত্রী পুরুষের বাইশ কান,
এ বাটার পান খাবে যে
এ কথার উত্তর দেবে সে।

প্রবাদে বিভীষণকে সুনজরে দেখা হয়নি, 'ঘরশত্রু' বলেই তাঁর অখ্যাতি। কিন্তু ধাঁধায় তাঁর সেই দুর্নাম নেই। পরম ধার্মিকপ্রবর-বলেই ধাঁধার রাজ্যে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভীষণ তাঁর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং ভগ্নী শূর্পণখা সকলেরই অনুজ। রাবণকে বর দিয়ে ব্রহ্মা এঁকে বর দিতে এলে তিনি ধর্মে মতি ও ব্রহ্মাস্ত্র বর চান। গন্ধর্বরাজ শৈলুষের মেয়ে সরমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেন। সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র তাঁকে লঙ্কার সিংহাসনে বসান। মূল রামায়ণে অবশ্য বিভীষণের ভাবমূর্তি খুব একটা উজ্জ্বল নয়— "রাবণ নিহত হলে রাম তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদন করতে বললে বিভীষণ জানান 'ত্যক্তধর্ম ব্রতং ক্রূরং পরদারাভিমর্শনং', অর্থাৎ এরকম ভায়ের সৎকার তিনি করবেন না, বিভীষণের চরিত্র আসলে ভাঁড়ামির পরাকাষ্ঠা।" প্রবাদ তাঁকে ঠিকই চিনেছে।

লবকুশকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা:

পিতার ঔরসে নহে নয় মাতৃগর্ভে
তাহার জনমকালে মা ছিল না ঘরে।
সেই দ্রব্য মহাশয় আশু প্রয়োজন
কৃপা করি উপস্থিত করুন এখন।

ধাঁধাটির উত্তর অবশ্য লব নয়, কুশ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, গ্রামের সংহত সমাজের সাধারণ মানুষ 'কুশ' বলতে লব কুশ উভয়কেই বোঝায়। লব কুশ রামচন্দ্রের পুত্র। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত হওয়ার পর সেখানেই লবকুশের জন্ম। কিন্তু লোকপুরাণের ব্যাখ্যা অন্য। সমগ্র বাংলায় এ নিয়ে যে কিংবদন্তীটি প্রচলিত তা হল— একদিন বাল্মীকির কাছে লবকে রেখে সীতা নদীতে জল আনতে গেলে বাল্মীকি অন্যমনস্ক হয়ে হঠাৎ দেখেন লব কাছে নেই। সীতা এলে কী বলবেন সেই আশঙ্কায় তিনি কুশ নিয়ে লবেরই অনুরূপ একটি পুত্তলিকা নির্মাণ করে তাতে প্রাণদান করেন। হঠাৎ দেখেন লব তাঁর মায়ের সঙ্গে নদী থেকে ফিরছে। সীতা তখন তাকেও তাঁর পুত্র বলে স্বীকার করে নেন। কুশ থেকে জাত সন্তান বলে তার নাম রাখা হয় কুশ। ধাঁধাটিতে কুশের সেই জন্মবৃত্তান্তই বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো ধাঁধায় আবার বাল্মীকিকেই কুশের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেহেতু তাঁরই প্রচেষ্টা কুশের জন্ম। যেমন এই ধাঁধাটি:

পিতার ঔরসে নাহি জন্ম দিল পরে
জনম সময় তার মা ছিল না ঘরে।
কেবা সেই জন্মদাতা কেবা সেই জন
যাহার পিতার নামে পালায় শমন।

রামায়ণের মতো মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করেও ধাঁধা রচিত হতে দেখা গেছে। মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। কৃষ্ণই মহাভারতের নায়ক। বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে স্বীকৃত। দ্বাপর যুগে যদুবংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম বাসুদেব, মাতা দেবকী। কংস তাঁর মাতুল। কংসের হাতে দেবকীর ছয়টি সন্তানের মৃত্যু হলে সপ্তম সন্তানটিকে যোগমায়ার প্রভাবে রোহিনির গর্ভে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে বলে খবর ছড়ায়। অষ্টম গর্ভে জন্ম নেন কৃষ্ণ। পাছে কংসের হাতে তাঁর মৃত্যু হয় সেজন্য পিতা বাসুদেব দৈবাদেশে তাঁকে নন্দের স্ত্রী যশোদার কাছে রেখে আসেন। এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে এসে নিজ সন্তান বলে পরিচয় দেন। একটি ধাঁধায় তাই বলা হয়েছে:

জনমিয়া মাতৃস্তন পান না করিল
পরগৃহে প্রাণভয়ে আশ্রয় করিল।
সর্বশেষে মাতুলে করিল সংহার।
শুনিয়া মঙ্গলবিধি করুন সবার।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের সারথি। অর্জুনের পরিচয় তিনি তৃতীয় পাণ্ডব এবং ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তাঁর জন্ম। সখা অর্জুনের ভগ্নী সুভদ্রাকে কৃষ্ণেরই পরামর্শে তিনি হরণ করে বিবাহ করেন। সুভদ্রা ছিলেন অর্জুনের বৈমাত্রেয় ভগ্নী। পিতা বসুদেবের ঔরসে রোহিনির গর্ভে তাঁর জন্ম। একটি ধাঁধায় অর্জুন সম্পর্কে বলা হয়েছে:

শচীসুত নহে কিন্তু ইন্দ্রের তনয়
পিতামহ ব্যাসদেব জানিবে নিশ্চয়।
ভগ্নী তার ভার্যা হয় একি বিপরীত
মাসিকে শাশুড়ি বলে জগতে বিদিত।

পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন যুধিষ্ঠির। কথিত হয় "শতশৃঙ্গপর্বতে ধর্মের সঙ্গমে কুন্তীর গর্ভে এঁর জন্ম। এজন্য ইনি ধর্ম, ধর্মরাজ, ধর্মপুত্র"। কিন্তু ধাঁধায় দেখি বলা হচ্ছে:

পিতাপুত্রকে এক নারী করে আলিঙ্গন

উভয় ঔরসে জাত উভয় নন্দন।

নাম তাদের কিবা হয় বল দেখি শুনি
মিথ্যা নহে সত্য ইহা শাস্ত্রে আছে জানি।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে: সূর্যের পুত্র কর্ণ, যমের পুত্র যুধিষ্ঠির উভয়েরই কুন্তীর গর্ভে জন্ম।

পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ভীম ও তৎপত্নী দ্রৌপদীকে নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা:

বাতাসে তার বক্ষবস্ত্র সরে যায়
তাই বধূর শ্বশুর সম্ভোগ কম্পিত
রন্ধনে শ্রান্তা হইয়া ভীমের কামিনী
স্তন হইতে অম্বর খসি লুটায় ধরণী
শ্বশুর সম্ভোগ ইচ্ছা বধূ হয়ে যেন
কেমনে সম্ভোগে ইহা করহ সন্ধান।

দ্রৌপদী যেমন ভীমের পত্নী তেমনি ভীম আবার পবনদেব বা বায়ুর পুত্র। ইঙ্গিতে সেই পৌরাণিক অনুষঙ্গটুকুই এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিন রন্ধনকার্যে পটিয়সী দ্রৌপদী রন্ধনকার্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মনে মনে বায়ুকে স্মরণ করেন। বায়ু সম্পর্কে ছিলেন দ্রৌপদীর শ্বশুর। তাই বলা হয়েছে, বধূ হয়ে শ্বশুরের সঙ্গে সম্ভোগ করার ইচ্ছা হয়েছিল দ্রৌপদীর। শান্তনু ও ভীষ্মকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হতে দেখা গেছে। প্রথম ধাঁধাটি শান্তনু এবং দ্বিতীয় ধাঁধাটি ভীষ্মকে নিয়ে রচিত:

১. সমুদ্র জল নাই ছাচা করলে ঢেউ
গঙ্গা ব্যাটা নহি জনম ষোলো বছরের বউ।

২. মহাভারতের মধ্যে বল কেবা মহাবীর
যে বলিতে পারে সেই হবে বীর।

গান্ধারী ছিলেন গান্ধার দেশের রাজকন্যা। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলে তিনি নিজেও চর্মচক্ষু বেঁধে অন্ধ সেজে থাকতেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, ব্যাসদেব বর দিয়েছিলেন গান্ধারীর শতপুত্র হবে। যথাকালে তিনি গর্ভবতীও হলেন কিন্তু কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। অবশেষে গর্ভপাত করালে তাঁর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় এক লৌহমুদগরের ন্যায় কঠিন মাংসপিণ্ড। তা জলে রাখা হলে ক্রমে তা একশোটি ভ্রূণে পরিণত হয়। তা থেকে জন্ম নেয় গান্ধারীর শতপুত্র ও এক কন্যা। ধাঁধা রচয়িতার এ তথ্য অজানা নয়, তবে প্রকাশভঙ্গিতে একটু ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয়। তাই নিম্নোক্ত ধাঁধাটির শেষ পংক্তিতে গান্ধারী কর্তৃক গর্ভ নষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে

তিনি হাহাকার করেছেন:

রাজবাড়ী জন্ম নিল রাজা হল স্বামী
বিধি বল কোনো নারী জগৎ সৃজিল।
চক্ষু থেকে অন্ধসম না দেখিতে পায়
লৌহমুদগরে নিজগর্ভ নষ্ট করে হায়।

গান্ধারীর ভ্রাতা শকুনিকে নিয়েও রচিত হয়েছে ধাঁধা। তাঁর পুত্রের নাম উলুক। সম্পর্কে তিনি দুর্যোধন সহ গান্ধারীর পুত্রকুলের মাতুল। কপট পাশা খেলায় তিনি পাণ্ডবদের হারিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষে থেকে যথাসাধ্য তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন। একটি ধাঁধায় তাঁর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে এইভাবে:

দুর্যোধনের মামা কেবা কালনেমির মতো।
দ্বাপরেতে সেই ছিল ভক্তের মতো ভক্ত।

এ ছাড়াও নানা পুরাণের নানা ঘটনা ও চরিত্র নিয়েও ধাঁধা রচিত হয়েছে। যম ও নারদকে নিয়ে রচিত দুটি ধাঁধা:

১. দুই অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে ভয়
প্রথম অক্ষরে আকার দিলে সর্বলোকে খায়।
পরের অক্ষরে আকার দিলে সর্বঅঙ্গ ঢাকে
তার উপরে তা দিলে আদর করিয়া ডাকে।

২. পিতা হয়ে কোনো পুত্রকে অভিশাপ দিল
চিরকাল সেই শাপে পুত্র ভুগেছিল।

প্রথম ধাঁধাটির উত্তর 'যম' এবং দ্বিতীয়টির উত্তর 'নারদ'। যম মৃত্যুর দেবতা, তাঁর নামে সকলেরই ভয়। শুধু এটুকু বাদ দিলে প্রথম ধাঁধাটিতে আর কোনো পৌরাণিক তথ্য প্রকাশ পায়নি। 'যম'-এর প্রথম অক্ষর 'য'-এ আকার দিলে 'যাম' (প্রকৃত বানান জাম) সর্বলোকে খায়। দ্বিতীয় পংক্তিতে সেকথাই বলা হয়েছে। তৃতীয় পংক্তিতে 'য'-র পরের অক্ষর 'ম'-এ আকার দিলে 'যমা' (বলতে চাওয়া হয়েছে আসলে জামা) সকলেই অঙ্গে পরিধান করে বলে বলতে চাওয়া হয়েছে এবং শেষ পংক্তিতে 'যম'-এর ওপর 'তা' দিলে 'যামাতা' (হবে জামাতা)-কে সকলেই আদর করেন বলে রচয়িতা বলেছেন। দ্বিতীয় ধাঁধাটিতে অবশ্য এক পৌরাণিক ঘটনার ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি নানা স্থানেই নারদের কথা রয়েছে। সাধারণভাবে তাঁকে আমরা নারায়ণের পরম ভক্ত বলেই জানি। শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবেও

তাঁর খ্যাতি। ধাঁধাটিতে অবশ্য পরিচিত সেইসব দিকের প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হ লক্ষ করা যায়। পিতা ব্রহ্মা যে একদা তাঁকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং দিয়েছিলেন, নারদও থেকে গিয়েছিলেন অবিবাহিত, সেকথাই এখানে বলা হয়ে অন্যপুরাণ মতে অবশ্য নারদকে আমরা বিবাহিত দেখি এবং ব্রহ্মার নির্দেশেই তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন নরনারায়ণ। নারদের স্ত্রীর নাম পাচ্ছি সেখানে দময়ন্তী।

পৌরাণিক ঘটনা, চরিত্র বা অনুষঙ্গ সংবলিত এরকম ধাঁধার সংখ্যা সুপ্রচুর। পৌ এবং প্রতিষ্ঠিত ধাঁধার বিভিন্ন সংকলন থেকে প্রাপ্ত ধাঁধার ভিত্তিতে তারই সামান্য আ এখানে দেওয়া গেল মাত্র। পুরাণ কাহিনি যে লোকসমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসব ধাঁধাই তার প্রমাণ। বলতে ভালো লাগছে, নিরক্ষর তাঁরা হতে পারেন কি অশিক্ষিত নন, পুরাণ সর্ম্পকে তাঁদের জ্ঞান বহু ডিগ্রিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও আ ওপরে। পুরাণ কাহিনি তাঁরা শুনেছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে ধাঁধা রচনায় সৃষ্টিশীল স্বাক্ষরও রেখেছেন।

পরিবেশ শিক্ষা— সাম্প্রতিক সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ

উত্তম কুমার মুখার্জি

"আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে।
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা।"

(সবার আমি ছাত্র/সুনির্মল বসু)

উদ্ধৃত পংক্তিগুলির মাধ্যমে সহজেই উপলব্ধি করতে পারি— প্রকৃতি আমাদের প্রধান শিক্ষক। সৌরজগতে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে বিভিন্ন জড় পদার্থ এবং ভৌত ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান। জড় অর্থাৎ অজৈব বস্তু থেকেই প্রাণ এবং যাবতীয় জৈব বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। তাই, প্রাণের বিভিন্ন প্রকার পৃথিবীর যাবতীয় জড় বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। আবার প্রাণের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরতা এবং মিথস্ক্রিয়া বর্তমান। তাই, কোনো সজীব বস্তু বা প্রাণের অস্তিত্ব নির্ভর করে বিভিন্ন জড় বস্তু ও ভৌত ঘটনা এবং অন্যান্য সজীব বস্তুর সঙ্গে উক্ত প্রাণীর মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতির উপর। কাজেই, নির্দিষ্ট দেশ ও কালে যে সমস্ত জৈব ও অজৈব বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে কোনো প্রাণী মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত, সেই সমস্ত জৈব ও অজৈব বস্তু ও ঘটনা উক্ত প্রাণীর পরিবেশ গঠন করে। ব্যাপক অর্থে, পৃথিবীর যাবতীয় ভৌত এবং জৈবিক বিষয় বা তন্ত্রসমূহের নিজেদের মধ্যে এবং পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার সামগ্রিক রূপই পরিবেশ। আর পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ শিক্ষাবিজ্ঞানের (Education) অন্যতম কাজ। তাই পরিবেশ শিক্ষা বলতে বর্তমান নিবন্ধে জায়গা পেয়েছে - পরিবেশের অত্যাবশকীয় এমন কিছু উপাদান, যার সঙ্গে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা, তার বিলুপ্তিতে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার সঙ্কট (যাকে সাম্প্রতিক সমস্যা বলতে পারি) এবং তা থেকে পরিত্রাতা হিসাবে পরিবেশ বিজ্ঞানী তথা প্রাচ্য শিক্ষাদার্শনিক রবীন্দ্রনাথের অবদান। শিক্ষা শব্দটি জীবনের সঙ্গে সমার্থক। (Education is life, life is Education) আর মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অজৈব ও জৈব উপাদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞানীরা সকলেই সহমত পোষণ করেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা হল বংশগতি ও পরিবেশের গুণিতকের ফল।

Heridity x Environment = Personality. সমস্ত জীবের একক DNA (ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) নামক বৃহৎ জৈব অণু। উপাদানগতভাবে এক হলেও

DNA অণুগুলির সজ্জাক্রম এবং সংখ্যা প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রে ভিন্ন। বংশগতির মাধ্যমে প্রত্যেক জীব যে পরিমাণ DNA বস্তু পায়, পরিণত জীবের আকৃতি ও আয়তনের তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ওজন ৩০ কেজি থেকে ১০০ কেজি বা তারও বেশী, কিন্তু যে প্রারম্ভিক বস্তু (পিতা মাতার মিলিত জনন কোষের DNA বস্তু) সেই মানুষের মৌলিক উপাদান, তার ওজন ১ গ্রামের কয়েক সহস্রভাগের এক ভাগ। মৌলিক বস্তু ও পরিণত জীবের আয়তনের এই প্রভেদ আসলে দেহ গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিপোষক পদার্থের যোগফল— যা জীবের পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হয়। কাজেই বংশগতির মাধ্যমে জীবের মৌলিক উপাদান পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা বিকশলাভ করে। সুতরাং জীবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে পরিবেশীয় উপাদানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো জীবকে (উদ্ভিদ বা প্রাণী) আমরা যেভাবে দেখি তা বংশগতি ও পরিবেশের যৌথ উপাদান।

সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে, সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত আছে। প্রাণের আবির্ভাবের পর পৃথিবীর পরিবেশে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। উপাদান সমূহের রাসায়নিক সংগঠনে পরিবর্তন ঘটেছে, এবং সেই পরিবর্তনের ফলে ভূ-প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়েনি। অজৈব ও জৈব পদার্থসমূহের চক্রাকার প্রবাহে উপাদানসমূহের অনুপাত কখনো বিঘ্নিত হয়নি। মানুষের প্রযুক্তিগত উন্নতি ও সভ্যতার বিকাশের পর থেকে, বিশেষত দু'শোবছর ধরে প্রকৃতির উপর সীমাহীন অত্যাচারের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে অপূরণীয় বিকার সংঘটিত হয়ে চলেছে। এর পরিণামে সমস্ত জীবজগত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে— অন্তিম ফল হিসাবে মানুষের অস্তিত্বও আজ গভীর সংকটাপন্ন। পরিবেশের যাবতীয় পরিবর্তনকে দু'দিক থেকে বিবেচনা করা যায়— প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ফলে কোটি কোটি বছর যাবৎ ভূ-পৃষ্ঠের গঠনগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যেমন মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলির সরণ পর্বতোত্থান, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, উল্কাপতন, ভূমিস্খলন, বন্যা, খরা, সুনামী এবং ভূ-পৃষ্ঠে সৌর বিকিরণের পরিমাণের তারতম্য হেতু জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। আকাশ ভরা সূর্য তারাময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি পরম বিস্ময়। মানুষের পক্ষে সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটন আজও সম্ভব হয়নি, সম্ভবত সম্ভবও নয়। তাই মহাজাগতিক পরিবর্তনে আমাদের খুব একটা ভূমিকা নেই।

ভূমিকা আছে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের পরিবর্তনে। আজ থেকে আট-দশ লক্ষ বছর আগের মানুষ যখন নিয়মিতভাবে আগুনের ব্যবহার শুরু করেছিল, তখন থেকেই খুব

নগণ্য পরিমাণে হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেনি। আগুনের ব্যবহার মানব বিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

কৃষির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন মানুষের সংস্কৃতিতে এক বৈপ্লবিক উদ্ভাবন। আদিম কৃষিব্যবস্থায় মানুষ নির্দিষ্ট জমি থেকে স্বনির্বাচিত ফসল উৎপাদন করেছে। তাতে পরিবেশের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক উপজাতি সমাজেই স্থানান্তর (Shifting) চাষের প্রচলন পরিবেশকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় উপজাতিদের ১১ শতাংশ আজও এই প্রকার চাষকে নির্ভর করে জীবন যাপন করে। এই চাষ 'ঝুম' চাষ নামেও পরিচিত।

এই প্রকার চাষ পরিবেশের যেসব ক্ষতিসাধন করে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল, গাছ কাটার ফলে জমি ধারণ-ক্ষমতা কমে যাওয়া। আলগা মাটি বৃষ্টির জলে পরিবাহিত হয়ে নদীতে পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীর বহনক্ষমতা হ্রাস পায়, যার অনিবার্য পরিণাম বন্যা।

মানুষের পরিবেশ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করল শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস ও বর্জ্য বায়ুমণ্ডল ও জলাশয়ে দূষক পদার্থ যুক্ত করে চলেছে। খনি থেকে কয়লা, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহারের ফলে ভূমিভাগের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে এবং নানা প্রকার বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে অরণ্য ধ্বংস করে কৃষি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। ফলে অরণ্য বাস্তুতন্ত্র এক বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে।

উন্নত কৃষি-পদ্ধতিতে, রাসায়নিক সার ও বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকা এবং জল মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়ার ফলে মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জীব ও উদ্ভিদ (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি) মারা পড়েছে। এর ফলে বাস্তুতন্ত্র কার্যত তার ভারসাম্য হারাচ্ছে— খাদ্যশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

অত্যধিক খনিজ জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রা তথা উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় 'অম্লবৃষ্টি' (Acid rain)-র ফলে জীবজগতের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির মিলিত ক্রিয়া পরিবেশের

উপর অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করেছে। রসদ-সম্পদের অসম বণ্টন সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। উন্নত দেশের অত্যাধুনিক জীবন যাত্রার কারণে শিল্পজনিত দূষণের পরিমাণ অনুন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু দূষিত পরিবেশের প্রভাব উভয় দুনিয়ার ক্ষেত্রেই সমান। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও উন্নত জীবন-যাপন যে পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠার জন্য দায়ী তা অস্বীকার করা যাবে না। 'Environment at risk' নামক প্রবন্ধে Merry Douglas বলেছেন—

"The birth of every American child is fifty times more of a disaster for the world than the birth of each Indian child. If you take consumtion, you find that the birth of each American child is 300 times more of a disaster for the world than the birth of each Indonesian child"

অর্থাৎ প্রত্যেকটা আমেরিকান শিশুর জন্ম প্রত্যেকটা ভারতীয় শিশুর তুলনায় ৫০ গুণ বেশী ক্ষতিকর (পরিবেশের পক্ষে)। ইস্পাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুলনা করতে গেলে প্রত্যেকটা আমেরিকান শিশুর জন্ম প্রত্যেকটা ইন্দোনেসীয় শিশুর জন্ম অপেক্ষা ৩০০ গুণ বেশী ক্ষতিকর। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হওয়ার জন্য দায়ী পৃথিবীর ধনী সমৃদ্ধ দেশগুলো। আবার যে মানুষ নগরে বাস করে, যার ব্যক্তিগত মোটর গাড়ি আছে, যে মূল্যবান আসবাব ব্যবহার করে, যে বেশী দামী খাবার খায়, নানা রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্লাস্টিক এবং ইস্পাতের জিনিসপত্র ব্যবহার করে, মাছ ও মাংস বেশী খায় ও প্যাকেট করা খাদ্য দ্রব্য, প্লাস্টিক ডিটারজেন্ট জাতীয় কৃত্রিম পদার্থ সমূহ এবং অতিরিক্ত গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে তার সঙ্গে একজন গ্রাম্য কৃষকের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের তুলনা চলতে পারে না।

সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ করবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সঙ্গে সঙ্গে, ভোগসর্বস্বতার পরিবর্তে ত্যাগের মনোভাব অর্থাৎ মানসিক গুণাবলী ও সৌন্দর্যবোধকেই বেশী প্রাধান্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে হবে উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, যন্ত্রশক্তির ব্যবহার পদ্ধতি। ১৯৬৮ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা মিলে 'দি ক্লাব অব্ রোম' নামে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম দিয়েছিল। তাঁরা বেশী করে লক্ষ্য করেছেন বর্তমান সভ্যতার অস্থিরতা। চাহিদা ও জীবনাচরণ পদ্ধতিতে যদি সংযম না রাখা যায় তবে ধ্বংস অনিবার্য। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যে ভাবে মানুষের ভোগ লালসা চরিতার্থ করবার কাজে লাগানো হচ্ছে তা যদি চলতে থাকে তবে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াবে, পশুপাখির মতো কোনো মতে বেঁচে থাকাটাই হয়তো একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তখন পরিবেশের বিকার এত মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে যে পৃথিবীর বায়োস্ফিয়ারটাই যেন পরিণত হবে হিটলারের

গ্যাস চেম্বারে। জল, শুধু জলের জন্য হাহাকার করে মরবে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী। আগামী পৃথিবীর কাছে জলাভাবই কঠিনতম সমস্যা। এমনকি শুধু জলের জন্যই বেঁধে যাবে বিশ্বযুদ্ধ। ২৩ শে মার্চ, ১৯৯৮ সাল ছিল বিশ্ব জলদিবস। এদিন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নান বিশ্ববাসীকে সাবধান করে দেবার জন্য WHO এবং WMO-এর সাহায্যে উদ্ঘাটিত করেছেন এ তথ্য। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সাতানব্বই শতাংশই নোনা বা অশুদ্ধ। তিন শতাংশ মানুষের ব্যবহারযোগ্য মিষ্টি জল। তাও নানা বিষক্রিয়ার জৈবিক বা ভৌতিক বা রাসায়নিক দূষণে দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষের ব্যবহারযোগ্য মিষ্টিজলরাশির ভাণ্ডার। ১৯৬০ সালে একজন মানুষ যতটা জল পেত, বর্তমানে তার অর্ধেকটা পাওয়া যাচ্ছে ২০২৫ সালে পাওয়া যাবে তারও অর্ধেক। এই মুহূর্তে অর্ধেকের বেশি মানুষ বিশুদ্ধ জল পায় না। তাই অত্যধিক পরিমাণ ভোগ্য সামগ্রীর জন্য উন্মত্ত পরিশ্রম করার যে মানসিকতা আজ মানব জাতিকে পেয়ে বসেছে সে মানসিকতা পাল্টাতে হবে। এই ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন নির্ভর করে তুলতে হবে। তাই পরিবেশ শিক্ষা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়।

পাশ্চাত্যদর্শন মানুষকে পরিবেশ সংক্রান্ত নৈতিকবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি (জেন্ড স্মিথ— দ্য ব্লুপ্রিন্ট ফর সারভাইভল, লন্ডন, পেঙ্গুইন)। মাটি জীবজন্তু গাছপালার সঙ্গে মানুষের যে সুস্থ সম্পর্ক থাকা উচিৎ, যে বোঝাপড়া থাকা উচিৎ, যে প্রীতি-সম্পর্কযুক্ত মিথস্ক্রিয়া থাকা উচিৎ তা শেখাতে পারেনি। উপরন্তু বলা ভালো প্রদর্শন এ বিষয়ে সহায়ক হয়েছে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ একাধারে মানবতাবাদী, প্রকৃতিবাদী ও প্রয়োগবাদী শিক্ষাদার্শনিক। উপনিষদের শিক্ষা তথা ভারতীয় দর্শন তাঁর চিন্তার মননে ও প্রয়োগে প্রতিফলিত। তাই আজ যখন উন্নত দেশগুলির নাগরিকরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে তখন আমাদের সচেতন প্রয়াসে পরিবেশ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে অগ্রসর হলে মুক্তির পথ পাব।

ভারতীয় দর্শন ও সভ্যতার মর্মবাণী ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— "আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই দেশ শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মহত্ত্ব আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন— তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা মহারাজার শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি।"

আমরা একটু সজাগ দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব আধুনিক যে পরিবেশ বিজ্ঞান তা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্যই ভারতবর্ষীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেবলমাত্র গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, বিষয়শিক্ষা মাত্র ছিল না, তা ছিল ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ নিয়ম সংযমের অভ্যাস। রবীন্দ্ররচনায় তার সমর্থন পাই—

"এমন একটি বললাভ হইত যাহার ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত।"

প্রাচীনভারতীয় শাস্ত্রে বহিঃশক্তির সঙ্গে অন্তরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মানব সমাজে এই সামঞ্জস্যক্রিয়া চলার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

"গাছপালার এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের, বাতাসের, খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেই রূপ ঘটে। ... কিন্তু শরীরের আবশ্যক সাধনের অবসরেই মানুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলো না। সে প্রয়োজনের বাইরেও অনেক কৃত্রিম অনাবশ্যক উপায় এবং সামগ্রী উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করলো। কিন্তু রসনাকে রসসিক্ত করতে এবং শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করতে করতে সে বাইরের সঙ্গে প্রাণের এবং প্রাণের সঙ্গে মনের বিশুদ্ধ যোগসূত্র নষ্ট করলো। ... এই ভারসাম্যহীনতাই আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ের প্রধানতম কারণ, মানুষের অন্তহীন দুঃখ কষ্টের উৎস।"

অন্ন, জল, মাটি, বৃক্ষ— এ সবই ভারতবাসীর কাছে পবিত্র। নানা পর্বে, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী তাদের পবিত্রতা স্মরণ করে। পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন আধুনিকপন্থীরা এর মধ্যে এক সংস্কার খুঁজে বেড়ালেও, তা চিরন্তন ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ এদের উদ্দেশেই বলেছেন—

"প্রাণের জগতে অন্তরের অন্তরে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না। কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই জড়ত্ব, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন কেবল চৈতন্যের বিকাশেই সম্ভবপর।"

এটা হল বোধের শিক্ষা। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই বোধের শিক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তপোবনের শিক্ষা ছিল বোধের শিক্ষা। এই শিক্ষায় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়-তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়। আধুনিক পরিবেশতাত্ত্বিকেরাও চান এই শিক্ষা।

পরিবেশ শিক্ষা এবং বৃক্ষরোপণে নিছক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনই যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই আমাদের মানসিক পরিবর্তন, চাই এমন একটা দর্শন যা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে মানুষকে, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির ওপর আধিপত্য করবার পরিবর্তে, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে পুজো করবার, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে নিজের শক্তির চেয়েও শক্তিশালী ভেবে নিয়ে তাদের আধিপত্য মেনে নেওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'নরনারী' প্রবন্ধে এই কথাই বলেছেন—

"আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট-অশ্বত্থকে পূজা করি। আমরা প্রস্তর পাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না।"

স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে

মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মানুষের অনাচার, লোভ লালসায় প্রকৃতির বহু পশুপাখীসহ বৃক্ষ নিধন হয়েছে। মানুষ আজ তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত হয়েছে। উত্তর-আফ্রিকার দেশগুলো রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি-দপ্তরের নির্দেশানুসারে সাহারার ধার ঘেঁষে গাছের চাষ শুরু করে দিয়েছে। চীন ছয় হাজার মাইল জুড়ে সবুজ প্রাচীর গড়ে তুলেছে মরুভূমিকে বাধা দেবার জন্য। সুইজারল্যান্ডের অরক্ষিত জায়গাগুলোকে হিমবাহের প্রকোপ থেকে রক্ষা করবার জন্যে অরণ্য সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হয়েছে। মৃত্তিকাক্ষয় রোধ করবার জন্য জাপানীরা যে বৃক্ষরোপন প্রথা আবিষ্কার করেছে তার শ্রেষ্ঠতা স্ব-প্রমাণিত। আদিম মানব বৃক্ষ পুজো করত। এ যুগেও আমাদের বৃক্ষ পুজো ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যে এর বলিষ্ঠ সমর্থন পাই—

"আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব, এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের দুটি অঙ্গ। প্রথম হলকর্ষণ— হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য শস্যের জন্য। ... কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য তার কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপনের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই পরিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।"

কবি তাঁর একাধিক রচনায় যন্ত্রের প্রতি বিরূপতা পোষণ করেছেন, তাই বলে তিনি যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে যেখানে প্রাণের সংঘাত বেধেছে সেখানে তিনি প্রাণকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'মুক্তধারা' নাটকের কোন কোন অংশে মনে হতে পারে তিনি যন্ত্রশক্তির মহিমা প্রচার করেছেন। প্রযুক্তি সহায়ক উন্নয়নের তিনি হয়তো বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু যে প্রযুক্তি সমাজের মুষ্টিমেয়র কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে অবশ্যই ধিক্কার দিয়েছেন। নদীকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা যায় না— প্রকৃতিকে জয় করার মধ্যে মানবিক শক্তি মুখরিত হলেও, তার অশুভ পরিণামও আজ প্রকটভাবেই চিহ্নিত। তাই অভিজিৎ নিজের প্রাণ দিয়ে সেই সত্যকে প্রকট করেছেন। তাঁর 'বিসর্জন' নাটকটিতো শুধু ধর্মাধর্ম, সংস্কার প্রথার ঘাত প্রতিঘাত নয়, সেখানে প্রকটিত হয়েছে মূক পশু তথা প্রাণী জগৎকে রক্ষার গভীর আকুলতা। এই নাটকটির মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।" সেই চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে দিতে চাইলেন সর্বত্র। 'রক্তকরবী' নাটকেও তিনি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার দু'একটি সমস্যা তুলে ধরেছেন। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ

জানানোর জন্য 'রক্তকরবী' নাটক লিখেছেন। বস্তুত তা নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল— যন্ত্রসভ্যতা স্বাভাবিক মনুষ্যকে অন্তঃসারশূন্য যান্ত্রিক মানুষে যাতে পরিণত করতে না পারে তার জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণ।

'বনবাণী' কাব্যে অরণ্য, বৃক্ষ, উদ্ভিদ প্রভৃতির প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যের ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন—

"আমার ঘরের আশে পাশে যে সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব জগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়। তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।"

বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে বনবাণীর গানে তিনি দেখিয়েছেন— বৃক্ষের সাহায্যে মরুবিজয় করা যায়, মৃত্তিকাক্ষয় রোধ করা যায়, বৃক্ষের ফুলে ফলে ভরে ওঠে পৃথিবী। তিনি বলেছেন—

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।"

আবার বললেন—

"মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।"

তিনি যখন বলেন—

"আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের সঙ্গ নে,
চল্, আমাদের ঘরে চল্।"

তখন প্রাণীজগৎ ও জীবজগৎ আত্মীয়তার বন্ধনেই আবদ্ধ হয়। কবির মতে গাছই পৃথিবীর আদি প্রাণ— "প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদি প্রাণ।"

'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় তিনি বৃক্ষকে এ ধরণীর বীর সন্তান বলে অভিহিত করেছেন—

"মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান।"

কবি মনে করেন বৃক্ষই পৃথিবীতে উৎসবের বাণী ও সঙ্গীতের উদ্গাতা, বৃক্ষই পৃথিবীকে 'শ্যামল সুন্দর' করে তুলেছে। তিনি তাঁর 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের একাধিক চিঠিতে পৃথিবীর রূপ, রস গন্ধের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। এখানে তিনি শুধু প্রকৃতি প্রেমিক নন, তিনি নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তন সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করতেন। একটি পত্রে তিনি পৃথিবীকে সুন্দরী-রূপসী বলে পরিচয় দিলেন—

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা
কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।" (৩ সংখ্যকপত্র)

এই গ্রন্থের ২২০ সংখ্যক পত্রে কবি নারী ও নদীকে এক করে দিলেন—

"... ইছামতী মানুষ ঘেঁষা নদী, তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশেছে ... আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাস শিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সংবৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে... আবার চলে যায়।"

এমন অজস্র উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে আমরা পাই। দু'একটি উদ্ধৃত করলাম কবির সৌন্দর্যবোধ, রোমান্টিকচেতনার ঊর্ধ্বে প্রকৃতিকে কতটা ভালবাসলে, শ্রদ্ধা করলে এর অনুভবে পৌঁছন যায় তা বোঝাবার জন্য। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী রাণুকে লেখা একটি চিঠির শেষাংশে বলেছেন—

"পৃথিবী যেমন তার সোনার ভরা সকালটিকে এবং সোনার ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মতো আপন সূর্য প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেছে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালবাসাকে চিরদিনের চলবার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী/পত্রসংখ্যা-১৭)

গাছপালা, পশুপাখীর কলকাকলিতে পূর্ণ সোনা রোদ্দুরে ভরা নির্জন পৃথিবীর বর্ণনায়, 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৫৯ সংখ্যক পত্রে কবি বললেন—

"আমাদের কাছের অশথবনে বনে স্নিগ্ধ চিক্কণ পুঞ্জীভূত সবুজে লেগেছে পরশমণির স্পর্শ, পাতায় পাতায় জেগেছে সোনার রোমাঞ্চ, নীল নিস্তব্ধতার উপর পাখিদের মিশ্রিত কাকলি নীলাম্বরী কাপড়ের উপর জরির কাজের মতো ঝিলিমিলি করছে।" (নির্মলকুমারী দেবীকে লেখা, ১৪ই মে, ১৯৩৮)

কবি কখনো বা বসুন্ধরার সন্তানরূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। বসুন্ধরা জননীর উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন—

"আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,

বিপুল-অতল তলে।''

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে কবির একাত্মতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। 'হেআদি জননী তরঙ্গিণী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।' সমুদ্রের অগাধ-অতল জলরাশি থেকে একসময় জেগে উঠেছিল মহাদেশ, মানবহৃদয়ের অগাধ অতলেও প্রতিনিয়ত যে একটা সৃজনশীলতার কাজ চলছে তা কবি অন্তরে অনুভব করেছেন। বস্তুত সাহিত্যানুভূতি, আধ্যাত্মিকতা, জীবনের গতিশীলতা— প্রভৃতি এখানে মিলে মিশে একাকার।

কবির শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু গ্রামবাসীর উন্নতিসাধন ছিল না, সমগ্র দেশের সঙ্গে গ্রামীণ জনসাধারণের একটি আত্মিক যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, পল্লীবাসী, দরিদ্রমানুষের দুর্দশা তিনি জমিদারী কাজ পরিদর্শনের সময়েই দেখেছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মর্মসত্যটি 'পূরবী' কাব্যের 'মাটির ডাক' কবিতায় তুলে ধরেছেন—

''আজকে খবর পেলেম খাঁটি
মা আমার এই শ্যামল মাটি
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন,
....
যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই, মুক্তি সুখে,
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে;
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে।
নিশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ তলায়;
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।''

আমরা বিস্মিত হই, তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার বিবিধ প্রতিভার অধিকারী হয়েও আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ সংক্রান্ত যে কয়টি নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তাদের সবকটিই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আধুনিক

পরিবেশ বিজ্ঞানের জন্ম হবার বহু পূর্বে। তিনি শুধু কবি নন, তিনি সত্যদ্রষ্টা, মহাঋষি, বিশ্ববিবেক। তাঁর প্রকৃতি দর্শন বিপুল রচনা সম্ভারে পাওয়া যায়, আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য সূত্রাকারে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করলাম—

''প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা।''

''অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে।''

''সংযম শিক্ষা করো। বড়লোকের মাতাল উচ্ছৃঙ্খল বেহিসেবী ছেলের মতো সীমিত সম্পদের অপব্যবহার করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিপদ এবং অবলুপ্তি ত্বরান্বিত করো না।''

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বিশেষ একটা সূত্র— 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।' রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন বহু পূর্বে। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানীরা বৃহৎ জটিল কৃত্রিম জীবন ধারার চেয়ে সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের ওপরই জোর দিচ্ছেন বেশী। তাঁরা গ্রাম্য শিল্প, গ্রাম্য অর্থনীতি— লোকসমাজভিত্তিক এক সভ্যতার কথা বলেছেন। কবি এই তত্ত্বই প্রচার করেছেন—

''বাণিজ্য ব্যবসায় প্রকাণ্ড মূলধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোট ছোট সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না।'

ভোগসর্বস্ব আধুনিক সভ্যতা যেন এক সোনার হরিণের পিছনে ছুটে চলেছে। তাই পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হল— শুধুমাত্র ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার এবং বৃহৎ শিল্পনগরী গড়ে তোলবার চেষ্টা না করে আধুনিক পরিবেশ সচেতন মানুষের উচিত মানুষের সুকুমার বৃত্তি সমূহ বিকশিত করে তোলা এবং আধ্যাত্মিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবার কাজে আত্মনিয়োগ করা। এ যেন রবীন্দ্রবাণীর প্রতিধ্বনি। তিনি বলেছিলেন—

''এ অবস্থায় প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, বস্তুপ্রধান, শক্তিপ্রধান, সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্মপ্রধান মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' ... জড় শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্ধর্ষতর এবং বাহ্যসম্পদের অপেক্ষা সুখ অনেক বেশী দুর্লভ। সেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে সভ্যতা সুখ দিয়াছে, সন্তোষ দিয়াছে, আনন্দ ও মুক্তির অধিকারী করিয়াছে সেই সভ্যতার মাহাত্ম্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।''

তথ্যসূত্র:
১। পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ— পরমেশ চৌধুরী
২। শিক্ষা ও সাহিত্য (পত্রিকা)— জুন, ২০১০
৩। পরিবেশ বিজ্ঞান— দীপক মুখোপাধ্যায় আশালতা রোজারিও স্বপন কুমার [illegible]
৪। গ্লোবাল ওয়ার্মিং— বিপ্লব দাস
৫। রবীন্দ্ররচনাবলী— ১-১৫ খণ্ড (বিশ্বভারতী)
৬। তপন প্রকাশ খান— ১৫/২/২০০৯ গণশক্তি পত্রিকা
৭। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৭/১০/২০০০ বর্তমান পত্রিকা
৮। আনন্দবাজার পত্রিকা— ১৬/৩/২০০৯

একলা মানুষ: প্রসঙ্গ কয়েকটি রবীন্দ্র গল্প

কিঙ্কর মণ্ডল

(১)

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে মানুষ একা। প্রাণের স্পন্দন যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের সবাইকে পেছনে ফেলে মানুষ একা হাতে গড়ে তুলেছে এই সভ্যতার বুনিয়াদ। মানুষ আর মনুষ্যত্বের বড় দোসর তার একাকীত্ব। জীবনানন্দীয় বোধের মত মানুষের চলার পথে 'সাথে সাথে সেও চলে আসে।' 'একাকীত্ব' শব্দটি দ্বৈত অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। প্রথমতঃ একা থাকা অর্থাৎ জনকোলাহলের একঘেঁয়ে মুখরতা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ছিন্ন করে একাকী জগতের ইমারত তৈরী করে তাতে রাজা সাজা। এমনটা সংসারের প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঘটে থাকে। যেমন— কোনো নিমগ্ন পাঠক কিংবা একনিষ্ঠ লেখক সারাদিন জনতার মাঝে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও রাত্রে পড়ার টেবিলে কিংবা লেখার পৃষ্ঠায় তিনি ভীষণভাবে একা। এটা সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছে নিজের মত হয়ে থাকা। দ্বিতীয়তঃ সবার মাঝে একা থাকা— 'সবার মাঝে ফিরি আমি একেলা।' সুতরাং সংসারের বহু মানুষের ভিড়েও একা হওয়া যায়, একা থাকা যায়। সমাজের গতানুগতিকতার সঙ্গে একাত্ম হতে না পারা কোনো মানুষ সমাজবিচ্ছিন্ন, আলাদা। তার দীর্ণ হাহাকার তাই হতে পারে— 'তবু আমি এমন একাকী।' এই অনিঃশেষ বেদনাবোধে উপনীত হয়ে কখনও সে বলে— 'যন্ত্রণা তোমাকে আমি ভালবাসি, দুঃখ তুমিই হও আমার রাজমুকুট।' আর যে তা পারে না, একাকী নির্জন বিবিক্ততায় ভরে উঠে গুমরে কাঁদে— 'কেমন করে কাটাই যে সারাটা বেলা।'

সুতরাং তেমনভাবে ভাবতে গেলে সংসারের প্রায় প্রতিটি মানুষ একা। অসৎ, নির্দয় দুনিয়ায় সৎ দয়ালু মানুষের স্থান সমাজের এককোণে। চলে আসা নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙে যখন মানুষ নিজের Identity প্রকাশে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, তখনও তার পাশে কেউ থাকে না। কখনও কখনও আবার সম্পর্কের ভাঙনে মানুষ একলা হয়ে যায়। প্রেমের গভীরতা মধ্যে জাগিয়ে রেখে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার অজুহাত দেখিয়ে প্রেয়সী দূরে চলে গেলে প্রতারিত প্রেমিকের একাকীত্ব বড় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। সে খবর হয়তো প্রেয়সী আজ আর রাখে না; তবু তা প্রেমিকের জীবনসত্য। মানুষের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত উপকারী মানুষরা স্বস্বার্থের কথা না ভেবে এগিয়ে যায়। তার সংগ্রাম আর লড়াইয়ের ইতিহাসও একাকী। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো কোনো গল্পে এমন একলা মানুষদের কথা আছে। গল্প পাঠকের দৃষ্টি তা এড়িয়ে যায় না। আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কয়েকটি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল— রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, মেঘ ও রৌদ্র, নষ্টনীড়, মাস্টারমশায়, হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র।

(২)

সংসারে ভালমানুষের কদর সবাই করতে পারে না। ভালমানুষের ভালত্বটুকু সমাজসংসার সন্দেহের চোখে দেখে কিংবা ভাবে পাগলামি। তার সততা, বিশ্বাস অনেক সময় মূল্য পায় না তার আত্মজন, সহধর্মিনী, আত্মজ, আত্মজার কাছে। সততার বিশ্বে, বিশ্বাসের সাম্রাজ্যে সমাজের চোখে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পের নির্বোধ রামকানাইয়ের মতো মানুষরা তাই একা হয়ে যায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের গোলযোগ বিভিন্ন কারণে তৈরী হতে পারে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সম্পত্তি অথবা উইলকেন্দ্রিক সমস্যা মানবিক সম্পর্কের বাঁধুনিকে আলগা করে, তিক্ত করে সম্পর্কের মধুর কোরকগুলি। বাংলা সাহিত্যে সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রামকানাইয়ের দাদা গুরুচরণ মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী বরদাসুন্দরীকে দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন— "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" মৃত জ্যাঠামশায়ের ইচ্ছার কথা শোনবার পর রাগান্বিত নবদ্বীপ তার মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ শান্তি করবার ইচ্ছা ত্যাগ করে।

কিন্তু আসল সমস্যা ঘণীভূত হয় উইলের লেখক রামকানাইকে ঘিরে। যেহেতু মরণাপন্ন ক্ষীণবল গুরুচরণের পার্শ্বে বসে তার কথাগুলি উইলে লিপিবদ্ধ করেছিল রামকানাই, সেহেতু পুত্র নবদ্বীপ এবং নবদ্বীপের মা সম্ভবত আশা করেছিল উইলে গুরুচরণের কথাগুলি উল্টো করে লিখে সম্পত্তি যাতে নবদ্বীপের করায়ত্ত হয় সেই ব্যবস্থা করবে। মনের কিনারে অপুত্রক জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তি নবদ্বীপ পাক— এ আশা থাকলেও, সৎ রামকানাই উইল লেখার সময় এ চিন্তাকে একেবারে প্রশ্রয় দিলেন না। তাই নবদ্বীপের মা তিক্তস্বরে বলেন— "না, তুমি বড় ভালমানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন 'লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন।" সত্য ভালমানুষ রামকানাইয়ের হিসেবী বোঝাবুঝির মনটা শূন্যই ছিল। তাই দাদার মরণকালে তাকে ঠকাবার ভাবনা, তার শেষ ইচ্ছাকে গলা টিপে মারবার চিন্তা তার মাথাতে আসে নি। এই স্বার্থহীন রামকানাই তাই সংসারের একলা পথিক।

আপন স্বার্থ চরিতার্থতা যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তারা বরাবর সুযোগসন্ধানী। এজন্য নবদ্বীপ তার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে অসৎ উপায়ে সম্পত্তি হাতাবার প্রয়াস চালায়। এপথে তার নির্বোধ পিতা রামাকানাই কাঁটা হতে পারে ভেবে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে পিতাকে কিছুদিনের জন্য কাশী পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিনের মধ্যে উইল জাল করে গুরুচরণের সই নকল করে মিথ্যা সাক্ষ্য জোটাবার পর কাশী থেকে রামকানাইকে ডেকে পাঠানো হল। বরদাসুন্দরীর পক্ষে সে-ই একমাত্র সাক্ষী। আদালত থেকে সাক্ষীর

সপীনা পাওয়ার পর রামকানাইয়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে গেল। হতবুদ্ধি রামকানাইয়ের প্রতিবাদ স্ত্রী-পুত্রের তর্জন গর্জনের কাছে আদৌ টিকল না।

সুযোগসন্ধানী লোলুপ স্বার্থপর আত্মজনেরা রামকানাইদের যতই দুর্বল করার চেষ্টা করুক না কেন, স্বার্থহীনতা ও কঠিন সত্যের পূজারী হয়ে চরিত্রগত দিক থেকে মহীয়ান তারা। জোড়হস্ত রামকানাই তাই জজের দিকে তাকিয়ে অনায়াসে বলতে পারে— "আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ হস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজ হস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" অথচ মিথ্যাভরা দুনিয়া তাকে কলঙ্কলিপ্ত করতে ছাড়ে না— "সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।" সত্যিই কি নির্বোধ রামকানাই স্বার্থপর এ সমাজের চোখে সে নির্বোধ ঠিকই, কিন্তু নিজের গড়ে তোলা বিশ্বাসের বিশ্বে, সততার সাম্রাজ্যে নির্বোধ রামকানাই একক, অদ্বিতীয়।

(৩)

ক্ষুদ্র বিষয়কে বৃহৎ করে দেখা, তা থেকে মনোমালিন্য এবং শেষে আইনি আশ্রয় সম্পর্কের ভাঙনকে অনেক সময় নিশ্চিত করে তোলে। হৃদয়ের সত্যিকারের সম্পর্ক এই ক্ষুদ্রতার কাছে নতমস্তক হয়। আর হৃদয়ের যোগ ছিল যাদের মধ্যে বাস্তবকে মানতে না পারার বেদনা তাদের কষ্টাহত করে। দুজনের পথ তখন একাকীত্বে ভরে ওঠে। 'ব্যবধান' গল্পে বনমালী ও হিমাংশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই সংকট দেখা যায়।

দুঃসম্পর্কের মামাতো পিসতুতো ভাই তারা। বয়সে অনেক বড় হলেও হিমাংশুর সঙ্গে বনমালীর সম্পর্ক বন্ধুত্বসুলভ। লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও বাগানের শখ ছিল বনমালীর। হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন দিয়ে তাকে পালন করেছিল। হিমাংশুর জ্ঞানস্পৃহাকে শ্রদ্ধা করে বনমালী। হিমাংশু ছোট হলেও তার পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে বনমালীর কার্পণ্য ছিল না। বনমালীর এই মানসিকতা বোঝাতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন— "হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধিজ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয় তবে তাহার মতো পরম প্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।"

হিমাংশুরও ছিল বাগানের শখ। বাগানকে পরিপাটি করে তোলবার জন্য তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। গাছের বীজ বপন করা, কলম করা, সার দেওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে হিমাংশুর পরামর্শ বনমালী সানন্দে গ্রহণ করত। আবার হিমাংশু স্কুল থেকে ফিরে এলে

বাগানের উপর বেঞ্চিতে তাদের বিকেলযাপন মধুরতায় ভরে উঠত। বাগান পরিবেশ হৃদয়ের একান্ত গুঞ্জন ধরা পড়ত বাক্যালাপে। অন্ধকার প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করে দু "দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত, কোনোদিন বা বা বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরি তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।" — বক্তা-শ্রোতার কথা তবু ফুরোতে চায় না। হিমা বলে যেত, আর বনমালী শুনত। সবকথা হয়তো বনমালীর ভাল লাগত না। অ শ্রদ্ধাবান এই বয়স্ক শ্রোতা গম্ভীরভাবে সব শুনে যেত।

হৃদয়ের এই মধুরতা সত্য হলেও ক্ষুদ্র পাতিলেবু গাছ নিয়ে পারিবারিক অশা মধুরতাকে অম্লতায় পরিণত করে। সম্পত্তি নিয়ে এ অশান্তির ক্ষুদ্রতার শেষ ঠি আদালত। বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্র তাই শেষ পর্য আদালতের দ্বারস্থ। আদালতে সুদীর্ঘ বাগ্‌যুদ্ধ ও টাকার শ্রাদ্ধের পর শেষপর্যন্ত হরচন্দ্রে জিত হল। হরচন্দ্রের জিত তাদের বাড়ির অন্তঃপুরকে উল্লাসমুখর করলেও সে বনমালী তাতে সামিল হতে পারল না। তার চোখে ঘুম রইল না। গল্পকার লিখেছেন— "তাহার পরদিন অপরাহ্নে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেঞ্চিতে বসিল, যে পৃথিবীতে আর কাহারও কিছু হয় নাই, কেবল তাহারই একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।" হার বোধকরি তার সত্যি হয়েছিল, সন্ধে ছটা বাজলেও প্রাণের দোসর হিমাংশুর পা নেই। অথচ হিমাংশুর বাড়ির খোলা জানলার ভেতর দিয়ে বনমালী দেখে তার উপস্থিতি নিশানা স্বরূপ স্কুলের ছাড়া কাপড় ঝুলছে। কিন্তু হিমাংশুর পিতা গোকুলচন্দ্র তা জানায়— 'কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।' রাত গভীর হলে বনমালী মনে হল হিমাংশুর বাড়ির সমস্ত দ্বার যেন তার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। অভ্যাসবশত বনমালী হিমাংশুর জন্য আবার অপেক্ষা করলেও সে আর আসে না। বনমালী স্ব ভাবতে পারে না তাদের বন্ধন ছিন্ন হবার কথা। তাই সে অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে— "... এমন দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত তা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।"

তবুও অপেক্ষার প্রহর গুণত বনমালী। সমস্ত অপেক্ষা বৃথা হয়ে যায়। সপ্তাহ কাটে কালের নিয়মে। হিমাংশু আসে না। বন্ধু বিহনে একাকীত্বের বেদনা মথিত করে বনমালীকে হিমাংশুর বেদনা গল্পে প্রস্ফুটিত না হলেও পাঠক আশা করে তার মানসিক অস্থিরতা আর একলা বনমালী বেদনাকে বুকে চেপে ধরে করুণাময়ের উদ্দেশে অভিমানী নালিশ পাঠিয়ে দেয়।

(৪)

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, সংগ্রামী মনোভাব বিশে

আমল পায় না, অথচ নারী তার সেই সম্মানের সত্তাকে নিজের একটু একটু টিকিয়ে রাখিয়ে চলে। অনেক সময় সেখানে পাশে থাকে না তার কোনো সঙ্গী মধ্যবর্তী, এমনকি তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, তার স্বামীও। ... পুরুষ তার কর্তৃত্ব দিয়ে নারীকে দাবিয়ে রাখতে চায়। ... বাড়বাড়ন্তকে নিন্দা করে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল ... সেই মনোলোকের সাথে তার শ্বশুরবাড়ির ... যুক্ত কিছু নয়। ... বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু মনোরমণী নয়। সুতরাং সংসারের অংশে মৃণাল বড় একাকী। তার উপর বিন্দুকে নিয়ে তার একক সংগ্রামও বিশেষ উল্লেখ্য। এই ... নিন্দার গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে তাকে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী মৃণাল সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

বড় বউয়ের বাপের অভাবে বোনকে নিয়ে ... মৃণালের সঙ্গে মেজ ছেলের বিবাহ স্থির করে। মৃণালের রূপ থাকলেও বুদ্ধি ছিল বেশ। তার মা এই বুদ্ধিটা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন, কেননা তিনি মনে করতেন— 'মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই।' শ্বশুরবাড়িতে সবকিছুর আশপাশে ... ছিল তার। এ কারণে তাকে 'মেয়ে জ্যাঠা' বলে দুবেলা গালমন্দ শুনতে হত। তবে কিছুর মধ্যে তার নিজের মতো বাঁচবার একটা সখ ছিল। এই সখটি ছিল তার সবকিছুর বাইরে। সে সখ ছিল সৃজনশীলসত্তা। মৃণালের কথায়— "আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি।" নিজেকে এইভাবে চিনে নিয়ে, বুঝে নিয়ে মুক্তি খোঁজার প্রয়াসে মৃণালের পাশে ছিল না কেউ, তার স্বামীও।

সন্তান যেকোন দাম্পত্যের পূর্ণতার প্রতীক। অথচ মৃণালের মেয়েটি সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্য উদিত হয়ে আবার অস্ত গেল। মৃণাল 'মা হবার দুঃখটুকু পেয়েছিল, 'মা হবার মুক্তিটুকু' তার মেলেনি। হয়তো তাই বড় জায়ের বোন বিন্দু তার এত কাছের হয়ে উঠতে পেরেছিল। তার দুঃখ, তার বেদনা অন্তর দিয়ে বুঝেছিল মৃণাল। খুড়তুতো ভায়েদের অত্যাচারে দিদির কাছে আশ্রয় নিলেও দিদির পরিবারের কাছে অনাহূত বিন্দু হয়ে উঠেছিল 'এক বিষম বালাই।' অথচ মৃণাল তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। তার স্বতন্ত্র মনোভাবের জন্য বড়জায়ের কাছে শুনতে হয়েছিল— 'মেজোবউ পাঁচজনের আদরে মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।' এতে মেজবউ বিশেষ আমল দেয় নি। বিন্দুর প্রতি তার খুড়তুতো ভায়েদের অত্যাচার, আর দিদির বাড়িতে দাসীবৃত্তির কাজের যন্ত্রণা মৃণালকে ব্যথা দেয়। বিন্দুর ভালোবাসার 'দুঃসহ বেগ' মৃণালকে ততই অস্থির করে তুলেছিল। বিন্দুর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মৃণাল তার মুক্তমনের সন্ধান পেয়েছিল।

অবশেষে বিন্দুকে আগলে রাখার জন্য মৃণালের এককশক্তির কাছে এঁটে উঠ পারে নি তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তাই বিন্দুকে বিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত করতে চা তারা। মৃণালের বড় জা বললেন— 'বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখর করলেন।' বিয়ের আগে বর ভালো ছেলে বলে সকলের সমাদর পেল। আর ভাল না হলেই বা কী— 'পতিই হচ্ছে স্ত্রী লোকের গতি মুক্তি সব।'— এমন করে বুঝিয়ে দি তার দিদি। বিন্দুর আপত্তি সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে বিন্দু জানল পা স্বামী জুটেছে তার কপালে। এ মিথ্যাচার বিন্দু মানতে পারে নি। ঘুমন্ত স্বামীকে ফে চলে এসেছে মৃণালের কাছে। ঘৃণায়, রাগে মৃণালের সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। ত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলল— 'বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।' আর ভয় দেখাল— 'বি শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।' তবু বিন্দুকে বাঁচা মৃণাল লড়ার কথা ভেবেছিল। ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রবঞ্চ আদালত ভালচোখে বিচার করবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। সেখানে মৃণাল বাধার সম্মুখী হয়েও বলেছিল— 'আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।' না, মৃণালে এসব কিছু করতে হয়নি। বিন্দু নিজে তার ভাসুরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছি তারপর। মৃণাল তবু তার খোঁজ খবরের জন্য ভাই শরৎকে নিযুক্ত করেছিল এ বিন্দুকে নিয়ে সব ছেড়ে পুরীর জগন্নাথধামে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু শেষর হয় নি। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করেছে বিন্দু। মৃণালের একক সংগ্রা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সংসারে মৃণালের খাওয়া পরার অভাব ছিল না। কিন্তু তবু সে সাতাশ নম্বর মাখ বড়ালের গলিতে ফিরে যাবে না। সে জগতের সঙ্গে তার মনোজগতের বড় তফাৎ। তা ভেতরকার সত্তাকে বিন্দু আবিষ্কার করতে পেরেছিল। আর বিন্দুর মৃত্যু মৃণালের আবরণ আগাগোড়া ছিন্ন করেছিল। তাই মৃণাল এখন আর মেজ বউ নয়। বিদ্রোহিণী মৃণা নিজের মত করে বেঁচে থাকার পথের সন্ধান পেয়েছিল; সেখানে সমাজের রক্তচক্ষু নেই সংসারের প্রবঞ্চনা, অবমাননা তাকে স্পর্শ করবে না। 'চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল' সাতা নম্বর মাখন বড়ালের ক্ষুদ্র গলি থেকে বেঁচেছিল।

(৫)

গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার পরিবার রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। হালদার পরিবারের সদস্যরা নির্দিষ্ট কতগুলি মূল্যবোধের ঘেরাটোপে বন্দী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো মূল্য সেখানে নেই, গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনার শৃঙ্খলই একমা কাম্য। অথচ হালদার বংশের কর্তা মনোহরলালের জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারিলাল কেব বড়বাবু হয়ে খুশি থাকতে পারেনি। নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে

বংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার এই বিদ্রোহের নেপথ্যে রয়েছে হালদার জমিদারের শাসন-শোষণ।

হালদার জমিদারির প্রজা মধু কৈবর্তকে ঘিরে বনোয়ারিলালের একক সংগ্রাম হালদার গোষ্ঠীর চেতনা থেকে স্বতন্ত্র। নদীতে বেড়াজাল আয়োজন উপলক্ষ্যে কয়েকজন জেলে মিলে মনোহরলালের কাছারি থেকে হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। কিন্তু পরপর তিনবছর নদীর বাঁকে মাছ এত কম এল যে জেলেদের খরচ পোষাল না। অপরদিকে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ল তারা। অন্য জেলেরা ফাঁক বুঝে পালালেও মধু কৈবর্ত পারে না। কেননা সে ভিটা বাড়ির প্রজা। তাই সমস্ত দেনার দায় তার কাঁধে এসে পড়ল। জমিদার মনোহরলালের কাছে দেনা মুকুব করার চেষ্টা বৃথা হয়ে যায়। কেননা— "মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন। কখনোই তাহার অন্যথা হয় না।" অথচ এতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা 'বাবুর ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দ্বারে' 'মূর্তিমান দুর্ভিক্ষে'র মতো যে নীলকণ্ঠ পাহারা দেয়। তার কাছে প্রজার প্রতি দরদের কোনো স্থান নেই। হালদার বংশের অন্যান্য সদস্য 'হালদার গোষ্ঠী'র অন্তর্গত। কিন্তু বনোয়ারিলাল নিজেকে তা মনে করে না। তাই সে দৃঢ়তার সঙ্গে তার স্ত্রীকে বলতে পেরেছিল— "যেমন করিয়া পারি মধু কৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" শুধু তাই নয়, মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করার পণ গ্রহণ করল। তাই নিজের একটি বন্দুক ও হীরার আংটি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করবার জন্য শহরে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে মধু কৈবর্তের ছেলে স্বরূপের কাছে বনোয়ারিলাল মধুকে কাছারিতে বন্ধ করে রাখার কথা শোনার পর নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ জানিয়েছিল। বনোয়ারিলালের প্রচেষ্টাতে মধু কৈবর্তের পক্ষে জেলা আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হয়েছিল। যদিও গল্পকার লিখেছেন— 'কে যে তাহার খরচ যোগাইতেছে বোঝা গেল না।' তথাপি আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না একাজ বনোয়ারিলালেরই। নীলকণ্ঠের ছ'মাস জেল হল, মধু কৈবর্ত বেঁচে গেল। বনোয়ারি হালদার বংশের সন্তান হয়েও প্রজাদরদী মানসিকতা নিয়ে যেভাবে মধুর পাশে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে, সেখানে তার সমর্থনে ছিল না কেউ। হালদার গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা মানুষটি জয়ী হয়েছে।

মনোহরলাল মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পত্তি বংশীর ছেলে হরিদাসের নামে লিখে দিয়ে যান। আর বনোয়ারি সারাজীবন দু'শ টাকা মাসোহারা পাবে। নীলকণ্ঠ তাঁর উইলের একজিক্যুটর বলে তার ওপরে সমস্ত ভার অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু বনোয়ারিলাল তা মানতে পারে নি। স্ত্রীকে তাই সে বলেছিল— "আমি নীলকণ্ঠের পেন্‌সন খাইয়া বাঁচিব

না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলকাতায়।'' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বনোয়ারি জমিদারির দু'শ টাকা মাসোহারা ত্যাগ করে স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছে। শতসমস্যাতেও যদি জীবনসঙ্গিনী পাশে থাকে, তবে অনেক সমস্যা সমস্যা বলে মনে হয় না। তার সহজ সমাধানের পথ এমনি তৈরি হয়। কিরণ ও বনোয়ারিলালের দাম্পত্য সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা-কর্তব্যবোধ সত্ত্বেও হৃদয়ের অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল না। কিরণলেখা হালদারগোষ্ঠীর বধূরূপে সংসারে বংশধর নিয়ে আসাটাকে মুখ্য কর্তব্য বলে মনে করেছে। সুতরাং সেও হালদারগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি। কিন্তু একমাত্র প্রতিনিধি বনোয়ারিলাল একক, বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা।

(৬)

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি দশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশিভূষণ। এম এ পাশ করে আইন পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও কোনো কাজে যোগ দেয় নি সে; আবার বিবাহেও তার সম্মতি ছিল না। অথচ সংসারে অন্যায়, অবিচার, প্রবঞ্চনার প্রতিবাদ করতে পিছপা নয় সে। এতে তাকে অনেক গঞ্জনা, অপমান সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি জেল খাটতেও হয়েছে; তবু শশিভূষণ তার একক কর্মযজ্ঞে বিরত থাকেনি।

ইংরেজ সাহেবরা পরাধীন ভারতবাসীকে দাবিয়ে রাখতে চায়। তারা চায় তাদের নির্দেশ এই মানুষগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করুক। গ্রামে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়লে নায়েব হরকুমারবাবু যথারীতি অতিথি আপ্যায়নের জন্য মুরগি, আণ্ডা, ঘৃত, দুগ্ধ জোগাতে লাগেন। কিন্তু সাহেবের কুকুরের জন্য চার সের ঘিয়ের আদেশ হলে সাহেবের মেথরকে হরকুমার দূর করে দেয়। একথা শোনার পর ক্রোধান্বিত জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মেথরকে ডেকে বলেন— ''এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারিধারে ঘোড়দৌড় করাও।'' ক্রমে একথা ছড়িয়ে যায়, শশিভূষণেরও কানে যায়। স্বজাতির প্রতি অপমানের জন্য শশিভূষণ হরকুমারের পক্ষ নিয়ে সাহেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন— ''সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।'' ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা শুনে হরকুমার প্রথমে ভীত হয়েছিলেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত শশিভূষণের শরণাপন্ন হয়ে বলেন— ''বাপু, শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মতো একজন লোক গ্রামে থাকিতে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।''

শশিভূষণকে মানসিক দিক থেকে এগিয়ে দিয়ে হরকুমার আর শশিভূষণের পাশে থাকল না। জমিদারের কথা মত ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নিয়ে তারই জন্য ফলমূল-উপহার নিয়ে হাজির হয়। সম্পূর্ণ দোষ শশিভূষণের ওপর চাপিয়ে

দিয়ে সাহেবকে জানায়— ''সাহেবের নামে মামলা করা তাঁহার আদৌ স্বভাব বিরুদ্ধ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশত্রু অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্ধার কাজ করিয়াছে।'' আবার জেলার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেলেদের জাল কেটে তাদের প্রতি অত্যাচার করার জন্য শশিভূষণ নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। তাই সাহেবের ওপর হাত তুলতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। অথচ পরিণামে পাঁচ বছর জেল খাটতে হল। সমাজে উপকার করার জন্য অন্তরের তাগিদ থেকে যারা এগিয়ে আসে প্রতিপদে অপমানের বিষ তাদেরই হজম করতে হয়। স্বার্থপর সমাজে আপনজাতির সম্ভ্রম রক্ষায় শশিভূষণের ভাবনা সম্মান পায় না। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে পরোপকারের মহানব্রতে শশিভূষণ একলা মানুষ।

(৭)

বৃত্তিজীবী মানুষদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প কিছু কম লেখেন নি। অধ্যাপক, পোস্টমাস্টার প্রভৃতি। তবে 'মাস্টারমশায়' গল্পে হরলাল বৃত্তিগতভাবে শিক্ষক নয়, তথাপি বেণুগোপালের গৃহশিক্ষক হিসাবে তার কদর ছিল বেশি। পুঁথিগত শিক্ষাদান একজন শিক্ষকের শেষকথা হতে পারে না। হরলাল এই সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। অথচ অবমাননা হয়েছিল তার শেষ সম্বল। নিপাট ভদ্র মানুষের প্রতি অহংকারের আস্ফালন ও সন্দেহের রক্তচক্ষু হরলালের মনে জন্ম দিয়েছিল বেণুগোপাল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার একাকীত্ব বোধ। হয়তো তা এতটা প্রবল নয়।

মা কে পরাধীনতার শৃঙ্খলে থাকতে হয়েছিল বলে হরলালের শিশু বয়স কেটেছিল দ্বিধা-সংকোচে। শৈশবের বাল্যপ্রতাপ দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করবার সুখ তার অধরা ছিল। সমবয়সীদের দলে তার স্থান ছিল না; ছেঁড়াবই আর ভাঙাশ্লেট সবটা নিজের হলেও তার মাঝে একাকীত্ববোধ ছিল বালক হরলালের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়াবই ও ভাঙাশ্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল।'' ছোটবেলাতেই মায়ের দুঃখ ও নিজের অবস্থা সাবধানে বুঝে তাকে চলতে হয়েছিল। আনন্দ করার অবকাশ কিংবা দুঃখযাপনের ক্রন্দন কোনোটাই প্রকাশ করার অবসর পেত না বড়দের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে। শৈশবে তার শিশু মনের এহেন প্রকাশ যেমন তাকে একাকী করেছে, তেমনি ভালত্বের অপরাধে ছাত্র থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্নও হয়েছিল হরলাল।

শিক্ষক হিসাবে হরলালকে পেয়ে বেণু যেন বেঁচে গেল। কেননা বেণুর সকল দৌরাত্ম্য, পীড়ন নীরবে হরলাল সহ্য করে নিত। আর 'পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা পড়া হরলাল' হয়তো নিজেই জানত না বেণুর প্রতি তার স্নেহরস অন্তরে জমা হচ্ছিল। শিক্ষক-ছাত্রের সমবয়সীর মতো মেলামেশা, আত্মার বন্ধন গড়ে তুলেছিল এক অন্য

জগৎ। হরলাল জলপানি পেয়ে কলেজে ভর্তি হলে কিছু বন্ধু জুটেছিল ঠিকই কিন্তু এ জগৎ। হরলাল জলপানি পেয়ে কলেজে ভর্তি হলে কিছু বন্ধু জুটেছিল ঠিকই কিন্তু এগারো বছরের ছাত্র বেণু ছিল তার সকল বন্ধুর সেরা বন্ধু। বেণুকে নিয়ে ঘুরতে বেরোনো, তাকে সঙ্গদান, গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বর্ণন, স্কট-ডিফোর অনেক গল্প বলা, ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করে তর্জমা ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে বেণুর চেতনার জগৎকে সুপুষ্ট করবার চেষ্টা করত। আবার বেণুও হরলালের হৃদয় উদ্‌বোধনের পক্ষে সোনার কাঠির মতো হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্কের রসায়ন মজুমদার পরিবারের 'ভাল ঠেকল না। বেণুগোপালের মা ননীবালা মনে করলেন যে, চাকরি বজায় রাখার জন্য ছেলেকে বশ করার অভিনব কৌশল প্রয়োগ করছে হরলাল। তাই ননীবালা পর্দার 'আড়াল থেকে একদিন হরলালকে বলেন— "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিন রাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। ... বেণু 'আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।" শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক কেবল রুটিনমাফিক শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার বাইরে আর কিছু নয় বলে ননীবালার বিশ্বাস। কিন্তু সে বিশ্বাস তো হরলালের নয়; তাই বেণুর মায়ের কথা বাণের মতো বর্ষিত হল তার হৃদয়ে। চরম দুঃখ ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের বাঁধন আলগা করতে থাকে।

(৮)

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পটি বিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। গল্পের প্রধান তিন চরিত্র ভূপতি, চারুলতা ও অমল। ভূপতি ধনী বটে, অর্থনেশায় উন্মত্ত নয়। ইংরাজি কাগজ সম্পাদনা তার নেশা। ভূপতির বালিকা বধূ চারুলতা তার কাগজ-সম্পাদনায় বিভোর হয়ে থাকার ফাঁকে যৌবনে পদার্পণ করে। আর অমল ভূপতির পিসতুতো ভাই; ভূপতির আশ্রয়ে পালিত। গল্পের ভূপতি-চারুলতা উভয়েই ক্ষেত্র বিশেষে একাকী জগতের বাসিন্দা।

চারুলতা ধনীগৃহের বধূ। সম্পাদনার কাজে মত্ত স্বামী তাকে সঙ্গ দিতে পারে না। বালিকা বধূ যৌবনে উত্তীর্ণ হলে এই সঙ্গহীনতা তার মধ্যে একাকীত্বের জন্ম দেয়। 'কাগজের আবরণ' ভেদ করে স্বামীকে নিজের করে পাওয়া তার পক্ষে দুরূহ ছিল। বিরাট গৃহে একাকী দিনযাপন তার সঙ্গী। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ চারুলতার এই একাকীত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন ছোট্ট অনুচ্ছেদে— "ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফল-পরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।" আত্মীয়ার কাছে ভর্ৎসনার আশঙ্কায় যুবতী বধূ চারুলতার জন্য ভূপতি একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন অনুভব করল। স্ত্রীসঙ্গের অভাবটাই চারুর কাছে শোকাবহ বলে ভূপতির মনে হল। তাই

শ্যালক উমাপতির পত্নী মন্দাকিনীকে বাড়িতে এনে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ভূপতির কাজের চাপে তার যুবতী স্ত্রী যে নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব অনুভব করে সে তা বোঝে। পিসতুতো ভাই অমলকে ভূপতি বলে— "অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই। মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি অমল, ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তাহলে উপকারও হয়, ভালোও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।" চারুর মনের খোরাক অমলই দিতে পারে। লিখে 'অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে'— এই ছিল চারুর প্রতিজ্ঞা। তার সাহিত্যপ্রতিভার পাশাপাশি জেগে ওঠে প্রেম। তাই অমল বিহনে একাকীত্ববোধ বেদনাহত করে চারুলতাকে। অমল চলে গেলে চারুলতার 'সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ' ক্রমশ বাড়তে থাকে। অমলকে হৃদয়ের গোপনকন্দরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে চারু। সেজন্য স্বামীকে না জানিয়ে নিজের গয়না বন্দক দিয়ে অমলকে টেলিগ্রাম করে সে। অমলহীন চারুর একাকীত্ব চূড়ান্ত না হলে কি চারু পারে এমন অস্বাভাবিক আচরণ করতে?

ভূপতি কাজপাগল মানুষ। কাজের জগতে ডুবে থাকাতে তার অন্তরের তৃপ্তি। অথচ এমন কর্মব্যস্ত মানুষ অন্তরের জগতে একাকী। ভূপতি সৎ, মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখায় বিশ্বাসী। বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা এজন্য ভূপতিকে ব্যথিত করে বেশি। শ্যালক উমাপতিকে বিশ্বাস করে ভূপতি কাগজের ব্যাপারে টাকা আদায়, পাওনাদারদের দেওয়া প্রভৃতি দায়িত্ব দেয়। সেই উমাপতি পাওনাদারের ২৭০০ টাকা আত্মসাৎ করে এবং শুধু তাই নয়, ভূপতির নামে বাজারে অনেক টাকা সে নিজে দেনা করে। আবার পরমবন্ধু মতিলালও তাকে ঠকিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সে মনে মনে বিশ্বাস করে— "আর যাই হোক চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।" তাই যেকোন কারণে হোক আঘাত চারুর তরফ থেকে এলে ভূপতি বিষণ্ণতা আর একাকীত্বের বেদনায় নীল হয়ে ওঠে— "ভূপতি মনে মনে কহিল, "হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না,আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই— আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।"" ভূপতি চারুকে এখন নিঃসম্পর্ক লোকের মতো দূর থেকে দেখতে লাগে। মৈশুরে গিয়ে কাগজ সম্পাদনা করা তো ভূপতির চারু থেকে নিজেকে দূরে রাখার নামান্তর। চারু তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে ভূপতি বোঝে অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি ভোলবার জন্য সে পালাতে চায়। কিন্তু একাকী ভূপতি কোথায় পালাবে— "আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে

ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোক পরায়ণ নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। ..." নষ্টনীড়ে দম্পতি চারুলতা-ভূপতি পরস্পর থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংসারের একলা মানুষ হয়ে থাকবে; আসলে নষ্ট দাম্পত্যে যে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান সুদূর, দুর্গম।

(৯)

রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভুবনে রামকানাই, মৃণাল, শশিভূষণ, চারুলতা, ভূপতিরা এদিক থেকে অন্যমাত্রা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'সুভা', 'ঠাকুরদা' প্রভৃতি গল্পও। সুভা কিংবা ঠাকুরদা একদিক থেকে দেখতে গেলে সংসারের একলা মানুষ। একাকীত্ব কখনও চরিত্রগুলোর যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে, কখনওবা তাদের অগোচরে তারা অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা হয়ে যায়। এদের প্রত্যেককে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ অনন্য হয়ে উঠেছে।

ছোটগল্পকার নজরুল

রবিন পাল

কাজি নজরুল ইসলাম কবি হিসাবে বিখ্যাত এবং নানা ভাবে আলোকিত হলেও তাঁর কথাসাহিত্যিক সত্তা সেরূপ গুরুত্ব পায়নি। এই গুরুত্ব না পাওয়ার সঙ্গত কারণ অবশ্য আছে, কিন্তু তা উপেক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটি দুঃখজনক। করাচির সৈন্য শিবির থেকে তিনি যে রচনাটি প্রথম পাঠান তাঁর নাম 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' যা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সৈন্যশিবির থেকে প্রেরিত এই রচনাটি ছোটগল্প, কবিতা আসে তার পরে। ১৯২০ পর্যন্ত তাঁর সাতটি গল্প পর পর প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' এবং 'নূর' পত্রিকায়। তখনও প্রকাশিত কবিতা মাত্র তিনটি। একথাও জানা যায়, তরুণ বয়সে শৈলজানন্দ লিখতেন কবিতা, নজরুল গল্প। পরে শৈলজানন্দ গল্প উপন্যাসের জগতে চলে আসেন, আর নজরুল প্রলয়ের ঝঞ্ঝা নিয়ে হাজির হন কবিতার জগতে। নজরুল লিখেছেন চারটি উপন্যাস— 'কুহেলিকা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'বাঁধন হারা' এবং 'জীবনের জয়যাত্রা'। গল্পের বই তিনটি— 'ব্যথার দান' (১৯২১), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৬), 'শিউলিমালা' (১৯৩১) এই তথ্যই সুপরিচিত। সুকুমার সেন অবশ্য 'সোনালী স্বপন' (১৯৩৩) নামে আর একটি গল্পের বইয়ের কথা বলেছেন। গল্প সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়, আঠারোটি। প্রথম তিনটি বইতে আছে যথাক্রমে ৬টি, ৮টি ও ৪টি গল্প। ৪র্থ বইটির গল্পসংখ্যা আমার জানা নেই।

গল্পকার নজরুল যখন সাহিত্যে হাজির হচ্ছেন তখনও কিন্তু কল্লোল পত্রিকার দেখা মেলেনি। কল্লোল আসে ১৯২৩-এ। তার আগেই গল্পকার হিসেবে নজরুল সুপরিচিত। আমরা কয়েকটি গল্প সূত্রে তাঁর গল্পকার সত্তার কথা বলব।

'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' লেখা ও ছাপা হয় ১৯১৯-এ। তখন তিনি সৈনিক। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ এই চার বছর তাঁর সৈনিকজীবন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল, প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি বাংলা পত্রিকার বিকাশের কাল। 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' জনৈক বাঙালি পল্টনের নেশার ঝোঁকে বলা গল্প। এই বখাটে যুবক তার জীবনের কিছু কথা শোনাচ্ছে। বন্ধুর অনুরোধে জীবনের গল্প বলা। ছোটবেলা ছিল তার বৈচিত্র্যহীন, পড়ালেখায় লবডঙ্কা, তবে দুষ্টামি নষ্টামিতে দড়। একদিন পাঠশালায় ইয়ারদের সঙ্গে যখন মজলিস সরগরম করে বঙ্কিমের মুচিরাম গুড় অনুসরণে 'মাননীয় রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও' আওড়াচ্ছে তখন পন্ডিতমশাই হঠাৎ হাজির হয়ে কান ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিলেন, গালাগালির ঝড় বইল। সহ্য করতে না পেরে পণ্ডিতকে সজোরে ঘুষি মেরে সে হাওয়া। ক্রুদ্ধ পণ্ডিত অভিভাবকের কাছে নালিশ করল, ফলে চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত। বর্ধমানে এক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। এখানেও 'পগেয়া খচ্চর' ছেলে মহলে

প্রতিপত্তি হল। তবে কুষ্ঠ বা দুর্ভিক্ষ সেবাই এই বওয়াটে ছেলের দলের সক্রিয়তা, নানা সভা সমিতির চাঁদা আদায়ের আয়োজনে পান্ডাগিরি। বছর বছর প্রমোশন হত প্রশ্ন চুরি, খাতা চুরির কৌশলে। বাড়ি এড়িয়ে চলত। শেষে মায়ের জিদে তার বিয়ে দেওয়া হল উনিশের কাছাকাছি বয়স। ভালোবাসা আস্তে আস্তে জাগল কিন্তু বউ হঠাৎ মারা গেল। রানীগঞ্জে আবার ছাত্রজীবন, আবার বিয়ে। প্রথম জন ছিল রাবেয়া, দ্বিতীয় জন সখিনা। দ্বিতীয় জনকে ভালোবাসা সম্ভব হচ্ছিল না। নতুন স্কুলে চুরি সম্ভব না হওয়ায় ফেল করতে হল। বাবা বিরক্ত হল, বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, ত্যজ্যপুত্র করা হল। বৌ সখিনা মারা গেল, মা মরল, অগত্যা, মদের নেশা ও পল্টনে যোগদান। চারটি অংশে জীবন বৃত্তান্ত হাজির করা হয়। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ 'ঘ' অংশে পুরুষ নারীর উপলব্ধির কথা থাকলেও, 'গ' অংশে গানের উল্লেখ আছে। বাচনভঙ্গিতে আছে চরিত্রদ্যোতকতা, চমৎকার পরিহাস, বখাটে ছেলের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার। যেমন— চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল, সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত, রাধের বদন তুলে গুড়ুক খাওয়া, পণ্ডিতের কাছে মার খেয়ে সর্ব শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ, পগেয়া-খচ্চর বন্ধুবান্ধব, পুলিশের ঘাড়ে এগার ইঞ্চি ঝাড়া ইত্যাদি। বাউন্ডুলে ভাবটি চমৎকার ফুটেছে কুড়ি বছরের গল্পকারের এই গল্পে।

এরপর বলছি 'রিক্তের বেদন' গল্পটির কথা। এ গল্প আমি-র জবানীতে বীরভূম, নান্নুর, সালার, রেলপথে নানা স্থান থেকে, নিশীথে প্রত্যূষে, মধুপুর, লাহোর, নৌশেরা, কুর্দিস্তান, আজিজিয়া, কুতল-আমরা থেকে কথা বলা, পাঠক যেন ডায়েরি পড়ছে জনৈকের। প্রথমাংশে আছে দেশের জন্য আত্মাহুতি দেবার ডাক, আগুন ভরা প্রাণের কথা, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও পরিপার্শ্বজনের তিরস্কারের কথা, প্রথম গল্পে ছিল নিরুচ্চার প্রেমের কথা, এখানে আছে দেশপ্রেম, তরুণী প্রেম, যৌবনোচিত চির অতৃপ্ত মানসিকতার কথা। এ সবই তরুণ নজরুলের রোমান্টিক হৃদয় উদ্বেলতার শব্দিত অভিব্যক্তি। তরুণী শহিদার বিয়েতে গল্প বক্তা যেন বন্ধন মুক্তির স্বাদ পায়। স্বদেশপ্রেম, তরুণী প্রেম, সব মিলিয়ে এ গল্প রিক্তের বেদনে বাঁধা হৃদয়ের কথা। গল্প শেষে আছে আর এক নারীর মৃত্যুতে তার মায়ের আর্তনাদ এবং বক্তার রুদ্ধকান্নার কথা। নজরুল মানসিকতার স্বদেশউদ্বেলতা এবং প্রথম যৌবনের প্রেম কামনার যুগপৎ অবস্থান ডায়েরি ভঙ্গিতে বেশ ফুটেছে এ গল্পে।

তৃতীয় আলোচ্য— 'অগ্নিগিরি'— একটি সিরিও কমিক গল্প। এ গল্প আমির জবানীতে নয়, তৃতীয় পুরুষের জবানীতে। বীররামপুরের নসীব মিঞা বিত্তশালী ব্যক্তি, তার বাড়িতে থেকে মাদ্রাসার ছাত্র সবুর আখন্দ, যাকে রুস্তম ও তার ছেলের দলবল যখন তখন খেপায়। নসীবের আদুরে মেয়ে নূরজাহান উর্দু পড়ে সবুর-এর কাছে। এক মৌলবী আসে এ বাড়িতে, তখন ছেলেরা সবুরকে খেপাতে মৌলবী তাদের তিরস্কার করে। বিপন্ন সবুর নূরজাহানের প্রেমে পড়ে, অগ্নি-গিরি হৃদয় হয়ে ওঠে মুখর। ক্ষিপ্ত সবুর

আমীরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমীরকে মৃত্যুর হাত থেকে, সবুরকে জেলের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। গল্পের দুটি জিনিস, কারুকৃতির দিক থেকে তারিফ পাবার যোগ্য। তা হল— ভাষার এপিগ্রামাটিক ভঙ্গি। যেমন— 'বাড়ি গাড়ি ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য' বা 'আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।' সমাপ্তির বাক্যটি প্রমথ চৌধুরীর বাক্ ভঙ্গিমা মনে করিয়ে দেয়। যেমন— 'আমীর কে বাঁচানো গেল না মৃত্যুর হাত থেকে— সবুর কে বাঁচানো গেল না জেলের হাত থেকে।' গল্পের দ্বিতীয় তারিফ যোগ্য ব্যাপার, বদ ছেলেদের ছড়া তৈরি করে সবুরকে খেপানো। নজরুলের পরিহাসময় কবিতা দক্ষতার পূর্বাভাস পাই এ গল্পে। এ ছাড়া প্রশংসনীয়, আঞ্চলিক ভাষা নির্ভর সংলাপ, যা আবার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

নজরুল মাত্র আঠারোটি গল্প লিখেছেন। গল্পগুলির সাধারণ বিষয়গত বৈশিষ্ট্য রোমান্টিক দুঃখ, রিক্ত বেদনা, প্রেমের আকুতি। কিন্তু কারুশিল্পের বিচারে এখানে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। পাঠক লক্ষ্য করবেন গল্প সমগ্রে আছে একই গল্পে নানাজনের কথা (ব্যথার দান), গানের সুপ্রযুক্ত ব্যবহার (এ গল্পে ও অন্যত্র), ধূমকেতু-চিত্রকল্পে আগ্রহ এ গল্পকে নানা চিহ্নিত আবহে উপস্থাপন (হেনা), নানা খিনগত সাবটাইটল (বাদল বরিষণে), তৎসম থেকে অর্ধতৎসমে অনায়াস গতি, উপমা ব্যবহারের নতুনত্বের প্রয়াস, পথিকবৃত্তি (যা কল্লোল যুগের, পূর্ববর্তী যুগে বহুব্যবহৃত), নারী চেতনায় মনস্কতার গুরুত্ব (রাজবন্দীর চিঠি, এটিও কল্লোলীয় বৈশিষ্ট্য), আত্মবিবৃতির আধিক্য, বীরভূমের বাগ্দী ভাষায় পুরো গল্প (রাক্ষুসী), রবীন্দ্র রচনার নানা ব্যবহার, অধিকাংশ গল্প চলিতে, ২/১টি সাধুতে (পদ্ম-গোখ্‌রো), সম্পন্ন নাগরিক চরিত্রে দৃষ্টি (তাঁর অধিকাংশ গল্প গ্রাম্য পরিবেশে, গ্রামীণ চরিত্র নিয়ে) ইত্যাদি। নজরুলের ছোটগল্প নিয়ে পাঠক যদি সচেতন ভাবনায় প্রবৃত্ত হন, রচনাকালের কথাটা খেয়াল রাখেন, তাহলে গল্পে তারিফ করার এইসব বৈচিত্র্য এবং নানা কিছু খুঁজে পাবেন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

কাহিনী কবিতা - ওয়র্ডসোয়র্থ ও রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক (ড.) প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত

ভূমিকা— যে ভূমিকায় কবিতার উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু এবং ভাষা সম্পর্কে তাঁর চি ভাবনাগুলি মেলে ধরলেন। সেই জন্যেই ওয়র্ডসোয়র্থের কাব্যের পট বিভাজন সময়ানুযা যে ভাবে করা সম্ভব, কাব্য প্রকরণ বা বিষয় বস্তুর বিবর্তন অনুযায়ী সেভাবে কোনে ক্রান্তিকাল নির্দেশ করা সম্ভব নয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কবিতাতে বিষয়বস্তু যে বিভিন্নতা আছে ওয়র্ডসোয়র্থে তা অনুপস্থিত।

ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 'বন্দীবীর' কবিতায় গল্পের বিন্যাসে এবং ছন্দে আয়োজনে আছে অসাধারণ নিপুণতা।

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে 'গুরুজীর জয়' ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নিনিমিখ।
'অলখ নিরঞ্জন'—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয় ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্জন।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল 'অলখ নিরঞ্জন'
এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারও ঋণ—
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চ নদীর ঘেরি দশ তীর এসেছে সে একদিন।"[১]

এই কবিতায় ছন্দ এবং ধ্বনির ব্যবহার লক্ষনীয়। শিখ সম্প্রদায়ের নবজাগরণ, তাদে বীরত্ব এবং দেশপ্রেম এই সবই বৃহৎ এবং বৃহত্তর, ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর ধ্বনি ব্যবহারে মূ হয়ে উঠেছে। গল্প শুরুর পূর্বের সালতামামির পর গল্পের তীক্ষ্নতা আবেগ এবং পরিণতি নাটকীয়তা অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দেয়।

'গুরুজীর জয়' কানে-কানে কয় 'রে পুত্র,ভয় নাহি।'
নবীন বদনে অভয় কিরণ জ্বলি উঠে উৎসাহি —

কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল, বালক উঠিল গাহি'
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়" বান্দার মুখ চাহি'।।[২]

এই কাহিনী কবিতার Pathos পাঠককে শব্দহীন বাক্যহারা করে রাখে, আবার টানটান কাহিনী পাঠকের মনে শেষের পরও অনুরণন তুলতে থাকে। 'পরশপাথর' কবিতার গল্প মৌলিক নয়, প্রচলিত গল্পকে নিয়ে কবিতা বানাবার মধ্যে 'ব্যালাড' কবিতার সঙ্গে দূর আত্মীয়তার ইঙ্গিত থাকলেও, ছন্দের প্রকরণে এবং কবিতার কাঠামোতে 'ব্যালাডে'র সাথে এই কবিতার কোনো মিল নেই। তবে এই কবিতার জীবনদর্শন একান্তভাবেই ভারতীয়। এই কবিতার কাঠামো বিন্যাসে নিপুণতার ছাপ স্পষ্ট ক্লাসিকাল আদি, মধ্য এবং অন্তের সমাবেশে।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণ কলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে,[৩]

শুরুতেই মুখ্য চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছেন কবি। এ যেন 'Story of Character' কিন্তু 'একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর' কাহিনী কবিতাকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। 'পরশপাথর' কবিতায় ক্ষীণ কাহিনী ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষ্যাপা — তাকে অবশ্য ট্র্যাজিক চরিত্র বলা যায় না। বলা যায় প্যাথেটিক চরিত্র। কবিতাটি প্রতীকী। যদিও এখানে গল্প একটি আছে। কিন্তু গল্প এখানে খোলসমাত্র। কবির আসল উদ্দেশ্য গল্প বলা নয়।

পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূরে নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে,
আসন্ন রজনী ছায়ে ম্লান সর্বদেশ
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষুবুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল-ভর'
বাকি অর্ধভগ্ন প্রাণ আবার করিছ দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।[৪]

মানবজীবন তো ক্ষ্যাপার মত পরশ পাথর খোঁজার ইতিহাস। কি খুঁজছি, তা আমরা জানিনা। কিন্তু খুঁজে চলেছি নিরন্তর, অবশেষে খোঁজাটা হয়ে যায় যেন যান্ত্রিক। প্রার্থিত

বস্তু কখন আমাদের অগোচরে দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে যায় কখন, সে খবরও রাখি না। হঠাৎ যখন আবিষ্কার করি, দেখা পেয়েও হারিয়েছি প্রার্থিত বস্তু, তখন আমাদের "নুয়ে পড়ে দেহভার", কবির জীবনবোধ এই কবিতায় কাহিনীর থেকেও বেশি কিছু দিয়েছে আমাদের। 'পুরস্কার' শুধু কাহিনী কবিতা নয়। এটি একটি ভিন্ন ধরণের কবিতা, এখানে আছে মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা এবং কবির কাব্যাদর্শের পরিচয়। কিন্তু কাহিনীর চুম্বকও এখানে অমোঘ। কবি ও কবিপত্নীর প্রেম ও রঙ্গ — একটি প্রেমের গল্প হয়ে ওঠার যথেষ্ট উপাদানঃ

সে দিন বরষা ঝর ঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী,
"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি।

....

ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি।
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি।
কিসে কড়ি আসে দু'টো।"[৫]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিযোগের তালিকা, কাহিনী কবিতার কাহিনীরসকে জমাট করেছে প্রথমেই। কিন্তু তবুও এই কবিতাকে কাহিনী প্রধান বলা যাবে না। 'পরশ পাথর' কবিতার ছন্দ কিছুটা সরল ও বৈচিত্র্যহীন 'পুরস্কার' কবিতার ছন্দ মাধুর্য অনুপম, তাই 'পুরাতন ভৃত্য' বা 'দুই বিঘা জমি' যে অর্থে কাহিনী কবিতা, সেভাবে 'পুরস্কার কবিতাকে বিচার করা যাবে না; এর কাব্যিক ভাষা ও ভাব একে অন্য পর্যায়ে তুলে ধরেছে। এই কবিতায় বিধৃত গল্পের মধুর পরিণতি যেন রূপথার আবেশ সৃষ্টি করে; কবির পত্নী কবির বুকে মুখ রেখে, 'কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া" তাঁর মুখ চুম্বন করল।

"বিস্মিত কবি বিহ্বল প্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়,
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে

চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে,
বাঁধা প'ল এক মালাবাঁধনে
লক্ষ্মী-সরস্বতী।"[৬]

আজকের একবিংশ শতকে অনেক দম্পতিরই মনে হয় এ যেন ইচ্ছাপূরণের কবিতা। 'পূজারিনী'তে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধে নিবেদিত শ্রীমতীর কাহিনী শুনিয়েছেন। কাহিনীর শুরুতেই তার পরিণতি আভাসিত।

"মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল, 'কে তুই ওরে দুর্মতি
মরিবার তরে করিস আরতি?
মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতি, আমি বুদ্ধের দাসী।"
সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।"[৭]

এই কবিতার সাথে 'বন্দী বীর' কবিতার মিল আছে। দুটি কবিতার মেজাজে (mood) এক সুপ্ত সাদৃশ্য আছে। 'অভিসার' কবিতাতেও কাহিনী আছে, কিন্তু সেখানে কাহিনীর শেষের চমক যেন পূর্বপরিকল্পিত। নগরীর নটী বাসবদত্তাকে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত কথা দিলেন যে যথা সময়ে তার সাথে দেখা করবেন তিনি। যে পাঠক উপগুপ্ত এবং বাসবদত্তার কাহিনী জানেন না সে পাঠকের মনেও সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সম্ভাব্য অধঃপতনের চিন্তা আসবে না। তাই কবিতার শেষে-

সন্ন্যাসী বসি   আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির' পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে শীতচন্দনপঙ্কে
ঝরিছে মুকুল, কুজিছে কোকিল যামিনী জোছনামত্তা
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা"।[৮]

এই পংক্তিগুলি পাঠ করে পাঠকের মনে কোনো চমক জাগে না কারণ এমন একটা

কিছুর জন্যই সে মনে মনে প্রস্তুত ছিল। 'পরিশোধ' কবিতার নাটকীয়তা কবিতার গ্রা ভেঙে একে কাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দুই পুরুষ এবং এক না আখ্যায়িকাকে কবি মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে হাজির করেছেন। বজ্র সেনকে কি কঠোর অতিমানবীয় মনে হয়, উত্তীয়ের অর্বাচীন আত্মবলিদান খানিক সেন্টিমেন্ট মনে হতে পারে আধুনিক পাঠকের। কিন্তু প্রেমের নিষ্ঠুরতায়, আবেগে এবং স্বার্থপর শ্যামাকে বাস্তবিকই এক আধুনিক জীবন্তনারী বলেই বোধ হয়।

"আমি দয়াময়ী!" রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা—
'এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।'[9]

'পরিশোধ' এর কাব্যিক মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, বিশ্লেষণ চালানো যে পারে। কিন্তু এ কবিতার কাহিনীর বলিষ্ঠতা যে কোনো পাঠককেই আকর্ষণ করবে।

'পুরাতন ভৃত্য' সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায় 'পুরাতন ভৃত্য' কি 'গল্পগুচ্ছে অন্তর্গত হতে পারত? গদ্যে লেখা হলে এই কাহিনীর ভাবালুতা কি অসহ্য হতো না অর্থাৎ কাহিনীর দুর্বলতা ছন্দবিন্যাসের সাহায্যে পূরণ করা হয়েছে? 'পুরাতন ভৃ কবিতাতে গল্পের মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। আছে বহু পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের গ তবুও এই কাহিনীতেও আছে সমকালীন সমাজের রেখা চিত্রের দু একটি আঁচড়, আ বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের বিভেদরেখার আভাসঃ

"যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে—
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।"[10]

কেষ্টার চরিত্রের প্রভুভক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও গৃহিনীর চরিত্রে আছে বিশ্বস্ত ছাপ। গৃহস্বামী এবং সংসারের উপর প্রবল আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অনীহা এবং বিরক্তি প্রকাশ গৃহিনীদের যেন স্বধর্মঃ

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, "আর পারি না কো—
রহিল তোমার এ ঘরদুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।"[11]

কর্তা, গৃহিণী এবং কেষ্টা— এই তিন চরিত্রের অকিঞ্চিতকর ঘাত প্রতিঘাতে যে

পারিবারিক নাটক গড়ে উঠেছিল তার একটি স্নিগ্ধ আকর্ষণ আছেই কিন্তু কাহিনী কবিতার শেষার্ধে যেন এক সেন্টিমেন্টাল নাটক।

"লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে,
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।"[12]

"দুই বিঘা জমি" কবিতাতেও পাই কাহিনীর প্রাবল্য। এখানেও কাহিনীর টান অনস্বীকার্য, তবে কাহিনী ভাবালুতা আর সেন্টিমেন্ট এর রসে জড়িত। এখানে অবশ্য আরও একটি ব্যাপার আছে— শোষিত এবং শোষক এই দুই শ্রেণীর উপস্থিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে। যেমন 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায়, 'গৃহিনী' মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হলেও শোষকের ভূমিকায়, শোষিত 'কেষ্টা'। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় শোষক জমিদার এবং শোষিত কৃষক শ্রেণীভুক্ত উপেন। 'ঝুঁটি বাঁধা' উড়ের সাথে উপেনের কোনো শ্রেণীগত পার্থক্য নেই, তবু সে শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

"হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী।
ঝুঁটিবাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।"[13]

সমাজের এই অদ্ভুত চিত্রের বর্ণনা দিয়ে কবি কাহিনী কবিতাটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। এ কবিতার 'উপেন' একটি বিশেষ চরিত্র না হয়ে এক শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

"এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"[14]

কাঙালের ধন চুরি করেই যে রাজা 'রাজা' হয়ে ওঠে এই গভীর এবং সরল সত্য কবি এই কাহিনী কবিতায় অমোঘভাবে প্রকাশ করেছেন। কবিতার শেষে নিজের বাগানের দুটি আম সংগ্রহ করার জন্য জমিদার যখন উপেনকে চোর বিশেষণে ভূষিত করছেন, তখন শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর অসহায়তা আবার ফুটে উঠেছে:

আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ্ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়"।
আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হোলে আজ, আমি আজ চোর বটে।[15]

'দেবতার গ্রাস' কবিতাটিতে আমরা পাই আঁটো সাটো এক গল্প। এখানে এক... চরিত্র, তাদের বিভিন্নতা, গল্পের শুরু, ক্লাইম্যাক্স এবং ভয়ঙ্কর পরিণতি কাহিনীর চা... নিয়েছে কবিতার পরিসরে চরিত্রের দ্বিমাত্রিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— সে... সেই মহাশয়, তিনি কিন্তু ভিলেন নন। তিনি চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তে, মৃত্যুর মুখে... বাঁচার মানুষের স্বার্থপরতা এবং আত্মরক্ষার তাগিদে বোধহীন বর্বরতার শিকার-

ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, "এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।"[১৬]

'জনতা' নামহীন, অবয়বহীন এক নিষ্ঠুর জান্তব উপস্থিতি। তার বোধহীন-বিবেকহীন চেতনহীন গর্জন উঠে "দাও তারে ফেলে।" অসহায় মা'র সন্তানকে রক্ষা করার আকুতি... উত্তর-

ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ—
"আমি তোর রক্ষাকর্তা, রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে।
শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ করে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে।"[১৭]

কিন্তু মানবিক বোধ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় নি তাঁর ভিতর থেকে:

'ফিরায়ে আনিব তোরে' কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে—
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে।[১৮]

এই কাহিনী কবিতার পরিণতি যেন গ্রীক নাটকের অদৃষ্টবাদের কথা মনে করিয়ে দে... সন্তানের প্রতি ক্রুদ্ধ মা মুহূর্তের অনবধানতায় ক্রোধভরে চিৎকার করেছিলেন:

"চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"[১৯]

কি অদ্ভুত dramatic irony; মায়ের একমাত্র সন্তান জলে বিলীন হয়ে গেল:

...মুহূর্তের তরে,
ফুটিল তরঙ্গ-মাঝে মেলি' আর্তচোখ
"মাসি" বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি,

বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্বপানে উঠি'
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।[২০]

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কবিতায় কাহিনীর বৈচিত্র্য ওয়র্ডসোয়র্থের কাহিনী কবিতায় নেই। কিন্তু ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতাতে আছে একাধিক স্বর। 'The Idiot Boy' কবিতার শুরুতেই আছে এক কথকের কণ্ঠস্বর

'Tis eight O'Clock, - a clear March, night
The moon is up, - the sky is blue,
The owlet, in the moonlight air,
shouts from nobody know's where;
He lengthens out his lonely shout,
Halloo! halloo! a long halloo!
- why bustle thus about your door,
what means this bustle, Betty Foy?
why are you in this mighty fret?
And why on horse back have you set
Him whom you love your idiot Boy?[২১]

মনে হয় কথক মশাই বেটি ফয়ের কাছের লোক —সামাজিক প্রতিষ্ঠায় একই পর্যায়। কথক এবং কবি দুটি আলাদা সত্ত্বা। এই কথকের চরিত্র ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতাকে আরেক মাত্রা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় কবি নিজেই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন, এ যেন omniscient method; কিন্তু ওয়র্ডসোয়র্থের 'The Idiot Boy' কবিতায় অন্যান্য আরও পাঁচ চরিত্রের মত 'কথক'ও একটি চরিত্র। কবি ওয়র্ডসোয়র্থ কথকের মুখ দিয়ে ঘটনাটি বলছেন; ওয়র্ডসোয়র্থ ব্যালাড আঙ্গিক ও দৃশ্যধারা প্রায় নিখুঁতভাবেই ব্যবহার করেছেন। তবে ওয়র্ডসোয়র্থের কাহিনীর ঘনত্ব নেই। অসুস্থ সুশানের জন্য ডাক্তার আনবার কেউ নেই। তাই প্রতিবেশিনীর জন্য বেটি তার বোকা খোকাটিকে শহরে পাঠায় ডাক্তার আনতে। খোকা ফিরে না আসায় বেটি ছোটে ডাক্তারের বাড়ি:

"Oh, Doctor! Doctor! Where's my Johnny?"

রাতে ঘুম ভেঙে ডাক্তার তাঁর বিরক্তি চাপতে পারেন না। বলেন

"What, Woman! should I know of him?"
And grumbling he went back to bed.[২২]

ডাক্তারবাবু সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ, কথক বা বেটির থেকে তাঁর মানসিক স্থি
অবশ্যই পৃথক। অবশেষে 'জনি' কে ফিরে পায় তার মা। এতক্ষণ 'জনি' চাঁদ, তারা আর
প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এতক্ষণ সে আনন্দে বুঁদ হয়েছিল। কিন্তু ওয়ার্ডসোয়র্থ
বাস্তববাদী। তাই খোকা জনিকে তিনি অচেতন প্রকৃতি প্রেমিক হিসেবে দেখান নি

Oh Roader! now that I might toll
What Johnny and his Horso aro sooing!
What thoy'vo boon doing all this timo
A most dolightful talo pursuing! [২৬]

অথবা

I do tho Musos havo boon bound
Thoso fourtoon yoars by strong indonturos;
O gentlo Musos! is this kind?
Why will you thus my suit ropol?
Why of thy furthor aid boroavo mo?
And can yo thus thus unfrionded loavo mo,
Yo Musos! whom I lovo so woll? [২৭]

এখানে আমরা স্পষ্টই কবি ওয়র্ডসোয়র্থের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই; কিন্তু এটিও নিশ্চিত করে আমরা বুঝতে পারি যে কথক এবং কবি একই ব্যক্তি। কবি মাঝে মাঝে কথকের মুখোশ পরে কথকের ভূমিকা পালন করছেন এবং আবার মুখোশ খুলে কবি কণ্ঠেই পাঠককে সম্বোধন করছে। এই ব্যাপারটি ওয়র্ডসোয়র্থের কাহিনী কবিতাকে একটি তৃতীয়মাত্রা প্রদান করেছেন। এখানেই শেষ নয়। এই কবিতার আর একটি মাত্রা আছে। বোকা খোকাটিকে ওয়ার্ডসোয়র্থ Divino Fool এর achotypo হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'জনি' বেটি এবং সুশানের মনে ভালবাসার জোয়ার আনে, 'জনি' পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার গায়ে আঁচড়টি লাগে না; সে অদ্ভুৎ এবং অব্যক্ত এক আনন্দের প্রতীক, অন্যদিকে অবশেষে সে আবার সেই বোকা খোকাটি:

For whilo thoy all wore travelling home,
Cried Betty, 'Tell us, Johny, do,
Where all this long night you have been
What you have heard, what you have seen
And Johnny, mind you tell us true'.

Now Johnny all night long have heard
The owls in tuneful concert strive;
No doubt too he the moon had seen;
For in the moon light he had been
Form light O'clock till five

Thus to Betty's question, he
Made answer, like taveller bold,
(His very words I give to you)
The cocks did crow he whoo, to whoo
And the sun did shine so cold!
Thus answered Johnny in his glory,
And that was all his travel's story. [২৮]

ওয়ার্ডসোয়র্থের প্রায় সব কাহিনী কবিতারই একটি প্রধান চরিত্র থাকে যাকে আবর্তন করে ঘটনা দানা বাঁধে। The Idiot Boy কবিতায় সুশান, বেকি বায় এবং ডাক্তারের চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু 'The Old Coumberland Beggar' কবিতায় একটি মানুষের কাহিনী। এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক - একা এবং সঙ্গীহীন। গল্প নেই, শুধুই চরিত্র, কিন্তু না বলা গল্প অনেক। এমনই আর এক অশক্ত বৃদ্ধের ছবি পাই The Leech Gatherer-এ এবং এই বৃদ্ধ অশক্ত কিন্তু কর্মহীন নয়। ওয়র্ডসোয়র্থ আবারও দারিদ্র, নিঃসঙ্গতা এবং অসহায়তার ছবি এঁকেছেন। Simon Lee আরও একজন অশক্ত বৃদ্ধ। কিন্তু সাইমন তো একদা ছিল সবল এবং তরুণ অন্য সবার মত।

No man like him the horn could sound
And hill and valley rang with glee
When Echo bandied, round and round,
The halloo of Simon Lee.
In those round days he little cared
For husbandry or tillage;
To blither tasks did Simon rouse
The sleepers of the village

কবি বৃদ্ধকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার পর বৃদ্ধের চোখে জলের ধারা

"I've heard of hearts unkind
kind deeds with coldness still returning;[২৮]

কবির বহু কাহিনী কবিতার মধ্যে একটি সর্ব অর্থে অসাধারণ কাহিনী-কবিতা T Ruined Cottage, কবিতাটি ওয়র্ডসোয়র্থ রচনা করেছিলেন ১৭৯৮ সাল না কিন্তু প্রকাশ করেন ১৮১৪ সালে The Excursion এর প্রথম অংশ হিসাবে (Bo I)। কবিতাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী কবিতা হিসাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে আছে এক কথক, ভবঘুরে। তার কাছ থেকেই শুনছেন মার্গারেটের কাহিনী

Margaret stood near her infant in her arms.
And noting that my eye was on the tree
She said "I fear it will be dead and gone
Ere Rabert come again". When to the House
We had returned together, she enquired
if I had any hope- but for her babe
And her little orphan boy, she said
She had no wish to live and she must of sorrow.[২]

এটি একটি পরিত্যক্তা স্ত্রীর গল্প, এক ভেঙে যাওয়া পরিবারের গল্প। মেয়েটি (মার্গারে বার বার ভেবেছে তার স্বামী ফিরে আসবে, সেই আশাই করে গেছে শেষ দিন পর্য তার সন্তানদের একজন তাকে ছেড়ে চলে গেছে দূরে; অন্য এক সন্তান অসুস্থ হ অবশেষে মারা গেছে। শেষে মারা গেল মার্গারেটও। তাদের কুটির এবং বাগান এক জীর্ন — সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে। স্বামী পরিত্যক্তা মার্গারেটকে কি রবীন্দ্রনাথের কাে সাধারণ মেয়ের সাথে তুলনা করা চলে, 'সাধারণ মেয়ে'র মেয়েটিও তো এক অ পরিত্যক্তা। নরেশের চিঠির সংকেত তাকে বুঝিয়েছে যে কপাল তার পুড়েছে; নরেশে মন যে 'লিজি' তে মজেছে। দুটি নামেরও কি অদ্ভুত মিল। ওয়র্ডসোয়র্থের মার্গারে আর রবীন্দ্রনাথের মালতী, দুজনেই সাধারণ, অতিসাধারণ। কিন্তু মালতি স্বপ্ন দেখে হোক না সে আকাশকুসুম স্বপ্ন; তবু সে স্বপ্ন দেখে;

মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক না—
বড় বড় নামজাদার সভা।
মনে করা যাক্ সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—

ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি—
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।[৩০]

মার্গারেট স্বপ্ন দেখে না, সে শুধু আশা করে, অপেক্ষা করে, মানসিকতায় মালতী মার্গারেটের থেকে অনেক বেশি শহুরে। তাদের দুজনের বেদনার ধরণ আলাদা। মার্গারেটের মতই আর এক অভাগিনীর কাহিনী 'The Thorn' কবিতায়, এখানেও নামের মিল মার্থা। স্টিফেন কথা দিয়েও বিয়ে করল না মার্থাকে; অন্য জায়গায় বিয়ে হল তার, অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দিল মার্থা। তারপর কেমন করে মৃত্যু হল সেই শিশুর? মা কি হত্যা করল আপন শিশুকে?

But what's the Thorn? and what the pond?
And what the hill of moss to her?
And what he creeping breeze that comes
The little pond to stir?
'I can not tell; but some will say
She hanged her body on the tree,
Some say she drowned it in the pond,
Which is a little step beyond;
But all and each agree,
The little baby was buried there,
Beneath that hill of mass so fair.[৩১]

এ গল্প শুধু একটি নারীর গল্প নয়, এ গল্প একটি পুরুষের গল্পও বটে— হয়তো বা পুরুষ জাতির প্রতিভূর গল্প যারা স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় করে। এ গল্প নামহীন অবয়বহীন জনতার গল্পও, 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় সেই 'জনতা' রাখালকে উন্মত্ত ঢেউ-এর মাঝে নিক্ষেপ করার রায় দিয়েছিল। এখানেও 'জনতা' হীন, কাপুরুষ, লম্পট স্টিফেনের দিকে কোনো আঙুল তোলে না, কিন্তু মার্থার শাস্তি দাবী করেন -

And some had sworn on oath that she
should be to public justice brought;
And for the little Infant's bones
With spade, they would have sought.[৩২]

সমাজের অবক্ষয়কে চাবুক মেরেছেন ওয়র্ডসোয়র্থ এই কবিতায়। লক্ষনীয় যে এই কবিতাতেও ওয়র্ডসোয়র্থ 'কথক' চরিত্র রেখেছেন। এই কবিতারও 'ব্যালাড' আঙ্গিক স্পষ্টতই দৃশ্যমান। ওয়র্ডসোয়র্থের বহু কবিতাতেই কাহিনীর টুকরো ছড়িয়ে আছে, কিন্তু ওগুলিকে সঠিক অর্থে কাহিনী কবিতা বলা চলে না। যেমন 'Alice Fell' কবিতাতে একটি ছোট মেয়ের কাহিনী; 'The Revierie of poor susan' কবিতাতেও একটি ঘন জমাট বাঁধা কাহিনী আছে। সুশানের 'দিবা স্বপ্ন' যেন কাহিনীর 'ফ্ল্যাশ ব্যাক'। Mathew সিরিজের তিনটি কবিতাকেও হয়তো কাহিনী কবিতার তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। 'Lucy Gray' কবিতাতে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী বিদ্যমান। শহর থেকে মা ফিরে আসছেন। বাবার নির্দেশে লুসি লণ্ঠন নিয়ে যাবে। গ্রামের আঁধার পথে মা'কে আলো দেখাবার জন্য। কিন্তু ঝড়ের রাতে লুসি হারিয়ে গেল।

'The storm came on before the time;
She wandered up and down;
And many a hill did Lucy climb
But never reached the town.

The wretched parents all that night
Went shouting far and wide;
But there was neither sound nor sight
To serve then for a guide'[৩৩]

এমন কি 'We are Seven' কবিতাটিতেও একটি নরম করুণ গল্প আছে। 'Michael' এমন এক কাহিনী কবিতা যার ভাষায় এবং স্টাইলে আছে ক্ল্যাসিক্যাল উচ্চতার ছাপ। এ কবিতাও বর্ণিত হয়েছে এক কথকের কণ্ঠ নিসৃত হয়ে। এক উপত্যকায় বাস করে মাইকেল। মাত্র গুটিকতক ভেড়া তার; দরিদ্র সে; বৃদ্ধ তবু বলিষ্ঠ সে। জোর তার শুধু দেহে নয় মনেও। নির্জন উপত্যকায় পরিশ্রম করে মাইকেল ও তার স্ত্রী। যেন নূতন নন্দন কাননে (Garden of Eden) দুই নতুন মানুষ —নূতন আদম এবং ইভ

His day's had not been passed in singleness
His helpmate was a comely matron, old-
Though younger than himself full twenty years.
She was a woman of stirring life,
Whose heart was in her house; two wheels she had

Of antique form; this large for spinning wool;
That shall for flax; and if one wheel had rest
it was because the other was at work.
The Pair had but one inmate; their house,
And only child who had been born to them."[৩৪]

পিতা মাতা এবং সন্তান এই নিয়ে যেন নিউক্লিয়ার পরিবার। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর অসীম ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান তাদের নয়নের মনি। ছেলে বড় হয়ে ওঠে। মাইকেল এক দুঃসময়ে পড়ে, ঋণ শোধ করার জন্য তার চাষের জমির একাংশ বিক্রি করতে হয়। মাইকেল সিদ্ধান্ত নেয় যে শহরে পাঠাবে ছেলেকে তার। তার ছেলে এক আত্মীয়ের অধীনে কাজ করবে। মাইকেল আর তার স্ত্রীর মনে নতুন আশা।

When I began, my purpose was to speak
Of remedies and of a cheerful hope
Our luke shall leave us, Isabel; the land
Shall not go from us and it shall be free;
He shall propose it, tree as is the wind
That passes over it. We have, thou know'st
Another kinsman - he will be our friend
In this distress. He is a prosperous man.
Thriving in trade - and Luke to him shall go
And with his kinsman's help and his own thrift.
He quickly will repair the loss and then
He may return to us."[৩৫]

কিন্তু Luke শুরু করল কাজে অবহেলা। সে খারাপ পথে যেতে শুরু করল; অবশেষে সে এত হীন কাজে নিজেকে সঁপে দিল যে

"..........he was driven at last
To seek a hiding place beyond the seas."[৩৬]

এই কাহিনীর মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই, কোনো ঘটনার ঘনঘটা নেই, অদ্ভুত শান্ত এবং নিরুচ্চারভাবে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শুধু বাবা, মা এবং সন্তানের কাহিনী বলা হয় নি, বলা হয়েছে আরও গভীর গভীরতার কথা; মানুষের সাথে মানুষের

সম্পর্কের কথা, মানুষের সাথে তার পারিপার্শ্বিক জগতের সংযোগের কথা। এই সম্পর্ক এবং সংযোগের উপরই নির্ভর করে সমস্ত শৃংখলা।

There, by the sheep-fold, sometimes was he seen
Sitting alone, or with his faithful Dog.
Then old, beside him lying at his feet,
The length of full seven years, from time to time
He at the building of his sheep-fold wrought
And left the work unfinished when he died
Three years, or little more, did Isabel
Survive her husband, at her death the estate
was sold and went into a stranger's hand[৬৭]

মাইকেল বা ইসাবেলের পরাজয় তাদের ব্যক্তিগত পরাজয় নয়, এ মূল্যবোধের এক মনুষ্যত্বের পরাজয়। একই রকম পরাজয় আমরা দেখি 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় নিষ্ঠুর জনতার দেওয়া রাখালের মৃত্যুদণ্ডের আদেশে, অথবা 'The Thorn' কবিতায় নারীত্বের অবমাননায়।

এক অন্যধরনের বিষাদ আছে রবীন্দ্রনাথের 'ফাঁকি' কবিতায়। তেইশ বছরের বিনুর হয়েছে চরম রোগ। দেড় বছর চিকিৎসার পরও অসুখ যখন সারল না, তখন ডাক্তার বললেন হাওয়া বদল করার কথা। বিয়ের পর এই প্রথম বিনু ছাড়ল শ্বশুরবাড়ি। জীবন তার দ্রুত ফুরিয়ে আসছে বলে আজ সব কিছুতেই যেন বিনুর আনন্দ। সে হঠাৎ বায়না ধরে যে রেল কুলির স্ত্রী রুকমিনীর মেয়ের বিয়ের গয়নার জন্য পঁচিশ টাকা দিতে হবে স্বামীকে। স্ত্রীর কাছে রাজি হলেও স্বামী ভদ্রলোক আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিয়ে দুটি টাকা রুকমিনীর হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। দুইমাস পরে বিনুর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হল। মৃত্যুর আগে -

বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদুরসম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভ'রে।
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"[৬৮]

কিন্তু স্বামীর মনে যে অনুতাপের শেষ নেই। শেষ দু'মাসের অর্ঘ্যে যে আছে ফাঁকি। রুকমিনীকে বিনু পঁচিশ টাকা দিতে বলেছিল; আজ তাকে লক্ষ টাকা দিলেও সেই ফাঁকি

পূরণ হবে না। বিলাসপুরে থেকে শত চেষ্টা করেও রুকমিনীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ... লক্ষ "শুধু", তাই তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেও নিরুত্তর হয়ে থাকল সবাই।

"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভ'রে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।"[৬৯]

অতি সাধারণ কাহিনী কিন্তু শেষ হলো কেমন যেন মন ভারাক্রান্ত করে। 'ফাঁকি' আর মূল্যবোধের কথা।

'নিষ্কৃতি' কবিতায় আছে মেয়ের বাবার অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। পুলিনের পিতা পঞ্চাননের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিলেন; পাত্রের বয়স অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, মেয়ে বিধবা হয়ে বাড়ি ফিরলে, তাকে ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ দিলেন, কিন্তু নিজে স্ত্রীর মৃত্যুর একমাসের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় বিয়ে করতে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সমাজ মনস্কতার ছবি দেখতে পাই আমরা। সমাজের নিয়মের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বহু বিবাহের বর্বরতা তিনি উন্মোচন করেছেন এই কবিতায়। কিন্তু অবশেষে মঞ্জুলিকা বিদ্রোহিনী হয়ে গেছে; তাই তার বাবা

যখন ফিরে এলেন দেশে,
সরেছে সেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।[৭০]

'ক্যামেলিয়া' অন্যধরণের কাহিনী কবিতা। এখানে গদ্যছন্দ ব্যবহারে কবির পরিপূর্ণ পরিণতির ছাপ, এখানে রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শোনাতে চাননি; বরঞ্চ এখানে আছে না ভাবা জায়গায় হঠাৎ করে সুন্দরের আবিষ্কার:

"বাইরে থেকে মিহিসুরে আওয়াজ এল,
"বাবু ডেকেছিস কেন?"
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে "ডেকেছিস কেন?"
আমি বললেম, "এই জন্যেই",
তারপরে ফিরে এলেম কলকাতায়।"[৭১]

ডাক্তারবাবু সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ; কথক বা বেটির থেকে তাঁর মানসিক অবশ্যই পৃথক। অবশেষে 'জনি' কে ফিরে পায় তার মা। এতক্ষণ 'জনি' চাঁদ, তারা প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এতক্ষণ সে আনন্দে বুঁদ হয়েছিল। কিন্তু ওয়র্ডসো বাস্তববাদী। তাই খোকা জনিকে তিনি অচেতন প্রকৃতি প্রেমিক হিসেবে দেখান নি

Oh Reader! now that I might tell
What Johnny and his Horse are seeing!
What they've been doing all this time
A most delightful tale pursuing! [২৪]

অথবা

I do the Muses have been bound
These fourteen years by strong indentures:
O gentle Muses! is this kind?
Why will you thus my suit repel?
Why of thy further aid bereave me?
And can ye thus thus unfriended leave me,
Ye Muses! whom I love so well? [২৫]

এখানে আমরা স্পষ্টই কবি ওয়র্ডসোয়র্থের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই; কিন্তু এটিও নিশ্চিত করে আমরা বুঝতে পারি যে কথক এবং কবি একই ব্যক্তি। কবি মাঝে মাঝে কথকের মুখোশ পরে কথকের ভূমিকা পালন করছেন এবং আবার মুখোশ খুলে কবি কণ্ঠে পাঠককে সম্বোধন করছে। এই ব্যাপারটি ওয়র্ডসোয়র্থের কাহিনী কবিতাকে একটি তৃতীয়মাত্রা প্রদান করেছেন। এখানেই শেষ নয়। এই কবিতার আর একটি মাত্রা আছে বোকা খোকাটিকে ওয়ার্ডসোয়র্থ Divine Fool এর achetype হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'জনি' বেটি এবং সুশানের মনে ভালবাসার জোয়ার আনে, 'জনি' পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার গায়ে আঁচড়টি লাগে না; সে অদ্ভুৎ এবং অব্যক্ত এক আনন্দের প্রতীক, অন্যদিকে অবশেষে সে আবার সেই বোকা খোকাটি:

For while they all were travelling home,
Cried Betty, 'Tell us, Johny, do,
Where all this long night you have been
What you have heard, what you have seen
And Johnny, mind you tell us true'.

Now Johnny all night long have heard
The owls in tuneful concert strive;
No doubt too he the moon had seen;
For in the moon light he had been
Form light O'clock till five

Thus to Betty's question, he
Made answer, like taveller bold,
(His very words I give to you)
The cocks did crow ho whoo, to whoo
And the sun did shine so cold!
Thus answered Johnny in his glory,
And that was all his travel's story. [২৬]

ওয়ার্ডসোয়র্থের প্রায় সব কাহিনী কবিতারই একটি প্রধান চরিত্র থাকে যাকে আবর্তন করে ঘটনা দানা বাঁধে। The Idiot Boy কবিতায় সুশান, বেকি গায় এবং ডাক্তারের চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু 'The Old Coumberland Beggar' কবিতায় একটি মানুষের কাহিনী। এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক - একা এবং সঙ্গীহীন। গল্প নেই, শুধুই চরিত্র, কিন্তু না বলা গল্প অনেক। এমনই আর এক অশক্ত বৃদ্ধের ছবি পাই The Leech Gatherer-এ এবং এই বৃদ্ধ অশক্ত কিন্তু কর্মহীন নয়। ওয়ার্ডসোয়র্থ আবারও দারিদ্র, নিঃসঙ্গতা এবং অসহায়তার ছবি এঁকেছেন। Simon Lee আরও একজন অশক্ত বৃদ্ধ। কিন্তু সাইমন তো একদা ছিল সবল এবং তরুণ অন্য সবার মত।

No man like him the horn could sound
And hill and valley rang with glee
When Echo bandied, round and round,
The halloo of Simon Lee.
In those round days he little cared
For husbandry or tillage;
To blither tasks did Simon rouse
The sleepers of the village

কবি বৃদ্ধকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার পর বৃদ্ধের চোখে জলের ধারা

"I've heard of hearts unkind
kind deeds with coldness still returning;[২৮]

কবির বহু কাহিনী কবিতার মধ্যে একটি সর্ব অর্থে অসাধারণ কাহিনী-কবিতা Th Ruined Cottage, কবিতাটি ওয়র্ডসোয়র্থ রচনা করেছিলেন ১৭৯৮ সাল না কিন্তু প্রকাশ করেন ১৮১৪ সালে The Excursion এর প্রথম অংশ হিসাবে (Bo I)। কবিতাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী কবিতা হিসাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এখা আছে এক কথক, ভবঘুরে। তার কাছ থেকেই শুনছেন মার্গারেটের কাহিনী

Margaret stood near her infant in her arms.
And noting that my eye was on the tree
She said "I fear it will be dead and gone
Ere Rabert come again". When to the House
We had returned together, she enquired
if I had any hope- but for her babe
And her little orphan boy, she said
She had no wish to live and she must of sorrow.[২৯]

এটি একটি পরিত্যক্তা স্ত্রীর গল্প, এক ভেঙে যাওয়া পরিবারের গল্প। মেয়েটি (মার্গারে বার বার ভেবেছে তার স্বামী ফিরে আসবে, সেই আশাই করে গেছে শেষ দিন পর্য তার সন্তানদের একজন তাকে ছেড়ে চলে গেছে দূরে; অন্য এক সন্তান অসুস্থ হ অবশেষে মারা গেছে। শেষে মারা গেল মার্গারেটও। তাদের কুটির এবং বাগান এক জীর্ন — সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে। স্বামী পরিত্যক্তা মার্গারেটকে কি রবীন্দ্রনাথের কালে সাধারণ মেয়ের সাথে তুলনা করা চলে, 'সাধারণ মেয়ে'র মেয়েটিও তো এক অ পরিত্যক্তা। নরেশের চিঠির সংকেত তাকে বুঝিয়েছে যে কপাল তার পুড়েছে; নরেশে মন যে 'লিজি' তে মজেছে। দুটি নামেরও কি অদ্ভুত মিল। ওয়র্ডসোয়র্থের মার্গারে আর রবীন্দ্রনাথের মালতী, দুজনেই সাধারণ, অতিসাধারণ। কিন্তু মালতি স্বপ্ন দেখে হোক না সে আকাশকুসুম স্বপ্ন; তবু সে স্বপ্ন দেখে;

মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক না—
বড় বড় নামজাদার সভা।
মনে করা যাক্ সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—

ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি—
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।[৩০]

মার্গারেট স্বপ্ন দেখে না, সে শুধু আশা করে, অপেক্ষা করে, মানসিকতায় মালতী মার্গারেটের থেকে অনেক বেশি শক্ত। তাদের দুজনের বেদনার ধরন আলাদা। মার্গারেটের মতই আর এক অভাগিনীর কাহিনী 'The Thorn' কবিতায়, এখানেও নামের মিল মার্থা। স্টিফেন কথা দিয়েও বিয়ে করল না মার্থাকে; অন্য জায়গায় বিয়ে হল তার, অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দিল মার্থা। তারপর কেমন করে মৃত্যু হল সেই শিশুর? না কি হত্যা করল আপন শিশুকে?

But what's the Thorn? and what the pond?
And what the hill of moss to her?
And what he creeping breeze that comes
The little pond to stir?
'I can not tell; but some will say
She hanged her body on the tree,
Some say she drowned it in the pond,
Which is a little step beyond;
But all and each agree,
The little baby was buried there,
Beneath that hill of mass so fair.[৩১]

এ গল্প শুধু একটি নারীর গল্প নয়, এ গল্প একটি পুরুষের গল্পও বটে— হয়তো বা পুরুষ জাতির প্রতিভূর গল্প যারা স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় করে। এ গল্প নামহীন অবয়বহীন জনতার গল্পও, 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় সেই 'জনতা' রাখালকে উন্মত্ত ঢেউ-এর মাঝে নিক্ষেপ করার রায় দিয়েছিল। এখানেও 'জনতা' হীন, কাপুরুষ, লম্পট স্টিফেনের দিকে কোনো আঙুল তোলে না, কিন্তু মার্থার শাস্তি দাবী করেন -

And some had sworn on oath that she
should be to public justice brought;
And for the little Infant's bones
With spade, they would have sought.[৩২]

সমাজের অবক্ষয়কে চাবুক মেরেছেন ওয়ার্ডসোয়র্থ এই কবিতায়। লক্ষনীয় যে এ কবিতাতেও ওয়ার্ডসোয়র্থ 'কথক' চরিত্র রেখেছেন। এই কবিতারও 'ব্যালাড' আঙ্গিক স্পষ্টতই দৃশ্যমান। ওয়ার্ডসোয়র্থের বহু কবিতাতেই কাহিনীর টুকরো ছড়িয়ে আছে, কিন্তু ওগুলিকে সঠিক অর্থে কাহিনী কবিতা বলা চলে না। যেমন 'Alice Fell' কবিতাতে একটি ছোট মেয়ের কাহিনী; 'The Revierie of poor susan' কবিতাতেও একটি ঘন জমাট বাঁধা কাহিনী আছে। সুশানের 'দিবা স্বপ্ন' যেন কাহিনীর 'ফ্ল্যাশ ব্যাক'। Mathew সিরিজের তিনটি কবিতাকেও হয়তো কাহিনী কবিতার তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। 'Lucy Gray' কবিতাতে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী বিদ্যমান। শহর থেকে মা ফিরে আসছেন। বাবার নির্দেশে লুসি লণ্ঠন নিয়ে যাবে। গ্রামের আঁধার পথে মা'কে আলো দেখাবার জন্য। কিন্তু ঝড়ের রাতে লুসি হারিয়ে গেল।

'The storm came on before the time;
She wandered up and down;
And many a hill did Lucy climb
But never reached the town.

The wretched parents all that night
Went shouting far and wide;
But there was neither sound nor sight
To serve then for a guide'[৩৩]

এমন কি 'We are Seven' কবিতাটিতেও একটি নরম করুণ গল্প আছে। 'Michael' এমন এক কাহিনী কবিতা যার ভাষায় এবং স্টাইলে আছে ক্ল্যাসিক্যাল উচ্চতার ছাপ। এ কবিতাও বর্ণিত হয়েছে এক কথকের কণ্ঠ নিসৃত হয়ে। এক উপত্যকায় বাস করে মাইকেল। মাত্র গুটিকতক ভেড়া তার; দরিদ্র সে; বৃদ্ধ তবু বলিষ্ঠ সে। জোর তার শুধু দেহে নয় মনেও। নির্জন উপত্যকায় পরিশ্রম করে মাইকেল ও তার স্ত্রী। যেন নূতন নন্দন কাননে (Garden of Eden) দুই নতুন মানুষ —নূতন আদম এবং ইভ

His day's had not been passed in singleness
His helpmate was a comely matron, old-
Though younger than himself full twenty years.
She was a woman of stirring life,
Whose heart was in her house; two wheels she had

Of antique form; this large for spinning wool;
That shall for flax; and if one wheel had rest
it was because the other was at work.
The Pair had but one inmate; their house,
And only child who had been born to them.[৩৪]

পিতা মাতা এবং সন্তান এই নিয়ে যেন নিউক্লিয়াস পরিবার। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর অসীম ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান তাদের নয়নের মনি। ছেলে বড় হয়ে ওঠে। মাইকেল এক দুঃসময়ে পড়ে, ঋণ শোধ করার জন্যে তার চাষের জমির একাংশ বিক্রি করতে হয়। মাইকেল সিদ্ধান্ত নেয় যে শহরে পাঠাবে ছেলেকে তার। তার ছেলে এক আত্মীয়ের অধীনে কাজ করবে। মাইকেল আর তার স্ত্রীর মনে নতুন আশা।

When I began, my purpose was to speak
Of remedies and of a cheerful hope
Our luke shall leave us, Isabel; the land
Shall not go from us and it shall be free;
He shall propose it, tree as is the wind
That passes over it. We have, thou know'st
Another kinsman - he will be our friend
In this distress. He is a prosperous man.
Thriving in trade - and Luke to him shall go
And with his kinsman's help and his own thrift.
He quickly will repair the loss and then
He may return to us.[৩৫]

কিন্তু Luke শুরু করল কাজে অবহেলা। সে খারাপ পথে যেতে শুরু করল; অবশেষে সে এত হীন কাজে নিজেকে সঁপে দিল যে

"..........he was driven at last
To seek a hiding place beyond the seas."[৩৬]

এই কাহিনীর মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই, কোনো ঘটনার ঘনঘটা নেই, অদ্ভুত শান্ত এবং নিরুচ্চারভাবে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শুধু বাবা, মা এবং সন্তানের কাহিনী বলা হয় নি, বলা হয়েছে আরও গভীর গভীরতার কথা; মানুষের সাথে মানুষের

সম্পর্কের কথা, মানুষের সাথে তার পারিপার্শ্বিক জগতের সংযোগের কথা। এই সম্পর্ক এবং সংযোগের উপরই নির্ভর করে সমস্ত শৃংখলা।

There, by the sheep-fold, sometimes was he seen
Sitting alone, or with his faithful Dog.
Then old, beside him lying at his feet.
The length of full seven years, from time to time
He at the building of his sheep-fold wrought
And left the work unfinished when he died
Three years, or little more, did Isabel
Survive her husband, at her death the estate
was sold and went into a stranger's hand[৩৭]

মাইকেল বা ইসাবেলের পরাজয় তাদের ব্যক্তিগত পরাজয় নয়, এ মূল্যবোধের এবং মনুষ্যত্বের পরাজয়। একই রকম পরাজয় আমরা দেখি 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় নিষ্ঠুর জনতার দেওয়া রাখালের মৃত্যুদন্ডের আদেশে, অথবা 'The Thorn' কবিতায় নারীত্বের অবমাননায়।

এক অন্যধরনের বিষণ্ণতা আছে রবীন্দ্রনাথের 'ফাঁকি' কবিতায়। তেইশ বছরের বিনুর হয়েছে চরম রোগ। দেড় বছর চিকিৎসার পরও অসুখ যখন সারল না, তখন ডাক্তার বললেন হাওয়া বদল করার কথা। বিয়ের পর এই প্রথম বিনু ছাড়ল শ্বশুরবাড়ি। জীবন তার দ্রুত ফুরিয়ে আসছে বলে আজ সব কিছুতেই যেন বিনুর আনন্দ। সে হঠাৎ বায়না ধরে যে রেল কুলির স্ত্রী রুকমিনীর মেয়ের বিয়ের গয়নার জন্য পঁচিশ টাকা দিতে হবে স্বামীকে। স্ত্রীর কাছে রাজি হলেও স্বামী ভদ্রলোক আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিয়ে দুটি টাকা রুকমিনীর হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। দুইমাস পরে বিনুর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হল। মৃত্যুর আগে -

বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদুরসম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভ'রে।
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"[৩৮]

কিন্তু স্বামীর মনে যে অনুতাপের শেষ নেই। শেষ দু'মাসের অর্ঘ্যে যে আনে ফাঁকি। রুক্মিনীকে বিনু পঁচিশ টাকা দিতে বলেছিল; আজ তাকে লক্ষ টাকা দিলেও সেই ফাঁকি

পূরণ হবে না। বিলাসপুরে নেমে শত খোঁজ করেও রুক্মিনীকে পাওয়া গেল না। সে যে বড়ই "তুচ্ছ", তাই তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেও বিরক্ত হতে লাগল সবাই

"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।"[৩৯]

অতি সাধারণ কাহিনী কিন্তু শেষ হলো কেমন যেন মন ভারাক্রান্ত করে। 'মিথ্যা' মানে মূল্যবোধের হত্যা।

'নিষ্কৃতি' কবিতায় আছে স্বার্থপর বাবার ভন্ডামীর কাহিনী। কুলীন পতি পঞ্চাননের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিলেন; পাত্রের বয়েস অনেক বেশি হওয়া সত্বেও; মেয়ে বিধবা হয়ে বাড়ি ফিরলে, তাকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিলেন; কিন্তু নিজে স্ত্রীর মৃত্যুর এগার মাসের মধ্যেই আবার ছুটলেন বিয়ে করতে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সমাজ মনস্কতার ছবি দেখতে পাই আমরা। সমাজের বিধবাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বহু বিবাহের বর্বরতা তিনি উন্মোচন করেছেন এই কবিতায়। কিন্তু অবশেষে মঞ্জুলিকা বিদ্রোহিনী হতে শেখে; তাই তার বাবা

যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।[৪০]

'ক্যামেলিয়া' অন্যধরণের কাহিনী কবিতা। এখানে গদ্যছন্দ ব্যবহারে কবির পরিপূর্ণ পরিণতির ছাপ, এখানে রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শোনাতে চাননি; পরন্তু এখানে আছে না ভাবা জায়গায় হঠাৎ করে সুন্দরের আবিস্কার:

"বাইরে থেকে মিষ্টিসুরে আওয়াজ এল,
"বাবু ডেকেছিস কেনে?"
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে "ডেকেছিস কেনে?"
আমি বললেম, "এই জন্যই",
তারপরে ফিরে এলেম কলকাতায়।"[৪১]

আমাদের মূল প্রশ্ন হল —গল্প যখন কবিতার অবয়বে, তখন গুরুত্ব কোথায়? অবয়বে? না গল্পে? অথবা গল্প বা অবয়ব কি আলাদা করে ভাগ সম্ভব? এই সব প্রশ্ন আরও গভীরতর এক প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করায় আমাদের। পাঠক হিসেবে কি পেতে চাই আমরা কবিতার কাছ থেকে? ওয়ার্ডসোয়ার্থ মনে করেন যে কবি হচ্ছেন 'A man spoaking to mon" অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে কবি পাঠকদের কিছু বলতে চান; কিন্তু কবিতা তো শুধু বক্তব্য নয়। তাই কবিতার বিষয়বস্তু বা কবিতায় বিবৃত ঘটনাকে হতে হবে, ওয়ার্ডসোয়ার্থের ভাষায় interosting by tracing in thom...tho primary laws of our naturo".[৪২]

কবিতার কাছে বা যে কোনো শিল্প মাধ্যমের কাছে পাঠক বিনোদন চাইবেনই। 'কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা'। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রধানত একজন কবি, তাঁর শিল্পমাধ্যম কবিতা; তাই তাঁর ক্ষেত্রে চরিত্র ও ঘটনার উপস্থাপনা কাব্য মাধ্যমে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই; এই সব চরিত্র ও ঘটনা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু কবি নন, তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী গল্পকার। গল্প বলার প্রয়োজন হলে তিনি কাব্য মাধ্যম ব্যবহার করবেন কেন? উত্তরে বলা যায় যে কাহিনী-কবিতার অন্যতম উপাদান গল্প হলেও গল্প ছাড়া আরও অনেক কিছুই এগুলিতে বিদ্যমান। কবিতার শরীর ও সত্তা নিয়ে এগুলি হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক, যা গদ্য গল্পে হয়ত সম্ভব হত না। এছাড়া অনেকগুলি কাহিনীই গল্প হিসাবে তেমন পরিপুষ্ট নয়, কাব্যের জল সিঞ্চনেই তাদের সতেজতা।

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থ উভয়েই মানুষে কবি, তাঁদের কাহিনী কবিতা মানুষকে তুলে ধরেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশেষত ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় মানব-অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর প্রতিভাত — নিঃসঙ্গ বেদনা, হতাশা, নিষ্পাপ বিশ্বাসে মৃত্যু — যেন অস্তিত্বের যন্ত্রণার দলিল। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে বেদনার দলিলের ভিন্নতর মাত্রা আছে। তাঁর কাছে বেদনা সুমহান (Sublimo) হয়ে প্রতিভাত হতে পারে। Bradley বলেছেন "It is the agony of a some from which something is torn away that was made one with its being...it is the passion that counts."[৪৩] পাঠকের কাছে বড় কথা হল, কবি জীবনকে মূর্ত করেছেন তাঁর কাহিনী কবিতায়— যে জীবন নাট্যে দরিদ্র দুর্ভাগারা বারবার ভীড় করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কবি বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তায় ভরপুর হলেও, কবি প্রান্তিক মানুষের কথা বলতে পারেন নি। তাদের আনন্দ বেদনার জলছবি আঁকতে পারেন নি। সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন বারবার।

নির্দেশিকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... 'কথা' (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী), চতুর্থখন্ড, পৃঃ ৫১

২। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৫৪

৩। ঐ ... 'সোনারতরী' (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী), দ্বিতীয়খন্ড, পৃঃ ৩০

৪। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৩৩

৫। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৮৩

৬। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৯৭

৭। ঐ ... ঐ, 'কথা' (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী), চতুর্থখন্ড, পৃঃ ৩১

৮। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৩৪

৯। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৩৬

১০। ঐ ... ঐ, 'কাহিনী' (রবীন্দ্ররচনাবলী) চতুর্থখন্ড, পৃঃ ৮৫

১১। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৮৫

১২। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৮৬

১৩। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৮৮

১৪। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৮৭

১৫। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৮৮

১৬। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৯২

১৭। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৯২

১৮। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৯২

১৯। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৯০

২০। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৯২

২১। William Wordsworth...Poetical works (ed. E.D. Selincourt) P. 100

২২। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০২

২৩। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০৩

২৪। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০২

২৫। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০৩

২৬। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০৪

২৭। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৩৭৮

৯৮ ... ঐ, পৃঃ ৩৭৯

২৮। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৬০১

২৯। ঐ ... (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী), অষ্টমখণ্ড পৃঃ ২৮৩

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... The Poetical works (ed. E.D. Selincourt) P. 15

৩১। William Wordsworth ... ঐ, পৃঃ ১৫৯

৩২। ঐ ... ঐ, পৃঃ ৬৫

৩৩। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০৫

৩৪। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০৭

৩৫। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১০৯

৩৬। ঐ ... ঐ, পৃঃ ১১০

৩৭। ঐ ... 'পলাতকা' (রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী), সপ্তমখণ্ড, পৃঃ ১৪

৩৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ঐ, পৃঃ ১৫

৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ঐ, পৃঃ ২৮

৪০। ঐ ... ঐ, অষ্টমখণ্ড পৃঃ ২৭৮

৪১। ঐ

৪২। William Wordsworth ... Preface to 'Lyrical Ballads' in Poetical works (ed. E.D. Selincourt) P. 374

৪৩। A. C. Bradley ... Oxford Lectures on poetry (London, 1950)

জন্মশতবর্ষে আশালতা। সেকালের স্রষ্টা একালের দ্রষ্টা

অরুন্ধতী পাল

স্রষ্টা সৃষ্টি করেন মনের আনন্দে। কিন্তু সে সৃষ্টি কালকে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎকালের বাণী বহন করে, সেই সৃষ্টিই চিরস্থায়ীত্ব লাভ করে — এ তো সর্বজনস্বীকৃত। আর এখানেই তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ। কিন্তু এই সাধারণ সত্যটির অনেকক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমী মনোভাবের দ্যোতক হয়ে ওঠে। প্রায়শই আমরা দেখি প্রতিভা সত্ত্বেও একজন লেখক প্রাপ্য মর্যাদা পেলেন না সমকালে অথবা উত্তরকালে। তাই প্রতিভা থাকলেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন এমন কথা বোধ হয় জোর দিয়ে বলা যায় না। প্রতিভার সঙ্গে প্রচারের একটা সমন্বয়ের কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। প্রচারের আলোয় আলোকিত হলে তবে প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবে, চিরকালীন হয়ে উঠবে এমনটা মনে করা খুব একটা অসমীচীন নয়। কেননা এমনই ঘটেছিল আশালতা সিংহের ক্ষেত্রে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে মধ্যেই আধুনিক মননের ছাপ আছে, যা একালেও আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংখ্যাধিক্যেও সাহিত্যের সংখ্যা কম নয়। তৎসত্ত্বেও এই মননশীল সাহিত্যিককে জন্মশতবর্ষে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে বিরত থেকেছি।

আশালতা সিংহের জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই। বিহার রাজ্যের ভাগলপুরের খঞ্জরপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই ভাগলপুরেই তাঁর শৈশব বাল্য কৈশোরের মধুর দিনগুলি অতিবাহিত হয়। তখনকার ভাগলপুর ছিল বাংলা সাহিত্যের উর্বর ভূমি। ভাগলপুর ছিল বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের বাসভূমি এবং প্রায়শই তাঁদের একত্রিত সমাবেশে সাহিত্যের আসর বসত এই ভাগলপুরেই। এখান থেকেই বিভিন্ন সাহিত্য রচয়িতার সঙ্গে আশালতার যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ভাগলপুরই তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেরণা ও প্রতিভার কেন্দ্রবিন্দু।

আশালতার পিতামহ চন্দ্রশেখর সরকার ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার ভাগলপুরের আদমপুরে চিকিৎসা-ব্যবসা করতেন এবং অবসর সময়ে আইন-ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত থাকতেন। সচ্ছল শিক্ষিত রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা হলেও তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। পড়াশুনা বা সঙ্গীতচর্চা কোনো দিক থেকেই বাধা আসেনি তাঁর বাল্য কৈশোরের জীবনে। ভাগলপুরের মোক্ষদা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন তিনি। তাঁদের বাড়িতে গান-বাজনার বিশেষত মার্গ সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। আশালতারও মার্গ সঙ্গীতে বিশেষ দখল ছিল। তাঁর গুরু ছিলেন ভাগলপুরের রায় পরিবারের সন্তান সংগীত সাধক রবীন্দ্রলাল রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই পরিবারেরই সন্তান ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর পুত্র দিলীপকুমার রায়। এই পরিবারের সঙ্গেও আশালতার সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তার। সুতরাং সাংস্কৃতিক পারিবারিক পরিবেশেই

আশালতার বড়ো হয়ে ওঠা।

তৎকালীন সমাজপ্রথা অনুযায়ী মাত্র তেরো বছর বয়সেই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ তখন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আশালতার শ্বশুরবাড়ি ছিল বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের অন্তর্গত বাতিকার গ্রামে। তাঁরাও জমিদার ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন। বিবাহের পর আনুমানিক দুই বছর আশালতা কখনও তাঁর পিতৃগৃহে, কখনও শ্বশুরালয়ে কাটিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ডাক্তারি পাস করে ভাগলপুরের আদমপুরে বাড়িভাড়া নিয়ে প্রাকটিস আরম্ভ করেন। আশালতার চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ভাগলপুরেই কাটিয়েছেন এবং তাঁর স্বামীও সেখানেই প্রাকটিস করতেন।

কিছুকাল পরে পারিবারিক কারণে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাতিকার গ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। নিকটবর্তী দুবরাজপুরে তিনি আবার প্রাকটিস শুরু করেন। এই সময় থেকেই আশালতা সাহিত্যচর্চার জগৎ থেকে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করে নিয়েই সংসারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন দেওঘরের বালানন্দ আশ্রমের অনুগামিনী ও শ্রী মোহনানন্দ মহারাজের শিষ্যা। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে আশালতা ও তাঁর স্বামী উভয়েই বালানন্দ ব্রহ্মচারীর দেওঘরের আশ্রমে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় 'আশাপুরী' এবং তাঁর স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের নাম হয় 'স্বামী চিন্ময়ানন্দ'। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের মৃত্যু হয়। এরপর আশালতা সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন তীর্থে অথবা দেওঘরের বালানন্দ আশ্রমে কাটিয়েছেন। কখনও খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও দুবরাজপুরের বাড়িতে অথবা কখনও দুর্গাপুরে পুত্রের কাছে থাকতেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে দুর্গাপুরে পুত্রের কাছেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আশালতার সাহিত্য-জীবনের বিস্তার, তাঁর ষোলো থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর হঠাৎই তিনি সাহিত্যজগৎ থেকে নির্বাসিত হলেন; অথচ সঠিক কারণ জানা গেল না। কয়েকটি সূত্র থেকে অনুমান করা যায় শ্বশুরবাড়ির রক্ষণশীলতার কারণেই তাঁকে সাহিত্য রচনার পথ থেকে সরে আসতে হয়েছিল। সাহিত্য-কৃতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে লীলা পুরস্কার প্রদান করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণপদকও লাভ করেন তিনি। সেকালের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেছেন আশালতা। সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা উপন্যাস-গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসাভাজনও ছিলেন— একথা সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশালতাকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি; কেননা এ ব্যাপারে শ্বশুরবাড়ির সম্মতি ছিল না— একথা নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছেন তিনি। একারণেই বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্রমেই ছিন্ন হয়ে যায়।

খুব অল্প পরিসর সাহিত্য-জীবনে আশালতা অনেকগুলি গল্প উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন তখনকার লেখিকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামের পরে 'দেবী' শব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী। আশালতা সিংহের প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন নাম ছিল আশালতা দেবী। পরবর্তীকালে আশালতা নামের একাধিক লেখিকার আবির্ভাব ঘটায় আশালতা দেবী বিবাহোত্তর পদবি 'সিংহ' অর্থাৎ আশালতা সিংহ নামে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি হল— 'অমিতার প্রেম' (১৯২৭), 'দুইনারী' (১৯৩৪), 'পরিবর্তন', 'মুক্তি', 'আবির্ভাব' (১৯৩৫), 'সহরের মোহ' (১৯৩৬), 'একাকী', 'নূতন অধ্যায়' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'জীবনের যাত্রাপথে' (১৯৩৭), 'কলেজের মেয়ে', 'ক্রন্দসী', 'যে ঢেউ ভাঙিয়া গেছে' ইত্যাদি। গল্প সংকলন গ্রন্থগুলি হল, 'অন্তর্যামী', 'মধুচন্দ্রিকা', 'অভিমান'। আশাপুরী নামে লেখা ধর্মসংকলন গ্রন্থগুলি হল 'শ্রী শ্রী বালানন্দের জীবনকাহিনী', 'তপোবনে জ্যোতির্ময় দেবতা', 'পরমপুরুষ শ্রী শ্রী মোহনানন্দ', 'অমর জীবনী', 'সতাং প্রসঙ্গ', 'লীলা কথা কাহিনী', 'একই বৃন্তে শ্রবণ মঙ্গলম' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমের (বরাহনগর) মুখপত্রে ধর্মমূলক প্রবন্ধাদি লিখেছেন। 'সমী ও দীপ্তি' নামে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও 'সুরের উৎস' নামে একটি নাটকও তার রচনা সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে।

কয়েকটি উপন্যাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আশালতার ঔপন্যাসিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ চিনে নিতে চেষ্টা করব। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম'-এর প্রকাশকাল নিয়ে কিছুটা সংশয় থাকলেও সংগত কারণেই উপন্যাসটির প্রকাশকাল নির্ণয় করা হয়েছে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। বিহার বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত 'আশালতা সিংহ রচনাবলী'-র গ্রন্থপরিচয় অংশে উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ বলা হয়েছে। এছাড়াও শিশিরকুমার দাশের সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' (২০০৩ প্রথম প্রকাশ) গ্রন্থেও আশালতার প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম'-এর প্রকাশকাল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিহার বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত 'আশালতা সিংহ রচনাবলী'-র অবতরণিকা অংশ লিখেছেন শ্রীমতী অরুণা হালদার। অবতরণিকার 'সিংহাবলোকন' অংশে আশালতার পুত্র শ্রী নীরেন্দ্রনাথ সিংহ জানিয়েছেন— 'অমিতার প্রেম ১৯২৭-এ ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক ছাপা হয়।'

আমরা জানি আশালতার ষোলো বছর বয়সের লেখা প্রথম গ্রন্থ 'অমিতার প্রেম'। আশালতার সাহিত্য রচনা সময়কাল ষোলো থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। আশালতার জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ হলে 'অমিতার প্রেম' উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯২৭ হওয়াই স্বাভাবিক।

'অমিতার প্রেম' উপন্যাসটির প্রধান বিষয়বস্তু নায়ক অমিয় এবং নায়িকা অমিতার প্রেম ও বিবাহ। অমিতা ব্রাহ্মণ-কন্যা। অমিয় ব্রাহ্মণ নয়। সুতরাং তৎকালীন সমাজ কাঠামো অনুযায়ী পরিবার ও সমাজের কাছে এ বিবাহে অসম্মতি থাকাই স্বাভাবিক। উপন্যাসে কিন্তু সেই পরিবেশ তৈরি হয়নি। অমিতার দাদা-বৌদির তরফে যে বাধা এসেছিল তা জাতিগত কারণে নয় তা 'স্টেটাস'-এর পার্থক্য; অর্থাৎ আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে। তাই অমিয়-অমিতার প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজের অনুশাসন বা রীতিনীতি অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। বরং প্রাধান্য পেয়েছে নারীর জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং সামাজিক-মর্যাদা ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে মানুষের বিভ্রান্ত ধারণা। পাশ্চাত্য উপন্যাস পাঠের ফলে আশালতার মনের গঠন হিন্দু রক্ষণশীলতার চাপগুলি শিথিল হয়ে এসেছিল অনেকক্ষেত্রেই। পাশ্চাত্য ধারণায় বিবাহে প্রার্থিত পাত্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠাই বড়ো করে দেখেন অভিভাবক। তার সঙ্গে জাতিভেদ প্রশ্নটি জড়িত নয়। আশালতাও এই ধারণার সঙ্গে অনেকটাই একমত— একথা আমরা বুঝতে পারি।

'দুই নারী' উপন্যাসটি সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এতটাই আধুনিক যে লেখিকার আধুনিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কিত চিন্তন-মনন সম্পর্কে আমাদের বিস্ময় জাগায়। হিন্দু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এবং বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত আইনের দিকটি সামাজিক বিধান, আইন এবং সামাজিক প্রত্যাশার বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

সুজাতা ব্রাহ্মকন্যা। কিন্তু নিজের পছন্দে হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত ধনী পরিবারের সন্তান সরোজকে ভালোবেসে বিবাহ করে। এই বিবাহে সরোজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা রেজিস্ট্রি করে বিবাহ করা; কিন্তু সুজাতা হিন্দু মতেই বিবাহ চেয়েছিল শুধু ভালোলাগার কারণে। তাদের বিবাহ হল কিন্তু বিবাহ স্থায়ী হল না; কারণ বিবাহের খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরোজের পিতার মৃত্যু হওয়ায় সে বিপুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়। সেই সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে এক ধনী আত্মীয়ের সম্পত্তিও তার হাতে এসে পড়ে। ফলে প্রচুর টাকা পেয়ে প্রেমের সাধনার পরিবর্তে শুরু হল অর্থের মাদকতায় ডুবে থাকার পালা; দেখা দিল চরিত্রের স্খলন। সুজাতাও কিছুদিন মান-অভিমানের সঙ্গে তাকে সুপথে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আহত-আত্মসম্মান নিয়ে ফিরে এল। সুজাতার পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করা হল; কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে মামলা সুজাতার পক্ষে গেল না।

আদালতের রায় সুজাতার পক্ষে না যাওয়ায় বিবাহ-বিচ্ছিন্না অবস্থায় এসে পৌঁছতেই পারে না সুজাতা, ফলত পুনর্বিবাহের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। উল্লেখ করতে হয়, সুজাতার সঙ্গে নীরেনের পরিচয় প্রাথমিকভাবে সাধারণ সৌজন্যের অতিরিক্ত কিছু ছিল না। কিন্তু সুজাতার বন্ধু সুধীরা সবসময়ই সুজাতার তুলনায় তাকে ছোটো মনে করত

এবং সে জন্যই তার মনে ছিল ঈর্ষা এবং ভয়। সুজাতার সঙ্গে নীরেনের সম্পর্ক নিয়ে সে এত বিচলিত এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল যে নীরেন ও সুধীরার প্রেমের সম্পর্ক টিকে রইল না। সুধীরার বিবাহ হল নীরেনের বন্ধু নিপেশের সঙ্গে। অন্যদিকে সুজাতার সঙ্গে নীরেনের গড়ে উঠল ভালোবাসার সম্পর্ক। নীরেন ও সুজাতার কাছে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা স্বীকৃত হলেও তা কিন্তু বিবাহের প্রসঙ্গ পর্যন্ত কখনই যায়নি। তারা দুজনেই এই সম্পর্কটিকে প্রগাঢ় এবং সপ্রেম বন্ধুত্ব হিসেবেই দেখেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা মামলা চলাকালীনই সুজাতা জানতে পারে যে, তার গর্ভে রয়েছে সরোজের সন্তান।

প্রথাসিদ্ধ সামাজিক প্রত্যাশাকেই শেষ পর্যন্ত মান্য করেছেন আশালতা। উপন্যাসের শেষে দেখি সুজাতা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেই সময় সরোজ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং আগের তুলনায় অনেক কোমল ব্যবহার করে। এমনকী সুজাতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু আশালতার স্বাতন্ত্র্য এখানেই— তিনি অধিকাংশ ভাবাবেগ প্রবণ বাংলা উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়ে দেননি। যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তা রোগশয্যার ক্ষণিক আবেগে জোড়া লাগে না— এই বাস্তবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এরপরে সুজাতা তার দিদিদের সঙ্গে হাওয়া বদল করতে দার্জিলিং যায় এবং সেখানেই সুজাতার মৃত্যু হয়।

উপন্যাসটিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে লেখিকার অভিমত স্পষ্ট হয় সরোজের এক আমেরিকান বন্ধু ফরস্টার-এর কথায়। ভারতীয় হিন্দু নারীর শাশ্বত মহিমা সম্পর্কে ফরস্টার-এর মন্তব্য, মেয়েদের স্বরূপের বারো আনাই সামাজিক বা সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে ফলিয়ে তোলা রূপ। এ প্রসঙ্গে সে বলে, ডাইভোর্সের সুবিধা এবং আর্থিক স্বাধীনতার সক্ষমতার কথা। বিবাহোত্তর জীবনে নারীর স্বাধীনতার জন্য সামাজিক-আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রতি লেখিকা আলোকপাত করেছেন। ফরস্টারের কথার মধ্য দিয়ে একটা চরম সত্যকেই তিনি তুলে ধরেছেন। সামাজিক ও সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদেই নারীকে যেভাবে অনেককিছু মেনে নিতে হয় তার সবটাই কিন্তু নারীর হৃদয় সঞ্জাত নয়। লেখিকা বোধ হয় চরম বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তা উপলব্ধি করেছেন। এই অভিজ্ঞতার পিছনে আশালতার ব্যক্তিগত জীবনের যোগ থাকাটাও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। একদিকে সামাজিক প্রত্যাশার ভার ও চাপ অন্যদিকে বিবাহিত নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস এবং বিরূপতা প্রবিষ্ট হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদও প্রয়োজনীয় হতে পারে এই প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন তিনি। এই উপন্যাসে প্রশ্নটি নারীর দিক থেকে অনেক বেশি মর্মান্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সব অবস্থায় স্বামীর প্রতি আনুগত্যকেই নারীর কর্তব্য, বলে তখনও ভারতীয় সমাজে প্রায় বিকল্পহীন আদর্শ মনে করা হত।

'দুই নারী' উপন্যাসে বিশেষভাবে আকর্ষক হল লেখিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি— যা সামাজিক অবস্থানের যাবতীয় প্রত্যাশায় আবদ্ধ নারীকে নতুনভাবে দেখেছেন। উপন্যাসের

প্রথমদিকে আমরা জেনে যাই যে, সুজাতা সুশিক্ষিতা, সম্ভ্রমের অধিকারিণী এবং আত্মমর্যাদাময়ী এক নারী। কিন্তু সে এনেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। সমকালের কোনো লেখকের (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) লেখায় এই নারী চরিত্র দেখা যায়নি। বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতা চায় এমন নারীকে সমাজের চোখে জেদী, অহংকারী এবং অপরিণামদর্শী রূপে দেখানোই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই উপন্যাসে সুজাতা আগাগোড়া সকলের স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে থেকেছে। নীরেন তাকে ভালোবেসেছে। সেই ভালোবাসার মর্যাদা দিতে সে অন্য কোনো নারীকে গ্রহণ করেনি। সুজাতার দিদি-জামাইবাবু যদিও বিবাহ বিচ্ছেদ হতে চলেছে জেনে প্রথমদিকে দুঃখিত হয়েছে কিন্তু সুজাতাকে দোষারোপ করেনি। ক্রমে সরোজের চরিত্র জেনে সুজাতাকেই সমর্থন করেছেন। সমাজের এই মানস পরিবর্তনের যে চিত্র আশালতা দেখিয়েছেন, তা প্রায় দুঃসাহসিক এবং উপন্যাসটির রচনাকালের পক্ষে অত্যন্ত প্রগতিশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই 'দুই নারী' বাংলা উপন্যাসে নারী-জীবনের চিত্রনে অভিনব এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'দুই নারী' উপন্যাসকে 'ইন্টিলেকচুয়াল নভেল' বলে চিহ্নিত করেছেন।

'আবির্ভাব' উপন্যাস বিবাহ-পূর্ব জীবনে শিক্ষিতা সংযমী মহিলার পাত্র-নির্বাচনের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে। সুজাতা বড়োলোকের শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা। নিজের শিক্ষা রুচি আদর্শ সম্পর্কে সচেতন এবং তা নিয়ে অহংকারবোধও আছে। আবার অন্যদিকে সুজাতা নীরব প্রকৃতির, সংস্কৃতি মনস্ক, যুক্তিবাদী চেতনার অধিকারী। উপন্যাসে সুজাতার মা ও দিদির কথোপকথনে সুজাতার বিবাহ-সম্পর্কিত মন্তব্য থেকে বিবাহ সম্পর্কে তাদের স্বাধীন চেতনার দিকটি উন্মোচিত হয়। পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারেও সুজাতার স্বাধীন মতামতকে সুজাতার মা স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই সুজাতার দিদি লীলাকে তার মা বলেছে, "বোধ হয় ও নিজেকে চিনতেই এখন ব্যস্ত রয়েছে, সে অপরের প্রতি তাকাবার সময় পায় না। কালে এ ভাবটা কেটে যাবে।" আবার কখনও বলেন, "না না তাড়াতাড়ি করিসনে লীলা। মানুষের মনকে বুঝতে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সময় লাগে।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাত্র-নির্বাচনে নায়িকার স্বাধীন মতামতের উপর তার মায়েরও সমর্থন রয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মানসিক-প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত রয়েছে উপন্যাসটিতে।

'সহরের মোহ' উপন্যাসে সাধারণ একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে নারী মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। একটি দরিদ্র পরিবারের অর্থ উপার্জনের আশায় শহরে বসবাসের আসক্তি এবং তাকে কেন্দ্র করেই চরম আর্থিক সংকট; শেষ পর্যন্ত গ্রামে প্রত্যাবর্তন— এই হল উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসের নায়িকা শান্তা আর্থিক-অনটনের চাপে পড়ে চেষ্টা করেছে সৎপথে থেকে অর্থ উপার্জন করে সংসারের অর্থাভাবে সামাল দিতে। এই বিষয়টিকে পুরুষসমাজ কীভাবে গ্রহণ করেছে সেই প্রশ্নটিই উঠে

এসেছে উপন্যাসে। এখানে সামাজিক তথা পারিবারিক প্রত্যাশাই গুরুত্ব পেয়েছে। স্ত্রী উপার্জনের পথ বেছে নিলে পুরুষের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এবং সে ভাবে সংসারে অভাব-অনটন আসুক না কেন স্ত্রী স্বামীর উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং পরিবারের মধ্যে থেকে যাবে। এই প্রত্যাশাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপন্যাসের শেষে। নারী সংসারের মধ্যে থেকে সংসারধর্ম পালন করবে এটাই ভারতীয় সমাজের বহুকালের প্রচলিত রীতি। সংসারের বাইরে কর্মক্ষেত্রে নারীকে দেখতে সমাজ অভ্যস্ত নয়। বিশেষত তার উপার্জনের টাকায় সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে— এটা পুরুষের আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে একটা বড়ো আঘাত বলেই মনে করা হত। আশালতা তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, কিন্তু আসল প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। সংসারের প্রয়োজনে নারী উপার্জন করতে পারবে কি না? কেবল সংসারের প্রয়োজনেই কেন? নারীর নিজস্ব মেধা এবং কর্মদক্ষতার সাহায্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবার চেষ্টা করবে না কেন? প্রশ্নটিকে এতটা গভীরে নিয়ে গিয়ে আশালতা দেখাননি। কিন্তু নারীর উপার্জন করবার ইচ্ছাটিকে আশালতা পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন।

'নূতন অধ্যায়' উপন্যাসে গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের কন্যা কমলের বিবাহোত্তর জীবনে নারী মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কমল ভালোবেসেছিল শিবেশ্বরকে। শিবেশ্বরের মায়ের আপত্তিতে বিবাহ সম্ভব হয়নি। কমলের বিবাহ হয় বিজয়ের সঙ্গে। এখন সে দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ গৃহবধূ। কিন্তু মন-প্রাণ স্বামীকে সমর্পণ করতে পারেনি। উপন্যাসটিতে নারীমনের মানসিক প্রবৃত্তির দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। এই সমাজে বিবাহ প্রসঙ্গে নারীর স্বাধীন ইচ্ছার দিকটি স্বভাবত অবহেলিত থাকে— লেখিকা এই দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাই কমল বলে, "শুধু আমি বলে নয়, আমাদের সমাজের সব মেয়েরই যখন বিয়ের সময় হয়, একটা জীবনের সীমান্ত পথে দাঁড়িয়ে তারা নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে থাকে, তখন কেউ কি তাদের প্রশ্ন করে দেখি না যে, কেমনটি হলে তারা ঠিক সুখী হবে।"

'যে ঢেউ ভাঙিয়া গেছে' উপন্যাসটিতে কিছুটা অসংগতি থাকলেও মূল প্রশ্নটি নিহিত আছে হিন্দু সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থার মধ্যে। হিন্দু বিবাহ-প্রথা অনুযায়ী প্রিয়তোষ ও নিরুপমার বিবাহ হয়নি; কিন্তু তারা স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পূর্ণ স্বীকৃতি নিয়েই বসবাস করত। তাদের বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে না হলেও, যেহেতু সেই নারী প্রিয়তোষকেই স্বামীত্বে বরণ করেছে, তাই প্রিয়তোষের মৃত্যুর পর তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে হিন্দু বিধবার জীবনাচরণ সবই নিষ্ঠা-সহকারে পালন করেছে। সেই তার অন্তরের দেবতা। সমাজের কটাক্ষে নিরুপমা ভাবে, "নারায়ণ সাক্ষী করিয়া দুইটা শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ করি নাই বলিয়া আমাদের মিলন সমাজানুমোদিত নহে ... আমাদের বিবাহ তাই অসিদ্ধ। কিন্তু পরস্পরের হাতে হাত রাখিয়া ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া যে বরমাল্য তাহার গলায়

পরাইয়া দিয়াছিলাম তাহার কি এতটুকুও মূল্য নাই।"

লক্ষণীয়, লেখিকা উপন্যাসে বিবাহ ব্যাপারটাকে সামাজিক প্রথা অথবা
অনুমোদনের দিক থেকে নয়, নর-নারীর অন্তরের মিলন অর্থাৎ মানসিক দিকটি
অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রথা বা নিয়ম মেনে বিবাহ
রুগ্ন স্বামীর সেবায় এবং স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু-বিধবার আচার-আচরণ সবটাই
আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছে। একদিকে সমাজ অনুমোদিত বিবাহ না করে
বসবাস, অন্যদিকে হিন্দু আচার-আচরণের প্রতি নিষ্ঠা, এই দুইয়ের একত্র সমা
এখানেই লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব, লেখিকার পারদর্শিতা। নিরুপমা প্রিয়
শাস্ত্রমতে বিবাহিত স্ত্রী নয়, তবুও যাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছে, স্বামীতে বরণ
তার মৃত্যুতে সে নিজেকে বিধবা বলেই মনে করে। এবং বিধবার আচার-আচরণ
করে সে তৃপ্তি পায়। এখানেও আশালতা অন্যান্য উপন্যাসের মতো নারী-মনের
অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নারীর মানস-প্রবণতার উপর লেখিকার সমর্থন লক্ষ
যায় উপন্যাসে।

আশালতার গল্প-উপন্যাসগুলির পর্যালোচনায় দেখা যাবে, তাঁর উপন্যাসে
গৃহকর্মকে নারী-জীবনের একমাত্র আদর্শ বা পাথেয় না ভেবে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে দে
প্রয়াস রয়েছে। মনে হয় আশালতা খুব অল্প বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্য প
সুযোগ পেয়েছিলেন, ফলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্পর্কে তাঁর চোখ খুলে যায়। তাই তাঁর
নায়িকারা প্রায় প্রত্যেকেই শিক্ষিতা; পোশাক-পরিচ্ছদ, রুচিবোধ, আচার-ব্যবহা
এককথায় জীবনযাত্রায় অনেকটাই আধুনিক মনস্ক এবং প্রগতিশীল। নায়িকারা
শেলি, কীট্‌স, অল্ডাস হাক্সলি, বায়রণ থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে এবং তাদের স
আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। আশালতার নায়িকারা সামাজিক প্রথা, অনুশাসন, সা
রীতি নীতি অপেক্ষা নিজেদের যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছে অনেকক্ষেত্রে
তাদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বই উপন্যাসের অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে। তাদের স
মূলত প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে জীবনের প্রতিষ্ঠায়। তাঁর নায়িকারা অনে
স্বাধীনচেতা, তাদের মতামতের মূল্যকে (দুই-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত) অনেকক্ষেত্রেই স
বা পরিবারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়নি। নায়িকারা মননে-চিন্তনে উন্নত বো
দ্বারা চালিত।

আশালতার উপন্যাসগুলিতে সামাজিক সংস্কার বা সমাজবিধানের প্রশ্নটি প্র
অনুচ্চারিত থেকে গেছে— যা সেকালের উপন্যাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবে
হত। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা সমাজের বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধের বিপক্ষে নিজে
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী। পাত্র-পাত্রীদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে পরিব
সমাজকে সমর্থন করবার অথবা সমাজ-পরিবর্তনের একটা প্রচেষ্টা বারে বারে লক্ষ

হয়। এমনকী সমাজ মুরুব্বিদের কিংবা বয়স্ক নর-নারীর সামাজিক বিধিবিধানের আদেশ দান বা পরামর্শ দেওয়াকেও লেখিকা খুব একটা প্রাধান্য দেননি। দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকলেও যুক্তি-তর্কের প্রেক্ষিতে সামাজিক-বিধিবিধানের ক্ষেত্রটি প্রায়ই অচল হয়ে পড়েছে। উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি বা নায়ক পরিবর্তিত সমাজ এবং নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথেষ্ট মানবিক। তাদের স্বাধীন ও আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বামীরা তাদের স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দিতেও আগ্রহী। এককথায়, রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজ-পরিবর্তনের দ্রুত সূচনা হতে চলেছে— এমন একটা পূর্বাভাস তাঁর উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বলেই আমরা মনে করতে পারি।

একবিংশ শতকে নারীর স্বনির্ভরতা এসেছে, স্বাধীনতা এসেছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কর্মস্থলে, তার প্রবেশাধিকার; সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তার মতামত বা যুক্তি-বুদ্ধি-দক্ষতা অস্বীকৃত নয়। কিন্তু আজকের নারীও জানেন, সংসারের বা সমাজ-পরিবারের দাবি পূরণ করতে না পারলে সাংসারিক শান্তি আসবে না। আজকের সমাজও, পারিবারিক সুখ-শান্তির দায়ভার অনেকটাই চাপিয়ে দেয় নারীর উপর। তাই সত্তর-আশি বছর আগে আশালতার এ-ধরণের ভাবনার প্রতিফলন প্রগতিশীল তো বটেই; বিস্ময়করও।

সুখের সন্ধানে 'দুখবাদী বৈরাগী'

দেবাশিস বিশ্বাস

মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তাঁর মরুযাত্রা শুরু হয়। এই মরুযাত্রার পথে তাঁর বেদনাহত অন্তর মরুদ্যানের সন্ধান করলেও বাস্তবে তিনি পেয়েছেন দিগন্তবিস্তৃত তপ্তবালুকার অন্তহীন জ্বালা। এই বেদনাবিধুর অনুভূতি থেকেই 'দুখবাদী বৈরাগী' কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তথাকথিত রোমান্টিকতা, করুণাময় ঈশ্বর ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন; আর নীলকণ্ঠ বিশ্বেশ্বর শিবকে এই অন্তহীন জ্বালার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছেন।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩০ সাল, ইংরেজি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি-ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম কবি যাঁর সূচনাতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য তথা সবুজ-শ্যামল স্নিগ্ধতার পরিবর্তে গোবি-সাহারার ভীষণ মরুমূর্তির ছবি ছন্দের আকারে ধরা পড়েছিল। তিনি শুরুই করেছিলেন শিব তথা রুদ্রের বহ্নি-স্তুতি দিয়ে—

> "তপন তপ্ত, চির অতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি।
> শিবললাটিকা, প্রলয়াগ্নিকা, তুমি দীপ শিখা তন্বী।
> রক্তবসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
> কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি।"
>
> —(বহ্নিস্তুতি, মরীচিকা)

কবি মরুচারনার সাথে সাথে মনের গোপনে চিরকালই সুখের সন্ধান করে গেছেন। তাই তাঁর কাব্যে তথাকথিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সুগভীর-মহান ইতিবাচক দৃষ্টি, তাঁর অ্যান্টি-রোমান্টিকতার মধ্যে থাকে নব্য-রোমান্টিকবাদ, তাঁর সমস্ত দুঃখের আড়ালে থাকে জীবনকে ভালোবাসার আর্তি।

আসলে কবি তো প্রথম কবি হতে চাননি, বাস্তব জীবনের আভিঘাতই তাঁকে কাব্য রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। কবির মুখ থেকেই শোনা যাক সে কথা— "আমার বাল্যকাল থেকে কখনও ভাবিনি যে আমি কবি হবো। কবি হতে চাইওনি। ...স্বভাবের মধ্যে এক দুঃস্বভাব জেগেছিল হঠাৎ। সেটা হচ্ছে কবিদের পিছনে লাগা। তাদের ঠাট্টা করা। কারণও স্পষ্ট। আমি ইঞ্জিনিয়র। বুঝি বস্তু। ... কাজেই এটাতো সোজা কথা— কবিদের ভাবালুতা আমার কাছে হাস্যকর মনে হবেই। অলস মস্তিষ্কে তাদের যত আকাশ কুসুম কল্পনা তারই বিরুদ্ধে বিদ্রুপের বাণ ছুঁড়বার ইচ্ছে জাগলো আমার মনে। কিন্তু তার আঙ্গিক কি রকম হবে? ভেবে দেখলাম পদ্যবান নিক্ষেপই বাঞ্ছনীয়। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আঘাত হানতে হবে। তাই লেগে পড়লাম। যাকে বলে উঠে পড়ে লাগা।"[১] কবিকে

পেশাগত কাজের তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হয়েছে, আর সেখানে তিনি দেখেছেন— "নদীমাতৃক দেশের নদী আজ মজে গেছে, খানা ডোবা সেখানে আবর্জনায় ভর্তি। শস্যক্ষেত্র খাঁ খাঁ করছে। চাষীরা সর্বহারা, নিঃস্ব, রোগক্লিষ্ট, শীর্ণকায়। ... আর নদীমাতৃক বাংলার বধূদের দেখলাম এক কলসী জলের জন্য পরস্পর বাক্য গরল বর্ষণ করতে। ... সাইকেলে চেপে যেতে যেতে এইসবই চোখে পড়েছে আমার। চোখে পড়েনি শুধু বাংলার সেই কাব্যরূপ। তাকে পাওয়ার জন্য মন আমার আকুলি বিকুলি করেছে। অনেক খুঁজেছি। পাইনি তবুও। প্রথমে নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছি। পরে ক্ষোভ হয়েছে, অপরাধী করেছি কবিদের। মনে হয়েছে তাঁরা এমন কি সত্যরূপ প্রকাশ করেন যা আমাদের নজরে পড়ে না। আর যে সত্যরূপ আমাদের নজরে পড়ে না, আমাদের কাজে লাগে না, কি প্রয়োজন তাকে নিয়ে? ... চলার পথে যা চোখে পড়ত, যা দেখতাম, যা মনে লাগতো সেই ধুলোবালি মাখা জগৎ-ই হয়ে উঠল আমার অস্ত্র। তাই তুলে তুলে ছুঁড়তে লাগলাম কবিদের বিরুদ্ধে। উঃ, আমার কত আশা, বসিয়ে দেব সব। ওঁদের উৎখাত করে দেব। কিন্তু হায়রে—। ... ওঁদের উৎখাত করা গেল না। উপরন্তু হলো কি জানেন? ভারতবর্ষ যেমন সমস্ত বিদেশকে, বিদেশীর দিগ্বিজয়কে, সব শক, হূন, পাঠান, মোগলকে একদেহে লীন করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি করেই বাংলার কবিদল অর্থাৎ আমার শত্রুদল- চেঁচিয়ে উঠলেন, - কবি - কবি - কবি -।"[২] কবির এই দীর্ঘ স্বীকারোক্তির মধ্যে একদিকে যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসী, সৌন্দর্য পিয়াসী কবিদের প্রতি তাঁর বিদ্রুপ-প্রবণতার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে জীবনপ্রেমিক, বাস্তববাদী যতীন্দ্রনাথের অন্তরের সংগোপনে প্রেম ও সৌন্দর্যের নিরন্তর অন্বেষণের রূপটিও প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থের 'ঘুমের ঘোরে'- কবিতাটিতে বিশ্বের সমস্ত কিছু অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়তার কথা তুলে ধরলেও তারই পাশাপাশি কবি সকল সময়েই সব দুঃখের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন—

> "তুমি রহ পাছে পাছে,
> হে চির প্রহরী, তোমারেই প্রাণবন্ধু বলিয়া বাঁচে।
> বার বার জাগরণে।
> যন্ত্রণা যত বাড়ে, অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।"

চেতনা ও অ চেতনার 'সংশয়'-এ দোলায়িত কবি প্রেমের কাছে প্রার্থনা করেছেন- 'বউ কথা কও', আর 'অকাজের জীবন'-এর শেষে ঈশ্বর- জিজ্ঞাসার সমাধান ও তাঁর অস্তিত্বকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এইভাবে—

> "তবু এও জানি, এরি মাঝে আমি

"খুঁজিয়া পেয়েছি তারে;
না জেনে না চিনে পেয়েছি যখন
আশঙ্কা করি না রে।
নব নব দেহে, নব নব গেহে,
নব নব তাঁরে খুঁজি,
হারায়ে হারায়ে আপনার ধন
বারে বারে নব বুঝি।" — (অকাজের জীবন, মরীচিকা)

মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটে চলা কবির হৃদয়ের দহন-জ্বালা থেকেই তৈরি হয় 'মরুশিখা' (প্রকাশকাল: বাংলা ১৩৩৪ সাল, ইংরেজি ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ)। মানুষ ও তার জ্বালা-যন্ত্রণাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি-ই এ কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য। দুঃখের রাজা শিরোনামধারী কবি এ কাব্যের 'দুখবাদী' কবিতায় নিজেকে 'দুখবাদী বৈরাগী' বলে পরিচয় দিয়েছেন—

"ফল শেষে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সুখবাদী, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী।

কবির এই 'দুখবাদ' তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন। মানুষের দুঃখ-বেদনা, উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জীবনকে কেন্দ্র করেই এই দুঃখবাদ গড়ে উঠেছে। তাঁর এই দুঃখবাদ জড়বাদী দর্শন ও মানবপ্রীতি থেকেই উদ্ভূত; সেই অর্থে তিনি 'দুখবাদী' হলেও 'বৈরাগী' কখনোই নন। কারণ সমাজ, সংসারের প্রতি অনাসক্তি তাঁর কোন কাব্যেই ধরা পড়েনি, বরং সমাজের-সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণেই এই কবিতাতেই স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বর ও অন্ধজড়শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সর্বহারা মানুষের জয়গান তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।"

'মরু আর তার মায়া'-র অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ কবির তৃতীয় রচনা 'মরুমায়া' (প্রকাশকাল: বাংলা ১৩৩৭ সাল, ইংরেজি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ)। এই কাব্যটির মূল বক্তব্যও প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগুলির অনুসারী। এখানে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটলেও কোথাও যেন একটা 'ছুটি'-র সুর বেজে ওঠে; কোথাও যেন বিদ্রোহের জ্বালাও মন্দীভূত হতে দেখা যায়; হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেগ 'শাওনরাতি'-কে না পোহানোর আর্তির মধ্যে দিয়ে কোথাও যেন ধরা পড়ে।

দীর্ঘ বাইশ বছর মরুচারণার পর 'কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল সুন্দরের আরাধনা'। যে মরুবন্দনার সুরের রেশ থেকে গেলেও এক নতুন আঙ্গিক, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তা

ধরা পড়েছিল। এই নতুন সুর-মূর্চ্ছনা ও কাব্যিক ভাবনা তাঁর পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থে— 'সায়ম', 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'-তে।

আসন্ন গোধূলির সূচনায় কবিমানসের এক পরিবর্তন, এক [illegible] 'সায়ম' (প্রকাশকাল: বাংলা ১৩৪৭ সাল, ইংরেজি ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ) কাব্যগ্রন্থে [illegible] নরম আলোর সুরে ধ্বনিত হয়েছে। এ কাব্যের প্রথম কবিতা [illegible] শোনা যায় সহজ-স্বাভাবিক সুন্দরের আহ্বানের প্রতিধ্বনি, [illegible] একতারা বাজিয়ে গান ধরেন—

"শাওন এল ঐ,
ঐ ঐ শাওন এল ঐ।
[illegible] বৈরাগী রে তোর
একতারাটি কই?
ঐ ঐ শাওন এল ঐ।"

কবির যৌবনের মরুপথে আজ দিনান্তের [illegible]। এ কাব্যের [illegible] কবিতাটির মধ্যে দিয়ে মরুবাসী, চিরপ্রবাসী [illegible] মরীচিকা জল ছিঁড়ে [illegible] ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। [illegible] কবি এখানে মরুপথ থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছেন—

"বিদায় রে আজি [illegible]—
শ্যামল দেশের বাদল বঁধু
এসেছে আমার দুয়ারে।"

এ কাব্যের 'বেদিনী' কবিতাটি কবিমানসের রোমান্টিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্য [illegible] এক উজ্জ্বল দলিল; বাস্তব জীবনের অনুরাগের [illegible] হয়েছে—

"রোদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে বাঁধিয়াছে জট,
অতি সোহাগের আগুন জ্বেলেছে
শ্যামল অঙ্গে [illegible]।"

এই প্রেম ও সৌন্দর্যের পথ ধরেই কবি রচনা করেছেন— [illegible] ইত্যাদি কবিতা। 'সুন্দর' কবিতায় সুন্দরের আরাধনায় কবি বলেছেন—

"তব প্রতিমূর্ত তোমারে দেখিয়া

কাটিল আমার তিমির রাতি,
অন্তর-সেঁচা সুন্দর ওগো,
তুমি আজ মোর একক সাথী।"

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর করুণাকে নিয়ে যে কবি এককালে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, আজ তাঁরই কণ্ঠে শোনা গেল পরানবন্ধু পেয়েও না থাকার জন্য আক্ষেপের সুর। যৌবন অতিক্রান্ত বঞ্চিত কবির এক নতুন ঈশ্বর-প্রতীতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'নাস্তিক' কবিতায়—

"তুমি ক্ষিতি, তুমি জল বায়ু অগ্নি ব্যোম্,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য সোম।"

প্রেম, সৌন্দর্য, প্রকৃতি চেতনা ও ঈশ্বর জিজ্ঞাসার এই নতুন আঙ্গিক তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিযামা' (প্রকাশকাল: বাংলা ১৩৫৫ সাল, ইংরেজি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ)-তেও ধরা পড়েছে। এ কাব্যে কবি আক্ষেপ করেছেন তাঁর বিগত যৌবন ও অতৃপ্ত সৌন্দর্য-পিপাসাকে নিয়ে। 'হেমন্ত সন্ধ্যায়' কবিতায় কবি-মানস সেই সুন্দরের-ই অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—

"বসন্ত উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন সুন্দরের করি সন্ধান।"

'মরীচিকা'-র 'শীত' নিঃস্ব, রিক্ত, শূণ্যতার প্রতীক, কিন্তু 'ত্রিযামা'-র 'হিমভূমি'-র মধ্যে ধরা পড়েছে শীতের মধ্যে বসন্তের প্রার্থনা।

হারানো যৌবন ও প্রেমকে ফিরে পাবার আশায় অশ্রু-সিক্ত কবি-হৃদয় বাঁশির শব্দে আনমনা হয়ে ওঠে। নিজের সন্তানের মধ্যে যৌবনের আবির্ভাব লক্ষ্য করে কবি যৌবনের আগমনীর গান গেয়ে ওঠেন। যে প্রেম ও যৌবন কবির কাঙ্ক্ষিত 'প্রত্যাবর্তন' কবিতায় সেই যৌবন ও প্রেমের প্রত্যাবর্তনের কথা-ই উল্লেখিত হয়েছে—

"কতদিন পরে মোর ভাঙা ঘরে
ফিরে এলি কিরে যৌবন?
ফাটা ইঁটে কাঠে তাই ফুটে ওঠে
বেল-চামেলির ফুলবন।"

'শপথ ভঙ্গ' করেও কবি তাঁর 'মনোরমা'-কে পাননি। একদা তাকে উপেক্ষা করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু তাও তাকে নিজের করে পাননি। যেমন পাননি 'বকুলতলীর ঘাটে' ফেলে আসা রূপনদীকে। এত আক্ষেপের মধ্যেও কবি 'ভোরের স্বপ্ন'-কে সত্যি ভেবে জীবন প্রিয়াকে নতুন করে ঘর বাঁধার আহ্বান জানিয়েছেন; আবারও খুঁজে ফিরেছেন সুন্দরকে।

কবি মানসের মৌলিক পরিবর্তন এ কাব্যের 'সমাধান' কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

"যৌবনে আমি করিনু ঘোষনা, —
'প্রেম বলে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ?"

কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'-র ঘুমের ঘোরে' কবিতায় উল্লিখিত ঘোষনাটি করেছিলেন। এই সমগ্র বিশ্ব তখন তাঁর কাছে কেবলই জড় পদার্থের সমাবেশ ছিল। কিন্তু প্রাণের প্রবাহ ও প্রাণশক্তি যে দেহকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে ওঠে তা তো মৌলিক ও মিশ্র পদার্থের সমাবেশে-ই গঠিত। সেখানেও দেখা যায় অণু-পরমাণুর বিভাজিত রূপ, ইলেক্ট্রনের প্রবাহ। তাই কেবল কার্য-কারণ সম্বন্ধযুক্ত জড়শক্তির উপর নির্ভর করে মানসিক ক্রিয়ার বা প্রাণশক্তি ব্যাখ্যা সত্য নয়। জড় পদার্থের মধ্যে দিয়েই প্রাণের প্রকাশ ঘটে। জড় ও চেতনা সমধর্মী ও নিত্য সম্বন্ধযুক্ত— এই সত্যই তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে উপলব্ধি করেছেন। এই নবচেতনা ও আত্মসমালোচনার ভাবধারা-ই তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নিশান্তিকা'-য় প্রবাহিত হয়েছে।

'নিশান্তিকা'-য় (প্রকাশকাল: বাংলা ১৩৬৪ সাল, ইংরেজি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) যতীন্দ্রনাথের কাব্যবৃত্তের সমাপ্তি ঘটেছে। এ কাব্যের একদিকে কাঙ্ক্ষিত সুখ ও সৌন্দর্যের অন্বেষণ, অন্যদিকে অতৃপ্তির বেদনার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের প্রথম কবিতা 'গন্ধধারা'-য় কবি স্বীকার করেছেন—

"ফুলের গন্ধ শূলের মতন
বিঁধিত যে মোর দিল্ —
আজ বুঝিয়াছি সেটা শুধু, সুখে
থাকিতে ভূতে কিল।"

এই আত্মসমালোচনার মধ্যেই কবি জানতে ভুল করেননি যে এখন কবির 'ফুলে গন্ধ ভালোই লাগে। আবার এই সুন্দরের মাঝে 'সুখভোগ' করতে গিয়ে কবি দোটানায় পড়েছেন—

"যে প্রেম, বন্ধু, সুন্দর লাগি
চিত্ত গহনে হয়েছে বিবাগী

মাঝে মাঝে ভাবি ছেড়ে-ছুড়ে সবই
ফিরি তারি সন্ধানে।''

কিন্তু এ ভাবনা তাঁর বাস্তবায়িত হয় না। তাঁর ভাগ্যে সুখ থাকলেও অসহায়, নিরন্ন মানুষের মুখ সে সুখভোগের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে।

যে সুখ ও সুন্দরের সন্ধানে কবি মরীচিকার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন জীবন-রজনী শেষে সেই সুন্দর-দর্শনের অভিলাষ-ই 'দেখা দাও' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

''দেখা দাও দেখা দাও।
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।
তুমি রয়ে গেলে দেখার অতীত।
সবকিছু তাই দেখি কুৎসিত,
দেখার এ দোষ যাবে না যদি না
দেখা দাও।''

আত্মসমালোচনার পাশাপাশি কবি এ কাব্যে জীবনের উষর মরুভূমি থেকে অনেক দূরে সরে এসেও এখনো ব্যথার ডালি নিয়ে মৃত্যুর ছায়ালোকে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন। তাঁর হৃদয় যন্ত্রণার অনির্বান শিখা কোন কূপ বা সরোবরের জলে নির্বাপিত হবার নয়। 'কবি নহি' কবিতাটিতে সেই মর্মবেদনার কথাই ফুটে উঠেছে—

''কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত—
আমি, সে ব্যথায় চির-ব্যথিত।''

আসলে কবির জীবনের সবকিছুই যে সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমীরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই পল্লী-প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে তিনি মরুভূমির ছবি এঁকেছেন, যৌবনে 'প্রেম বলে কিছু নাই'- ঘোষণা করে জীবন সায়াহ্নে তার-ই সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন, মরীচিকার পিছনে ছুটে চলা বৃথা জেনেও সুখের সন্ধান করেছেন। যৌবনে মরুযাত্রী কবি 'ঘুমিওপ্যাথি' প্রয়োগ করেও যে সুখের সাথে তিনি ঘর বাঁধতে পারেন নি, বিগত যৌবনে এসেও বয়ে আনা দুঃখ আর নিরন্ন মানুষের হাহাকার কবিকে সুখের আলিঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তিনি চোখ বা মনকে অন্ধ সাজিয়ে রাখতে পারেন নি বলেই বাস্তব জীবনের অভিঘাত তাঁর সুখের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। আবার খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে দুঃখের কষ্ট আছে, সুখের তৃপ্তি আছে; কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ভেদাভেদ অর্থহীন; সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু— এসবই আনন্দের উপাদান। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, বরুণের পুত্র ভৃগু উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রহ্ম-ই আনন্দ। আনন্দ থেকেই সকল জীব জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করে আনন্দের জন্যই জীবনধারণ করে। (মৃত্যুর পর) আনন্দেই প্রতিগমন

করে এবং (আনন্দে) প্রবেশ করে।[৩] আমাদের ইন্দ্রিয় ও হৃদয়বৃত্তির অনুভূতি সুখ বা দুঃখ ছাড়াও আরেকটি অনুভূতির আস্বাদ দিতে পারে, উপনিষদের ঋষিরা তাকেই আনন্দ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। দর্শক হিসাবে নাটকের চরিত্রদের সুখে বা দুঃখে আমরা সুখ বা দুঃখ পাই, কিন্তু সমগ্র নাটককে অবলম্বন করে যে রস বিকশিত হয়, তা আস্বাদন করে আমরা আনন্দ পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মপরিচয়-৩' প্রবন্ধে বলেছেন— ''আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এই জন্যই যে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে না— ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে— জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। ... মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই কখন জানিয়া, কখন না জানিয়া, কখন বক্রপথে, কখন সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে।'' যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বাস্তব সমাজ, সংসার ও জীবনের যথার্থ দর্শক। বাস্তব জগতের ধুলো-মাটি-মাখা দুঃখ-কষ্টময় জীবন-ই তাঁর কাব্যে বারবার উঠে এসেছে, তাকে এড়িয়ে তিনি কখনো-ই সুখের সন্ধান করেন নি। তাঁর কল্পনাও বাস্তবের মাটিতে পা ফেলে কাব্যজগতে ঘুরে বেড়িয়েছে। সৃষ্টিতেই স্রষ্টার আনন্দ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাব্যের রোমান্টিকতার বৈষম্য দেখে যে কাব্যবীজ তিনি বপন করেছিলেন তাই-ই তাঁর ঘরে সোনার ফসল এনে দিয়েছে। তাই সুখ ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর কাব্যকে বিদায় জানালেও জীবন-আনন্দের রস থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না।

১। 'একটি স্মরণীয় দুপুর'— অজিত দাশ (হোমশিখা, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন)
২। 'একটি স্মরণীয় দুপুর'— অজিত দাশ (হোমশিখা, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন)
৩। আনন্দো ব্রহ্মতি ব্যজানাৎ।।
আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।।
আনন্দং প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি।। তৈত্তিরীয়।। ৩।। ৬

ভীষ্ম: চারজন কবির চোখে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা কবিতায় পুরাণপ্রসঙ্গ বা পৌরাণিক চরিত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হলেও দেখা যা[illegible] মহাভারতের ভীষ্ম প্রায় উপেক্ষিত থাকেন। বাংলা নাটকে তাঁর উপস্থিতি থাক[illegible] কবিতায় তিনি যেন উপেক্ষিত। ভীষ্মের নাটকীয় জীবন কি কবির অপেক্ষা নাট্যকার[illegible] আকর্ষণ করে? তাঁর ত্যাগ, ভীষণ পণ তাঁকে শ্রদ্ধেয় করলেও, [illegible] কাছে আ[illegible] তাঁর জন্ম ও কর্ম সম্পর্কে 'পৌরাণিক অভিধান' যা বলেছে, তার খানিক অংশ উ[illegible] করছি।

রাজা শান্তনুর ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে এঁর জন্ম হয়।
ছেলেবেলা এঁর নাম গাঙ্গেয় ও নদীজ। এঁর অন্য নাম দেবব্রত।
বশিষ্ঠের শাপে গঙ্গাগর্ভে জাত অষ্টবসুর ইনি অন্যতম।
ইনি রাজা শান্তনুর একমাত্র উত্তরাধিকারী। সত্যবতীর সহিত
শান্তনুর বিবাহে সিংহাসন ত্যাগ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ-
এই দুই ভীষণ প্রতিজ্ঞাহেতু ইনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন
এবং স্বেচ্ছায় মরণ বর প্রাপ্ত হন।

ভীষ্মের জীবনে সংকট শুরু হয় যখন অম্বা তাকে বিয়ে করতে চায়। তিনি প্রতিজ্ঞার[illegible] জানালে, প্রত্যাখ্যাত অম্বা প্রতিশোধ নিতে তপস্যা শুরু করে এবং মহাভারতীয় যু[illegible] 'শিখণ্ডী' হয়ে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই মানবিক ভীষ্মের মানসি[illegible] দ্বন্দ্বকে তাঁর নাটকে বেশ আধুনিকভাবে দেখিয়েছেন। নারীর প্রেম, কামনার টান [illegible] প্রতিজ্ঞার চাপে ক্ষতবিক্ষত ভীষ্মকে নতুনভাবে দেখি।

রবীন্দ্রোত্তর কালে কবি মণীন্দ্র রায় ভীষ্মকে নিয়ে একটি কাব্যনাটিক লেখেন 'নায়ক[illegible] নাম ভীষ্ম' (১৩৭৭/১৯৭০)। সেখানে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে বাঁচা[illegible] অগ্নিপরীক্ষা। একটি সমান্তরাল উপকাহিনী কবি যুক্ত করেছেন, অজয় ও উমা[illegible] দাম্পত্যজীবন। যারা মুক্ত জীবনের স্বাদগন্ধ চায়। কিন্তু আধুনিক জীবন বড়ো কণ্টকি[illegible] তাই অজয় বলে,

শুধু দুজনেই স্বর্গ গড়া যায় না। কারণ প্রেম
তাতে দম আটকে মরে, তার শবের উপরে
শুরু হয় নব কদাচার, সঙ্গে হাজার বিকৃতি।

তবু ভালোবাসার জন্যই বাঁচা, বাঁচতে চাওয়া। অন্যদিকে ভীষ্ম বলেন,

আমি চাই বেঁচে থাকা
মৃত্যুর উদ্যত থাবা ধরে
আমি যাই ব'য়ে।

প্রেমহীন জীবন, অম্বার অভিশাপ মনে করে অর্জুনকে ভীষ্ম বলেন,

চেতনার চূড়ান্ত বিরোধ
ভয়ঙ্কর শূন্য, ব্যর্থ, অপরাধী লাগে।

এতো গেল কাব্যনাটিকের কথা। কবিতায় ভীষ্মকে খুঁজতে গিয়ে দেখি, পঞ্চাশের অন্যতম মহিলা কবি রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর ''আয়না, নিভৃত অংশীদার' কাব্যগ্রন্থে (১৯৮৮) 'ভীষ্ম' নামে আধুনিক মানসতার কবিতা লিখেছেন।

কবিতাটির প্রথম পর্বে গঙ্গার উক্তিতে জানা যায় ভীষ্মের বর্তমান ও ভবিতব্য—

পিতৃত্ব রাজত্ব দুই বিরোধী কল্পনা। জেনে, আমি
একটি একটি ক'রে পুত্র জলে ফেলার পরেও
সহসা, অপাত্রে দয়াপরবশ, তোমাকে দিলাম
পিতৃক্রোড়ে, পিতৃশয্যাভাগী হতে। পূত সুশীতল
গঙ্গায় পেলে না নিদ্রা। শরশয্যা দৈবের লিখন,

পরবর্তী পংক্তিগুলোয় কবি জানান মৎস্যগন্ধার শাপে ভীষ্মের যৌবনস্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভীষণ শপথে বহ্নিমান হয়েছে তার জীবন। অদ্ভুত এক ত্রিশঙ্কু জীবন বহন করেছেন ভীষ্ম।

তুমি পিতা নও, পিতামহ। সব রাজকীয় দায়—
দায়িত্বের বোঝা ব'য়ে, যুদ্ধ-অভিশপ্ত বৃদ্ধকালে
ক্লীব আক্রমণ সয়ে তবুও জীবন নাহি যায়।

কেমন সেই শরশয্যা— মৃত্যুপ্রায় মৃত্যুবোধ? কবির ভাষায় 'রতিবিরহিত ঘর্ষে, অসহিষ্ণু উষ্ণ দেহ তাপে' জীবন্মৃত হয়ে থাকার যন্ত্রণার নামই ভীষ্ম।

ভীষ্মকে নিয়ে এরপর আর কোনো কবি পরবর্তী দশকে কবিতা লিখেছেন কি না জানি না। সত্তর দশকের কবি দীপক রায় তাঁর 'মহাভারতের বিষাদ গাথা' কাব্যপুস্তিকায় (২০০৯) প্রথম যে কবিতাটি লিখেছেন তার নাম 'ভীষ্মকে'। এই কবির চোখে মহাভারতের মহাবীর ও মহান পিতামহ নির্বিচার শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। বরং তাঁর মনে হয়েছে,

আপনার কৌমার্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখার গর্ব ছিল,
ছিল অক্ষম পিতামহত্বেরও লোভ।

পরিবর্তিত দেশ-কালে মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন পাল্টে যায়। যেজন্য ভীষ্মের অতুলনীয় প্রতিজ্ঞার মহিমা একালীন কবির চোখে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা মনে হয় না। মনে হয় ভীষ্ম নিজেকে বিপরীতভাবে প্রদর্শিত ও বিজ্ঞাপিত করতে চেয়ে কঠোর ব্রতের উপাসক হয়েছিলেন। আসলে ভীষ্ম অহংকারী ও আত্মগর্বী পুরুষ এই কবির চোখে।

মাঝে মাঝে মনে হয় শরশয্যার মধ্যেও
কোথাও নিহিত ছিল এক অহংকারবোধ
যা আপনাকেই মানায় শুধু।

যদিও আদ্যন্ত বিচারে কবি ভীষ্মচরিত্রে দেখেছেন ' এক আশ্চর্য অসহায়তা'। সমস্তে তাঁকে কবি প্রণাম জানিয়েছেন।

আট দশক বা আশির কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'ভীষ্মের উত্তর' কবিতায় নারীর চোখে পিতামহকে, তাঁর কর্মকাণ্ডকে বিচার করেছেন। এক্ষেত্রে কবি ভীষ্মকে সম্মান জানাবার হেতু খুঁজে পাননি। ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির লঘুচিত্ত নারী সম্পর্কে জানতে শুনেছিলেন,

পাতাল যম বড়বানল মৃত্যু এবং সর্প
আগুন ক্ষুরধারা পবন সবই আছে নারীতে

কবি মল্লিকা এর পাশে জানতে চেয়েছেন, যে নারী বুকের দুধে সন্তান পালন করে স্নেহ প্রণয় প্রজ্ঞা দেয়, প্রয়োজনে যুদ্ধ করে, সেখানে 'কোথায় তার বঞ্চনার বীজ বপন হয়', তার নির্দেশিকা ভীষ্ম দেননি। শিখণ্ডীর সামনে অস্ত্র ধরলেন না বলেই ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র থাকেন ঠিকই। কিন্তু মল্লিকা মনে করেন, আসলে এ হলো নারীকে প্রবঞ্চনা করার জন্য পুরুষের শাস্তি।

সেই অম্বা যার জীবনে ভীষ্ম নামে একটি অভিশাপ
ছিনিয়েছিল বাপের ঘর বরের ঘর শান্তি
মেয়েটি তবু স্বপ্নঘর সাজাচ্ছিল ভীষ্মকেই ঘিরে
পুরুষ তাকে ফিরিয়ে দেয় বাস্তবের আঁচে

বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাই বড়ো, নারীর প্রেম তুচ্ছ, এমন মহত্ত্বে কবির আস্থা ও শ্রদ্ধা নেই। কেননা, শেষ পর্যন্ত যা ঘটে 'ইহজীবন নিজেও পচি, পচুক মরে অম্বা।' সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই ভীষ্ম যেন প্রার্থনা করেন, 'শিখণ্ডীর তীরেই তবে মৃত্যু হোক আমার।'

কবি অমিত চক্রবর্তীর কবিতা সেইভাবে আগে পড়েছি কিনা মনে নেই। সম্ভবত নব্বই বা তৎপরবর্তী কবি। 'দেশ' পত্রিকার গল্পসংখ্যায় (১৭ অক্টোবর, ২০১০) তিনি সুদীর্ঘ একটি কবিতা কিংবা মনোলোগ লেখেন, যার নাম 'ভীষ্ম দেবব্রত'। নাকি কাব্যনাটক ছাড়া ভীষ্মকে নিয়ে এতবড়ো মাপের কবিতা আমি দেখিনি, পড়িনি। এই দীর্ঘ কবিতায় শরশয্যাশায়িত ভীষ্মের উক্তিতে মহাভারতীয় ঘটনা ও ভীষ্মের জীবন মনোজীবনকথা বিবৃত হয়েছে। সূচনায় ভীষ্ম বলেন,

আমি ভীষ্ম কুরুকুলপূজ্য পিতামহ
রণাঙ্গনে পড়ে আছি আহত পীড়িত
মৃত্যুর ধ্বনিত পদধ্বনি চতুর্দিকে
ক্রমশ ধাবিত অন্ধকার নামে চোখে

নাটকীয় পরিমণ্ডলে ও ভঙ্গিতে এরপর কবি বর্ণনা করেন পাণ্ডব শিবির, হস্তিনানগরী, যুদ্ধক্ষেত্র এবং বলেন,

একা পড়ে আছি এই কুরুক্ষেত্রে
মুমূর্ষু পীড়িত

খানিক আত্মকথন ও আত্মবিলাপের ভঙ্গিতে ভীষ্ম যা বলেন, তা তাঁর অন্তর্জীবন স্পষ্ট করে। পর পর ভিন্ন পংক্তি সাজিয়ে সেই বক্তব্য তুলে ধরছি—

১. ভীষ্ম আমি —
এখন আমাকে লোকে
এ নামেই জানে
দেবব্রত পরিচয় যেন দূরস্মৃতি

২. আমি ভীষ্ম যেন জন্মভীষ্ম পিতামহ

৩. তখন যুবক আমি রাজার কুমার
অমিত ক্ষমতাশালী অনিন্দ্যসুন্দর

৪. কতরঙ্গে ভরে ছিল হায় সে জীবন!

তারপরই বিপর্যয়। কেননা জল থেকে উঠে আসা নীলপরী পিতার চোখে 'মোহের কাজল' পরিয়ে দেয়। পিতাকে সুখী করতে দেবব্রত ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু এজন্য তাঁর মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল, কেউ ভেবে দেখেছিল? ভীষ্ম বলেন,

তুমি পিতা বোঝনি কি পুত্রের শপথ
আসলে শপথ নয় অভিমানে শুধু আত্মক্ষয়
বোঝনি কি যৌবরাজ্যে বৃত সে বিভোর
স্বপ্ন দেখেছিল

না, সে স্বপ্ন চূর্ণ হয়েছে। তারপর 'ভীষ্ম নামমোহে' আচ্ছন্ন হতে হতে দেবব্রত আজ 'গতস্পৃহ ভীষ্ম পিতামহ'। কবি চমৎকার ভাবে ভীষ্মের যে মনোলোক বিশ্লেষণ করেছেন, তা যুক্তিবহ বটে। ধীরে ধীরে ভীষ্ম হয়েছেন প্রতিনিধি, প্রতিবিম্ব। রাজা নন, রাজত্বের রক্ষক; পিতা নন, পালক; গুরু, কর্তব্যপরায়ণ 'রাজা নয়, তবু ভীষ্ম রাজার অধিক'। এভাবে দিন রাত্রি কেটেছে। শুধু মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নজাগর অতীত তাঁকে বিদ্ধ করে

প্রশ্নে— 'ভুল সে কি, হিমালয়কল্প ভুল আমার জীবনে?' কাশীরাজকন্যাদের তিনি বিচিত্রবীর্যের জন্য অপহরণ করেছিলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা ভ্রাতৃবধূত্ব মেনে নিলেও 'অম্বা যেন ঝঞ্ঝা' অবাধ্য এক নারী। যে-হাতে তাকে ভীষ্ম ছুঁয়েছে, সেই ব্যক্তিকেই সে চায়। আর নিরুপায় ভীষ্ম স্মৃতিচারণে জানায়,

অম্বার স্মৃতিতে আমি এখনও বিহ্বল
জরাগ্রস্ত শিরা-উপশিরা
এখনও অম্বার নামে উচ্ছ্বসিত হয়

'তৃষিত মর্মে অম্বা জাগরূক', কিন্তু সে প্রলয়ঙ্করী। প্রত্যাখ্যাত প্রেম ঘৃণায় ও আত্মধিক্কারে প্রতিহিংসাময়ী। ভ্রাতৃঘাতী কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েও ভীষ্ম কিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তাও জানান। 'রাজদণ্ডহীন এই বৃদ্ধের বচন/ কেইবা শুনেছে?' শেষপর্যন্ত তিনি সেনাপতি হয়েছেন। যুদ্ধে অজেয় ভীষ্মকে বধ করার কৌশল জানেন শুধু কৃষ্ণ। শিখণ্ডীর বেশে অম্বাকে এনে তাঁকে উন্মনা করা হয়। তারপরই পরাজয়। তবু ভীষ্ম লজ্জিত নন; কিন্তু অনুতপ্ত। অম্বার প্রতি আচরণে ভুল ছিল মানেন। তবে অন্তিমকালে তাঁর প্রার্থনা 'আমার মৃত্যুতে হোক সব হিংসা শেষ'। মৃত্যু হোক শান্তিময় পরিণাম। কবি শেষপর্যন্ত ভীষ্মের আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কর্ণের মতো ভীষ্মও পরাজয়ে ধন্য, বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকেন পাঠকের স্মৃতিলোকে। এই অমরত্ব কম মূল্যবান নয়।

শশী ও কুসুম: বজ্রাহত বটবৃক্ষ ও থেঁতলানো গোলাপ চারা

শ্রী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা গাছ গেলো ঝলসে বজ্রের মেজাজে। একটা প্রাণ হ'লো দগ্ধ। নিয়ে গেলো সেই প্রাণকে সে, পৌঁছে দিলো তার পোড়ো শরীর শ্মশানের সামাজিকতায়, পুড়ে গেলো সেও। তবে সে ছাই হ'লো না। ঝেড়ে ফেলে চিতাভস্ম বিলিয়ে দিলো জ্যোৎস্না। আর একটা সামান্য মেয়ে, আভীরকুলের অহল্যা জায়া, সেই চাঁদেলা রোমাঞ্চে চড়িলো ভিজতে। গোলাপের চারা থেঁতলে, পায়ে ফুটিয়ে কাঁটা, বেরোলো সে অভিসারে। জানতো না সে, সেই জ্যোৎস্নার বুকে লুকিয়ে আছে যে গোপন ঘর, চারিদিকটি তার কর্তব্যের প্রাচীরে ঘেরা। পৌঁছতে সে পারলো না। থেঁতলে গেলো সেও। একজন হলো নীলকণ্ঠ শশী। অন্যজন বিধাতার শক্তির অপব্যয় এক সাধারণ মেয়ে, নাম তার কুসুম।

কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা শশী বজ্রাহত হারু ঘোষকে নিয়ে গ্রাম গাওদিয়া-য় প্রবেশ ক'রেছে। মৃত্যুকে পিঠে নিয়ে সূচনা তার। সেই মানুষটিকে নিয়ে শশীর সূচনা, যে খানিক আগে পর্যন্ত দেখেছিলো স্বপ্ন, করেছিলো উচ্চ আশা। উপন্যাসে নায়কের এই আবির্ভাব, যেখানে স্বপ্ন-আশাগুলো পুড়ে গেলো নৈসর্গিক দুর্ঘটনায়, তা আমাদের নতুন ক'রে ভাবায়। কেন ডাক্তার শশী স্বপ্নচূর্ণ মৃত্যুকে সাথে ক'রে ক'রলো প্রবেশ? আরো ভাবায়, সেই দুর্ঘটনার পাশেই জীব-জন্তুদের নানারকম উপস্থিতি:

⇒ সবুজ একটি লিকলিকে সাপ সুনিষ্ঠ কেয়া-কে জড়িয়ে ধরে আচ্ছন্ন হ'য়েছিলো। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তেই ঝোপের বাইরে এলো সে। ঝলসানো হারুকে দেখে বটগাছের কোটরে মিলিয়ে গেলো।

⇒ বটগাছের শাখায় পাখিরা উড়ে এসে বসলো। কিছুদূরে মাটির গায়ের গর্তে উইপোকা কটি ডানা মেলে উড়লো আকাশে। পাখিগুলি সতেজ আহার সারতে সেই নতুন পোকাগুলির দিকে ছুটে গেলো।

⇒ বুঁদি গাছের ডালে একটা গিরগিটি অনেকগুলি পোকা খেয়ে ফেললো।

⇒ মরা শালিখের বাচ্চাটিকে মুখে নিয়ে একটা শেয়াল সামনের মাঠ দিয়ে ছপ ছপ শব্দে পেরিয়ে গেলো।

আধুনিক কবিতার চিত্রকল্পের মতো এই ক্রিয়াগুলি এবং মৃত্যুর ওই ব্যঞ্জনা বুঝিয়ে দেয়, শশীর জীবন আর পাঁচটা উপন্যাসের নায়কের মতো হবে না। সাপ- উইপোকা- শেয়াল যে যৌনতা- স্বপ্ন ও মৃত্যুর দ্যোতনা নিয়ে এলো, বিশেষ করে স্বপ্ন- আশা- আনন্দ- আকাশে ওড়ার সাধ- কামনা যখন পাখি ও গিরগিটির আহারে নষ্ট হলো, তখন ঔপন্যাসিক প্রথমেই শশীর আগামী দিনগুলোর অস্পষ্ট আভাস জানিয়ে দিলেন।

শশীর পৈতৃক পরিপার্শ্ব মানবভাগ্যের একটা ভয়মিশ্রিত নির্ভরশীলতার ওপর তাদের

সর্বস্ব সঁপে দিয়ে এক আকাঙ্ক্ষাহীন অনুর্বর অস্তিত্ব হ'য়ে বেঁচে থাকতে চায়। সে থাকে মেধা সম্পর্কিত কোনো কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা; 'গ্রামের লোক ভয় করিতে ভা ' মৃত্যুকে নিয়ে পাপ-পুণ্যের অমীমাংশিত জল্পনা চলে। আর শশীর বাবা গো লোকঠকানোয় সে পাকা খেলুড়ে। তাই এইরক'ম স্পন্দনহীন- হৃদয়হীন- মে স্বপ্নহীন- তৃষ্ণাহীন গ্রামের একটা ধাপ্পাবাজের ছেলে কেমন হবে? প্রথমে তা এদের থেকে আলাদা ছিলো না মোটেও। শশীর 'হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তাশক্তি ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল', গড়পড়তা জ্যামিতিক ছকে 'গ্রাম্য গৃহস্থের স্বকেন্দ্রীয় জীবন যাপনের মোটামুটি একটা ছবি-ই ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তার কল্পনার সেই আটপৌরে জোলো জগৎ থেকে মানবিক অনুভূতির ও উদারনৈতিক উৎ জগতে পৌঁছে দেয় বই আর বরিশালের কুমুদ। কলকাতার আধুনিক শিক্ষা ও স ক্যারিশ্মা তার স্থবির জীবনের মালিন্যকে নির্জিত ক'রে দিয়ে করে তুললো ইনটেলেক্চুয়াল। ভোঁতা মাথার শশী হ'লো থিংকার। শশীর এই অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্য কয়েকটি আবর্তের ক্রমান্বয় অভিঘাতে স্পন্দিত হয়েছে বারবার এবং দুলে উঠেছে শশীর স্বভাব, রীতি-নীতি এবং তার মানসিকতা। আমরা এই আবর্তগু ছয়টি ভাগে ভাগ ক'রছি:

এই ছ'টি আবর্ত শশীর গাওদিয়া গ্রামসমাজের অবস্থানকে ও তাকে কেন্দ্র ক তাদের অবস্থানকে চিত্রিত করেছে। এখানে একমাত্র কুমুদ ও নন্দলাল বাইরের লো কিন্তু শশীর অভিজ্ঞতার জগতে কুমুদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু শ অন্তর্জগতে এদের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে গাওদিয়া গ্রামের অস্বাস্থ্য পরিবেশের অবস্থানও কম। শশীর অন্তর্জগত একান্তই ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার আবর্তিত হ'য়েছে। এই আবর্তে মূলত পাঁচটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়:

শশীর অন্তজর্গতের সীমাহীন চাওয়া-পাওয়াগুলির সাথে বহির্জগতের গড়পড়তা সরলরৈখিক জীবনসমাজের মিল না হওয়ায় বেধেছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে শশীর আন্তরিক ইচ্ছাগুলির মাঝে বদলে যাওয়ার সংকেত বেজেছে। বাইরে যেতে চেয়েও, 'কেয়ারি করা ফুলবাগানের মাঝখানে বসানো লালটাইলে ছাওয়া বাংলোয়' কেনারি পাখির নাচ দেখার সাধ থাকলেও, গাওদিয়া-র জলাভূমিতেই তাকে পড়ে থাকতে হয় শেষপর্যন্ত। স্বপ্নগুলি তার নিস্তেজ হয়ে যায়। মানব ভাগ্যের বা নিয়তির অপ্রতিহত দুরারোগ্য অভিশাপ লক্ষ্য করেন এখানে অনেকেই। একথা ঠিক নিয়তির কথা আছে উপন্যাসে। কিন্তু সেই থাকার মধ্যে রয়ে গিয়েছে অনেকখানি না-থাকা ও প্রতিবাদ। যে আবর্তগুলির উল্লেখে শশী বারবার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, মনের মাঝে তৈরি হচ্ছে ভ্রান্তিবিলাস; স্বপ্নগুলো সব পরিস্থিতির চাপে মুখ লুকোচ্ছে, সেই প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও তার অতর্কিত উপস্থিতি-কে নিয়তি ভাবা কি ঠিক হবে খুব? তবু-ও কি শশী পারেনি সেই বজ্রাহত শরীর ও নির্লিপ্ত মন নিয়ে সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

সেনদিদির সাথে যামিনী কবিরাজের সেই অর্থে দাম্পত্য জীবন বলে বিশেষকিছুই ছিলো না। গোপালের কারসাজিতে সুন্দরী সরোজ বুড়ো কবিরাজের গলায় মালা পরিয়ে অতৃপ্তির অন্ধকারে বুঁদ হ'য়ে যায়। এদের দুজনের দাম্পত্য সংকটের মূলে রয়েছে অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের পারদ যখন মাত্রা ছাড়িয়েছে, শশী তখন ডাক্তার হ'য়ে ফিরে এসেছে গ্রামে। সেনদিদির বসন্ত সারানোকে কেন্দ্র ক'রে শশীর মধ্যে দেখা দিয়েছে মৌন চ্যালেঞ্জ। কেননা যামিনী কবিরাজের ছাত্র ভূপতিচরণ সাতগাঁয়ের একটি বসন্তের রোগীকে সারাতে না পেরে শেষমুহূর্তে শশী তার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলো। শেষপর্যন্ত মারা

গিয়েছিলো রোগীটি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যামিনী কবিরাজ চিমটি কাটা যে ক… বলেছিলো, সেনদিদির চিকিৎসার সময় সে-কথা মনে পড়ে যায় শশীর: 'আমার ছা… যাকে ছাড়পত্র লিখেদিল তাকে বাঁচাবে শশী, আমাদের শশে?' এই ভাবনার পরে… মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'শশী প্রাণ দিয়া সেনদিদির চিকিৎসা ও সেবা আরম্ভ করি… অন্য রোগীরা তাহাকে ডাকিয়া পায় না।' শুধুমাত্র অপবাদের ও ডাক্তার হিসেবে নিজেকে… প্রতিষ্ঠিত করাই নয়, যামিনী কবিরাজের কাছে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির মৌলিক… প্রমাণ-ও শশীর এই আন্তরিক দায়িত্বগ্রণের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিলো। প্রায় নির্বাক শ… মন-প্রাণ উজাড় ক'রে সামান্য ডাক্তারের মতো নয়, সন্তানের মতো সেবা করছিলো… সেনদিদির। এই অসুস্থ সেনদিদিকে কেন্দ্র করেই তার মনে জমাট বাঁধছিলো সন্দেহে… মুক অবচেতনা। সেনদিদির চিকিৎসার ভার নেওয়াকে কেন্দ্র ক'রে প্রতিরোধ গড়ে… তুললো গোপাল— 'যুবতি স্ত্রীলোক, নানারকম কুৎসাও শুনতে পাই—'। যামিনী… কবিরাজও চায় না যে শশী সেনদিদির দায়িত্ব নিক। এমনকি সেনদিদি যামিনী কবিরাজের… দেওয়া কোনো ওষুধ-ও খায় না। শশী আরো বিস্মিত হয়ে যায়, 'যামিনী অসুখের ক… গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল,' ভাবে শশী, এই আপাতজটিল দাম্পত্য জীবনে… টুকরো টুকরো ঘটনাগুলিকে মিলিয়ে সে এর শিকড় পর্যন্ত পৌঁছতে চায় 'কী জন্য তাহার… এই বিকৃত নিষ্ঠুর অবহেলা?' শশী যখন একান্তই অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে সেনদিদির… চিকিৎসা আরম্ভ করলো, তখন গোপাল ও যামিনীর পারস্পরিক সমালোচনায় শশী… 'বিপন্ন ও বিব্রত হইয়া রহিল'। কোনো বুদ্ধিমান মানুষ যখন অন্য-অপরের কাছ থেকে… ছিটকে আসা সমালোচনায় বিপন্ন বোধ করে, তখন সে নিজের মধ্যে তৈরি করে নেয়… এক খোলস, যে পথে সে যাবে ঠিক করেছে, সেই পথ থেকে সে বিচ্যুত হতে চায় না… কোনোভাবেই। অন্য-অপরের মতামত-কে নিয়ে সে বিশ্লেষণ করে। যেহেতু সে নিজেকে… বারবার বুঝে নিতে চায় নিজেরই বোধ দিয়ে, পরীক্ষা করে বারবার নিজের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, মননের তীক্ষ্ণতা দিয়ে যেহেতু সে চালিয়ে যায় পথের পাগুলি, সেহেতু অন্যের মানসিকতা ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে নিয়েও তার ভাবনার বা বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখা যায়। শশী এই বিশ্লেষণাত্মক মননশীলতায় বুঁদ হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীর এই আত্মবিশ্লেষণ ও অন্যের মানসিকতার বিশ্লেষণাত্মক বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তোলার জন্য একাধিক বার 'শশী ভাবে', 'তাহার মনে হয়', 'অনুভব করে', 'সে বুঝিতে পারিল' প্রভৃতি কথা ব্যবহার ক'রেছেন। যামিনী কবিরাজ ও গোপালকে নিয়ে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই শশীর একটা আলাদা ভাবনার জগৎ তৈরি হয়ে যায়। সেনদিদির সাথে এদের ব্যবহার দেখে তাই শশীর মনে হয়, 'ওরা মারিয়া ফেলিতে চায় নাকি সেনদিদিকে? তাই-বা কেন চাহিবে? তা ছাড়া যামিনীর এই লজ্জাকর পাগলামিতে গোপাল এভাবে সাহায্য করিতেছে কেন, তার স্বার্থ কী?' যামিনী বা গোপাল সেনদিদির কুৎসা-কলঙ্কিত

অস্তিত্বকে ভয় পায়। যামিনীর ভয়ে মিশে থাকে সন্দেহের তীব্র বিষ। গ্রামের অশিক্ষিত আবহাওয়ায় এই সমস্ত কুৎসা চটুল বিনোদনের কাজ করে। লোকেরা তার ওপর মনের মতো রং চড়িয়ে বিষয়টির প্রবর্তনায় অনুভব করে তৃপ্তি ও স্বস্তি। গোপালের ভয়টা এইখানেই যে, সেনদিদির কুৎসার মাঝে শশীর নামটা যাতে জড়িয়ে না যায়। গোপালের অবস্থান শশীর সামাজিক সাম্মানিক নিরাপত্তার প্রয়াসে উন্মুখ। শশী-র তা মনে হয় না। বরং সেনদিদির অস্ফুট মাতৃহৃদয়ের থেকে 'পেটের ছেলের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি শশী' কথায় শশীর মাতৃহীন হৃদয়ে 'কেমন একটা বালকত্বের অনুভূতি হয়। সেনদিদির প্রতি অনুভব করে সে মমত্ববোধ। কিন্তু পরক্ষণেই তার চিন্তাজীবী মন সন্দেহ ও প্রশ্নের রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।— 'পেটের ছেলের চেয়ে ভালোবাসে? এ কথার অর্থ কী? সেনদিদির তো ছেলে মেয়ে হয় নাই কখনও।' বহুরৈখিক মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের মাঝে শশী বুঝতে পারে না যামিনী- গোপাল ও সেনদিদির জটিল আচার-আচরণের বিন্যাস। মনের ভাবনাতেই সেই সন্দেহ-সংশয় ও ঘাত-প্রতিঘাতের স্পন্দন থেকে যায়, প্রকাশিত হয় না। আসলে শশী কথা বলে খুব কম। মনের সাথে যাদের মেলে না একেবারেই, অথচ কর্তব্যবোধ বা মানসিক দৃঢ়তা যার প্রবল, সেখানে সে কথা ব'লে তার অভিনব পরিকল্পনার ছক জানাবে কেমন করে? তাই শশী অনেক-সময়েই নির্বাক থেকে যায়। যারা স্বভাবত যুক্তিবাদী হয়, হয় মননশীল, তাদের মননের গভীরতার থই পায় না আর পাঁচজন। গোপাল এতোটাই বিষয়ী ও ব্যবসাজীবী যে, সে শশীর মনটা পেতে চায়, কিন্তু বুঝতে না পারার কারণে পেরে ওঠে না। শশীকে সে ব্যবসায়িক ক'রে তুলতে চায়। কিন্তু ব্যবসা ফেঁদে জীবন চালানো-টা যে শশীর সব নয়, ক্যাপিটালিস্ট সে হতে চায়, তার জন্য স্বপ্ন-ও দ্যাখে, তার জন্য তার 'অর্ধেক মন সংসারী, হিসেবী, সতর্ক', কিন্তু সে অমানবিক স্বার্থপর ক্যাপিটালিস্ট হ'তে চায় না। গোপালের ফন্দিবাজ বোধে এই উদারতা কুলায় না। সেনদিদিকে সারিয়ে তোলার ব্যবস্থাপনায় ও রাত-দিন জেগে সেবায় গোপাল মনে করে আতিশয্য। আসলে গোপালের বানিয়ে তোলা মিথ্যের সারাংশগুলো শশীর বুঝতে সময় লাগে না। তাই শশী বিচলিত হয় না খুব একটা। যে-গোপাল চায়নি সর্বাঙ্গসুন্দরী সেনদিদি সেরে উঠুক, সেই সেনদিদি যখন যামিনীর ভুল ওষুধ খাওয়ানোর ফলে নষ্ট একটি চোখ নিয়ে বেঁচে উঠলো, গোপাল তার প্রতি অনুভব ক'রলো অস্বাভাবিক আকর্ষণ। 'গোপালের সঙ্গে তার যেন একটা সন্ধি হইয়াছে'। এই সন্ধির প্রবর্তনায় 'গোপালেরও যেন একটা রোগ আরাম হইয়া গিয়াছে। আজকাল সে প্রসন্ন, প্রশান্ত।' গোপালের এই অবেলায় যৌনতাজনিত প্রসন্নতা বুঝে যায় শশী, কিন্তু বুঝতে পারে না, ক্ষতিকারক গোপালের কাছে সেনদিদির ঘনঘন যাওয়া-আসা আর উতরোল হাসির ফুলকি। একটা প্রতিশোধের আগুন যে সেনদিদি-কে এতো লোভনীয় ক'রে তুলতে পারে, শশী এই মনস্তত্ত্বটা বুঝতে পারে না। তার কাছে সেনদিদি-ও অনেক

নীচে নেমে যায়। গ্রাম্যজীবনের এই বেহায়া ছেনালিপনা শশীর সহ্য হয় না। তাই 'গ্রামের উপরেই শশীর বিতৃষ্ণা যেন বাড়িয়া যায়।' আসলে গোপালের কাছে শশী 'আকাশের দেবতা' 'নাগাল পাওয়া কঠিন।' তাই শশীকে বুঝতে সে পারে না। তার দুঃখ এটাই, ছেলেমেয়েদের কাছে, বিশেষত শশীর কাছে সুখ না পাওয়া। সেনদিদির কাঁধে হাত রেখে গোপাল তার নামধরে ডেকে জানায় 'জানিস সরোজ, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে একদিনের তরে সুখ পেলাম না।' গোপালের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এইভাবে লেখেন: '... কত দুঃখে কানা সেনদিদির কাছে গোপাল আজ সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরে।' কিন্তু এর জন্য কি শশী দায়ী? গোপালের ব্যবসায়িক অবস্থানকে বা তার ইচ্ছার ধরণ-কে স্বীকার করে নিলে আমরা মানবিক শশীকে ও তার প্রতিবাদী সত্তাকে পেতাম না। এমন ক-জন আছে পৃথিবীতে যারা কেবলমাত্র অন্যের সুখ চরিতার্থতার জন্য নিজের অসামান্য সম্ভাবনাকে কার্যত বির্সজন দিতে পারে? শশী তো তাই ক'রতে চেয়েছে। ব্যক্তির সুখের স্বপ্ন সে দেখেছিলো, কিন্তু সমষ্টির প্রশ্নে গোপালের একার কান্নায় কি যায় আসে। বিশেষত সেই কান্না যখন সমষ্টির সেবা সাধনার প্রতিকূলেই জোয়ার আনে। তাই গোপাল বার-বার শশীকে কাছে পেতে চাইলেও, হাসপাতাল ফাণ্ডে পাঁচশো টাকা বাধ্যহয়ে চাঁদা দিতে চাইলেও, শশীর আদর্শবোধের নিবিড় প্রাচীর ভেদ ক'রতে পারলো না। গোপালের এই বিবর্ণ অস্তিত্ব, সেনদিদির কাছে সান্ত্বনা খোঁজার হার্দিক প্রয়াস, এবং তারপরই সেনদিদির গর্ভে গোপালের গোপন সন্তান— সবকিছুই শশীর অভ্যন্তরীণ সভ্যতায়, তার কর্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ় মানসিকতায় সাময়িকের জন্যও প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলো। তাই শেষপর্যন্ত গোপালকেই শশীর কাছে কৃপাভিক্ষা ক'রতে হয় সেনদিদির গর্ভপাত ঘটানোর জন্যে। শশীর তখন মনে হয়, 'বসন্ত যখন রূপ মুছিয়া লইয়া গেল সেনদিদির, তখন মমতা আসিল গোপালের, এমন গভীর অবুঝ স্নেহ!' শশী সম্মত হয়, গোপালকে বলে, 'আমি যাচ্ছি ও বাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে।' শশীর দ্বন্দ্বপীড়িত সংকোচ ও লজ্জাক্ষুব্ধ মানসিকতায় 'ও বাড়ি' কথাটি হয়তো অসচেতন ভাবেই, নিজেরই অজান্তে বেরিয়েছে, কিন্তু কথাটির মধ্যে নিহীত আছে শশীর বিভাজিত বিবেচনার প্রকাশ। একদিকে, এ-বাড়িতে শশীর সংসার, অন্যদিকে ও বাড়িতে গোপালের সংসার। শশীর কাছে অতর্কিতে ছিটকে আসা এই আঘাতে গোপাল কষ্ট পেলো খুব। গোপাল ধরেই নিয়েছিলো, খুব স্বাভাবিক না হলেও অন্তত অপ্রকাশ্যে শশী এই অবৈধ ঘটনাটিকে গ্রহণ করবে, এবং কৃপানাথের আহ্বানেই সাড়া দেবে শশী। কিন্তু তা যখন হলো না, নিজেরই অবৈধসন্তানকে অকালে দেখার জন্য যখন নিজেকেই সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে নিজেরই বৈধ সন্তানের কাছে দাঁড়াতে হলো, অত্যন্ত আপনজনের কাছে তার এই নির্মম পরাজয়ে, আত্মযন্ত্রণায় গোপাল পূর্বাপেক্ষা অতুলনীয় কষ্ট পেলো। শশী-ও কি কষ্ট পেলো না? আপনজনের কাছ থেকে আসা আঘাত লাগে সবথেকে বেশি। অন্য সমস্ত আঘাত তার কাছে তুচ্ছ

ব'লে মনে হয়। এই আঘাতের বলে কেউ মুষড়ে পড়ে, কেউ আত্মহত্যাও করে, আবার কেউ অসম্ভব জেদ ধরে, সমস্ত বাধাকে সে সেই অলব্ধপূর্ব জেদের জোরে ভেঙে ফেলতে চায়। শশীর জন্মালো সেই জেদ। 'আবার তেমনই জিদ শশীর আসিয়াছে যার জোরে সেনদিদিকে আগে একবার সে বাঁচাইয়াছিল। সেদিন সে লড়িয়াছিল বাহিরের বাধার সঙ্গে, আজ কি শশীকে লড়িতে হইল অন্তরের বাধার সঙ্গে?' এই অন্তরের বাধা এতোটাই প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো ডাক্তার শশীর মনে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ রহস্যময় মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে তার অভিব্যক্তি ঘটালেন: 'মুমূর্ষু সেনদিদিকে দেখিয়াও কি শশীর মনের বিতৃষ্ণা মিলাইয়া গেল না? সব তো তারই হাতে, এ দুজনের মরণ বাঁচন! কী না করিতে পারে শশী? শুধু সেনদিদির নয়, সেনদিদির এই নবাগত চিহ্নের চিহ্নকেও তো সে চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিতে পারে। কারও প্রশ্ন করা চলিবে না কেন এমন হইল। শশী কি শুধু মানুষ বাঁচাইতে শিখিয়াছে, মারিতে শেখে নাই? অতি সহজে, অন্যমনস্ক অবস্থায় ভুল করার মতো করিয়াও, সে তো পারে। বাকি জীবনটা তাতে খুব কি আপশোশ করিতে হইবে শশীকে?' এর পরই চমকের মতো দেখা যায় 'শেষরাত্রে একটি ছেলে হইল সেনদিদির, ভোরবেলা সেনদিদি মরিয়া গেল।' ওই বিধ্বংসী মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের পরই সেনদিদির মৃত্যু এবং তারে পর শশী সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য 'শশীর বিশ্বাস হইতে চাহে নাই', 'কখনও মনে হয় নাই', 'শশীও ভাবিতে পারে নাই', 'সে-ও যে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না'- প্রভৃতি আমাদের সন্দেহকে যতো তীব্রতায় নিয়ে যাক না কেন, সেনদিদিকে শশী বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাজনিত কারণে হত্যা করে নি। সেনদিদিকে শশী যদি অসচেতনভাবেই হত্যা করতো, তাহলে মানবিক ও কর্তব্যনিষ্ঠ ডাক্তার শশীর মধ্যে দেখা দিত অপরাধবোধ। এক তীব্র মোহগ্রস্ত মানসিক বিক্রিয়ার ডেস্ট্রাকটিভ মুভমেন্ট কেটে যাওয়ার পর তার বিবেকের দংশন তাকে পাগল করে তুলতো। কিন্তু আমরা দেখছি মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে না পারলে আর-পাঁচজন ডাক্তার যেমন ডাক্তারি সিস্টেমের পর্যালোচনা করে, শশী-ও তাই করেছে। তাছাড়াও সেনদিদিকে সারিয়ে তোলার জন্য সে চেষ্টারও ত্রুটি রাখেনি। সেনদিদির মৃত্যুতে গোপাল বিবর্ণ হ'য়ে গেলো। শশীর চিকিৎসাপদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ ক'রলো। কিন্তু শশী তাকে কোনোরকম সন্তোষজনক উত্তর দিলো না। কি ব'লবে শশী? তার বাবার কাছে তাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে? এতো দুর্বল শশী নয়। শশী তাই আগের মতোই মিতবাক। শুধু মনে সে অনুভব করে তীব্র যন্ত্রণা, চিকিৎসক পুত্রের সম্পর্কে পিতার অকথ্য ভাবনায় শশীর 'মুখখানা লাল হইয়া যায়।' যখন আমরা দেখি 'গোপালের প্রতি একটা অন্ধ ভয়-মেশানো ভক্তি আজও তার মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে— হয়তো চিরদিনই থাকিবে।' কিংবা 'শৈশব ও কৈশোরের এই যমটিকে ভয় করা তাহার সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ...' তখন অনেকেই শশীর গোপালভীতির প্রসঙ্গটেনে এনে তাকে দুর্বলচিত্ত বলে সাব্যস্ত

ক'রে দেন। এ-কথা ঠিক শশী গোপালের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলে এবং গোপালের প্রতি তার মর্মান্তিক বিরাগ থাকলেও গোপালের মুখোমুখি সে সম্মুখ সমরে নামে নি কখনো। কিন্তু অনেকসময়েই নীরবতা মারাত্মক প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় দেয়। হাসপাতালকে কেন্দ্র ক'রে গোপালের বাড়াবাড়ি রকম আদিখেতা শশী কিন্তু সরাসরি নাকচ ক'রে দিয়েছিলো। গোপালের লোভী সত্তাকে চিনে ফেলেছিলো শশী। তাই মহৎ-সমষ্টির স্বার্থ যেখানে জড়িত সেই হাসপাতাল তৈরীর কমিটিতে সে গোপালকে রাখেনি। এই নীরব প্রতিবাদ, আক্ষরিক অর্থে কার্যকরী প্রতিবাদ কি শশীর দুর্বল সত্তার পরিচয় বহন করে? গোপালের অমানবিক অকৃতজ্ঞ আবদারে শশী মাথানত করেনি বলেই তো গোপালের সাথে থাকা তার অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিলো। কুসুমের স্মৃতিবিজড়িত গাওদিয়া তার অন্যতম কারণ তবুও গোপালের দিকটাকে তো নস্যাৎ করা যায় না। গোপালের প্রতি শশী এতোটাই বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলো যে, সেনদিদির কাঁচা সোনার মতো ফুটফুটে ছেলেটিকে চিকিৎসা পর্যন্ত করেনি সে। ছেলেটিকে দেখলেই তার মধ্যে এক ঘৃণ্য মনোভাব জেগে উঠতো। গোপালও জানতো শশীর এই তিক্ততাকে। তাই কুন্দকে মানা করেছিলো গোপাল, শশীর সামনে ছেলেটিকে নিয়ে না যেতে বলেছিলো 'সেনদিদির ছেলেটাকে শশীদাদার সামনে নিয়ে যেতে কতবার মামা বারণ ক'রেছে, ...' ভয়ানক আত্মিক যন্ত্রণা এখানে শশীর ও গোপালের। শশী কোনোমতেই মেনে নিতে পারছে না এই ছেলেটিকে, ধমক দিচ্ছে কুন্দকে একগাছি সোনার হারের লোভে তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। অন্যদিকে গোপাল না পারছে তার আজন্ম স্বপ্নের প্রদীপ শশীকে ছাড়তে, না পারছে অকাল বসন্তের কোকিল ওই ছেলেটিকে ছাড়তে। শেষপর্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে কাশীবাসী হ'লো গোপাল। গোপালের এই অবস্থান ট্রাজিক। এক সীমাহীন হতাশায় ডুবে গেলো সে। স্বপ্নভঙ্গের মর্মান্তিক যন্ত্রণা তার ছায়া হ'য়ে জড়িয়ে থাকবে গিরগিটির মতো আমৃত্যু। শশীর এই মানসিক সংকটের মাঝেই দেখাদিলো চিকিৎসকের সংকট। এই সংকটের আবর্ত নির্মাণ ক'রলো যাদবপণ্ডিত ও পাগলদিদি। অল্পশিক্ষিত যাদব গৃহস্থ যোগী ও সংসারী সাধক হওয়ার জন্য পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়েছে। শশীকে যাদব ভালোবাসে খুব। এই ভালোবাসার অন্যতম কারণ শশীর স্বতন্ত্র্য আবেদন। গাওদিয়ায় শশীর একটা আলাদা মর্যাদা আছে। বিজ্ঞানবিশ্বাসী যুক্তিনিষ্ঠ শশী-র সাথে সাধক যাদবের পথ বিপরীতগামী। কিন্তু যাদব শশীকেই অলৌকিক সূর্যবিজ্ঞানের ছাত্র ক'রে তুলতে চায়। শশী যাদবের এই সূর্যবিজ্ঞানকে বিশ্বাস করতে চায় না। অন্যদিকে যাদবের সরলতায় ও পাগলদিদির আন্তরিক স্নেহে শশী প্রতিবাদ-ও করতে পারে না। আসলে যাদবের ঘরটিকে শশীর খুব ভালো লাগে। গাওদিয়া গ্রামের অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মাঝে পাগলদিদির সযত্ন লালিত্যে ঘরটির সতেজ আবহাওয়ায় শশীর মন ভরে যায়। শশী এখানে বোধ করে শান্তি ও সন্তোষ। কেন? শুধুমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য? লেখক

জানাচ্ছেন, 'ভাঙাহাটে যে বিষণ্ন স্তব্ধতা ঘনাইয়া থাকে, এ তা নয়। এ ঘরে বহুযুগ ধরিয়া যেন মানুষের জ্বালা-করা বেদনার হল্লা প্রবেশ করে নাই। এ ঘরে জীবন লইয়া কেহ যেন কোনোদিন হইচই করিয়া বাঁচে নাই,— আজীবন শুধু ঘুমাইয়া এ ঘরকে কে যেন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে।' বিষণ্ন স্তব্ধতা— যেখানে প্রাণের কোনো সজীবতা নেই, গাওদিয়া গ্রাম শশীর কাছে বিষণ্ন স্তব্ধ। জ্বালা করা বেদনার হল্লা— এখানে সেই কান্নাকাটি নেই, অভাব-অভিযোগ নেই, জীবননিয়ে অকারণ কোনো ব্যস্ততা নেই— এই ঘরটির অনাবিল প্রসন্ন স্তব্ধতা ডাক্তার শশীকে, তার মনকে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করে। শশীর মন নির্জনতাপ্রিয়। ডাক্তার হওয়ার কারণে তাকে অনেকরকম হইচই, বেদনার হল্লা সহ্য ক'রতে হয়। সে-সবকিছুর পর 'শ্রান্ত মনে সন্ধ্যার জনহীন মন্দিরে বসার মতো বুড়োবুড়ির এই নীড়ে সে শান্তি বোধ করে।' এই জনহীন নির্জনতা বুদ্ধিমান-মননজীবী মানুষদের আত্মরূপদর্শনে সাহায্য করে। নির্জনতার অস্পন্দ সন্ধ্যায় মনের তারগুলি স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেখানে শশী তার মনের জ্বালা ও অসন্তোষের সন্ধান পায় ও তার সন্তাপ জুড়িয়ে যায়। আসলে মননজীবীরা কম-বেশি সবাই একটু নির্জনতা প্রিয় হয়। আবার মননের অতলান্তিক গভীরতার জন্য সে বোধ করে একাকীত্ব। এই এলিয়েনেশন্-ও তাকে নির্জন ক'রে তোলে। সকলের মাঝে থেকেও, নিরালায় থেকেও সে বোধ করে এই ভয়ংকর একাকীত্ব। শশীর এই একাকীত্বের দাহ এতোটাই তীব্র যে সে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। সবার মাঝে থেকেও, সবার হাসি-কান্নার পৌষ-ফাগুনের পালায় সমব্যথী হয়েও, শশী স্বতন্ত্র্যই থাকে, মিশে যেতে পারে না, ভাবনাগুলোতে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলেও এক অখণ্ড জীবনচেতনা তাকে আলাদা করে রাখে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন তার নিজেরই সত্ত্বায় আঘাত হানে, তাই কোনোকিছুই সে সহজ ও সরলরৈখিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। যাদব ভূতোর মৃত্যুসংবাদ শুনে নির্বিকার ও নিশ্চল থেকে পার্থিব নিয়মাবলীর ব্যাপারে কোনো আগ্রহ না দেখালেও, জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে তার মধ্যে নচিকেতা সুলভ কোনো দর্শনজিজ্ঞাসার উদয় না হলেও, যাদবের জোরে লাঠির শব্দ ক'রে পথ চলার প্রয়াসে শশী তার মিথ্যের ফাঁকিটা ধরে ফেলে। জীবন ও মৃত্যু যার কাছে সমান, সে কেন সাপের ভয়ে লাঠির শব্দ ক'রে পথ হাঁটবে? শশীর বাঁকা প্রশ্নমুখর মনে তাই সন্দেহ জাগে, 'মরিতে যাদব কি ভয় পান, — ... অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁর ভয়?' যাদব তার পুরনো বৃত্তান্ত শশীকে শোনায়। বাইশ বছর বয়সে গাওদিয়ায় বাসা বেঁধে চল্লিশ বছর ধরে গৃহস্থ সন্ন্যাসী যাদবের মতাদর্শ শুনে শশীর মন আরো সন্দেহ প্রবণ হয়। যাদবের একটা উদ্দেশ্য আছে গ্রামে আসার। অনেক সময় দেখা যায়, পার্থিব আচার-আচরণে নিস্পৃহ থেকে, অন্তত গ্রামীণ গড়পড়তা সংস্কারের থেকে স্বতন্ত্র্য থেকে সাধন ভজন করলে তার সম্পর্কে অশিক্ষিত মোটামাথার মানুষ কৌতূহল বোধ করে বেশি। যাদবের প্রণাম না নেওয়া, শিষ্য না করা, ভক্তিতে ভাবুক বা আবেগাপ্লুত

না হওয়া, আশীর্বাদ না করা— সমস্তই তার রহস্য ও স্ট্যান্ডার্ডকে চিনিয়ে দেয়। যাদব এটাই চায়, শশী বুঝেও নেয় 'লোকের মনে ভয় ও শ্রদ্ধা জাগানোর কৌশল এসব।' যাদবের এই স্টাইলকে শশী শখ ও খেয়াল বলে মনে করে। পইতাতে পাতলা জল-মেশানো কালি মাখিয়ে যাদব শশীর যুক্তিবাদী মনে সূর্যবিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সূর্যের সামনে মেলে ধরে পইতা, শশীকে অভিভূত করার জন্য যাদবের এই অকুণ্ঠ প্রয়াসে শশী বিস্মিত হয়। মস্ত এক ফাঁকির কারসাজিকে স্বীকার করে নিয়েও শশী যাদবকে শ্রদ্ধা করে। কেন? এই শ্রদ্ধা অযৌক্তিক যাদবের জন্য নয়, তার মর্যাদাবোধে, সম্মানীয় হয়ে ওঠার সাধনায়। শশীরও মর্যাদাবোধ চরম, সে-ও সম্মানের সাথেই বাঁচতে চায়। পদ্ধতিটা আলাদা। শশী যাদবের ওই পদ্ধতিটাকে অশ্রদ্ধা করে না, পাত্তাও দেয় না, 'সায়ও দেয় না, প্রতিবাদও করে না।' কিন্তু যাদবের বিশেষ হ'য়ে ওঠার প্রয়াসকে অবজ্ঞাও ক'রতে পারে না। শশীর এই শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়, যখন নিজেকে আত্মমর্যাদায় ও জনমানসে অমরতায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাদব আফিম খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ও তাকে কার্যকরী করে তোলে। এখানেই দেখা যায় চিকিৎসক শশীর সংকট। ডাক্তার শশী সরাসরি প্রত্যক্ষ ক'রছে মুমূর্ষুর মৃত্যুযন্ত্রণা ও তার আত্মপ্রসাদ। একদিকে মৃত্যুজনিত সীমাহীন দুঃখ অন্যদিকে পুরুষোত্তম হ'য়ে ওঠার গোপন আনন্দ। এর মাঝে শশীর অবস্থান ভয়ানক। মৃত্যুর এই নাটকটা জানে একমাত্র শশী আর পাগলদিদি। সূর্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত অতর্কিত জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে যাদব রথের দিন তার অনিবার্য মৃত্যুর কথা বলে দিলেও যাদব এর জন্য কম দুঃখ পায়নি। এই ঘটনার পরে দেখা যায় 'ফোকলা মুখের চিরন্তন হাসিটি তাঁহার নিভিয়া গিয়াছে। দুচোখ ভরা জল— বার্ধক্যের স্তিমিত দুটি চোখ।' চোখের জল ও বিবর্ণ মুখ প্রমাণ করে যাদব অনিবার্য মৃত্যুর জন্য দুঃখোদ্বেল। কিন্তু শশীর মধ্যে জেগে ওঠে অপরাধ বোধ। 'আমার জন্যই এ কাণ্ড হল। আমার যে কীরকম লাগছে পণ্ডিতমশায়—' শশী চেষ্টার কসুর করে না যাদবের মৃত্যু রোধ করতে। মৃত্যুর দিন রথের সময় হলেও বছরটা নির্দিষ্ট নয়, তাই কোনো এক বছরের রথের দিন বা বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকা— এই সমস্ত পথ দেখায় শশী। অপরাধ বা হত্যাকারীর আত্মঅপবাদ থেকে শশী মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু নরোত্তম হ'য়ে ওঠার অপরিত্যাজ্য মোহে যাদব শশীর এই সমাধানকে ধিকৃত করে ও শশীকে অপমান করে। যাদবের এই অপমানের পর শশীর বিজ্ঞানবাদী মন স্পন্দিত হ'য়েছে। লেখক জানাচ্ছেন: 'বিশ্বাস হয়না, তবু শশীর মনের আড়ালে লুকানো গ্রাম্য কুসংস্কার নাড়া খাইয়াছে। এক এক সময় তাহার মনে হয়, হয়তো আছে, বাঁধা যুক্তির অতিরিক্ত কিছু হয়তো আছে জগতে, যাদব আর যাদবের মতো মানুষেরা যার সন্ধান রাখেন।' যাদবকে কেন্দ্র করে অগণিত মানুষের স্রোত, তাদের বিশ্বাস, চোখের জল, তাদের উৎসুক একাগ্রতাকে শশী মুগ্ধ বিস্ময়ে পর্যালোচনা করে। তবে শশীর মধ্যে এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা সেনদিদির

মৃত্যুর সময়েও দেখা দিয়েছিলো। শশী তখন ভেবেছিলো 'মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধন্বন্তরিরও যা থাকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। এ তো মানুষের বানানো কল নয়।' শশীর এই সংস্কারাচ্ছন্ন মনটিকে অস্বীকার করা যায় না। এই মনটির প্রতিফলন দেখা যায়, যাদবের মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার ব্যাকুলতায় আর গোপালকে প্রণামের সামাজিকতায়। কিন্তু শশীর এই অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস বা তজ্জনিত সংস্কার তাকে ভাববিহ্বল করে না, তাকে পীড়া দেয়। বিজ্ঞানের ছাত্র হ'য়েও, আধুনিক মনস্ক হ'য়েও, সে যে সেখানে যুক্তির পারম্পর্য খুঁজে পাচ্ছে না, এই বোধ তাকে পীড়া দেয়। কিন্তু শশী যাদবের তৈরী করা উইলে হাসপাতাল নির্মাণের দায়িত্ব পাওয়ায় কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। 'জীবনে নতুনত্ব আসিয়াছে, বৈচিত্র্য আসিয়াছে. যাদবের কাছে সে বোধ করে কৃতজ্ঞতা।' তার সম্পর্কে গ্রামবাসীর মনে কেবলমাত্র ডাক্তার হিসেবে নয়, সর্বকর্মের নেতা হওয়ার সুযোগ এসেছে। যে মর্যাদা ছিলো গাঁয়ে, সেখানে এসে মিশেছে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ। শশীর কথার ওজন বেড়েছে, দাম বেড়েছে। শশীকে বিশ্বাসের জন্য এবং বিশ্বস্ত ক'রে তোলার জন্য যাদবের এই দায়িত্ব প্রদানে শশী অভিভূত হ'য়ে যায়। গ্রাম ছাড়ার পরিকল্পনা এই হাসপাতালের বন্ধনে নিস্তেজ হ'য়ে যায়। হাসপাতালকে কেন্দ্র ক'রে সে গ্রামকে স্বাস্থ্যসচেতন ক'রে তুলতে চায়। কিন্তু হাসপাতালকে নিয়ে শশীর আরো ব্যাপক অনুভূতি কাজ করেছে, সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি।

গোপালের অনৈতিক কাণ্ডকারখানায় যাদের জীবনে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া, তাদের সম্পর্কে মানবিক শশীর আছে একটা আলাদা দায়িত্ববোধ। একে ঠিক প্রায়শ্চিত্ত ব'লবো না, শশীর এই দায়িত্ববোধ একান্তই কৃতজ্ঞতার ও মঙ্গলজনক, তাই একে মানবিক দৃষ্টিকোণে দেখাই ভালো। প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে আছে একরকমের পরাজয় এবং সেই পরাজয় দেখা যায় মূলত চরিত্রটির মূক সরলরৈখিক স্বীকারে। আমরা যখন কোনো কিছুরই প্রায়শ্চিত্ত করি, বা করি ব'লে ধরেও নিই, তখন সেখানে আত্মবলিদানের একটা আবহাওয়া থাকে, বিশেষত সেই প্রায়শ্চিত্ত যদি কোনো বিবেকহীন পাপী লোকের হয়। শশী কিন্তু গোপালের স্বার্থপর, কার্যত ব্যবসায়িক কাজগুলিকে স্বীকার করেনি। বিন্দুর অসহায় অবস্থান ও নন্দের রোষ একমাত্র গোপালের অপকর্মের-ই কারণে এবং গোপালও তার এই কাজে বিন্দুর জীবনে সম্ভাব্য অঘটনকে বোঝার চেষ্টাও করেনি, তার ব্যবসায়িক মূলধনে হয়তো প্রয়োজনও ছিলো না— শশী এর সবটাই জানে। সবটা জেনেই শশী এদের প্রতি অনুভব করে মমত্ব। 'গোপালের খেয়ালে জীবনে যারা দুঃখ পাইয়াছে তাদের জন্য শশীর মনে একটা অতিরিক্ত মমতা আছে। গোপালের কীর্তিতে নিজেকেও সে কেমন অপরাধী মনে করে। মনে হয়, তারও যেন দায়িত্ব ছিল।' শশীর এই অপরাধ-বোধ কৃতজ্ঞ মানসিকতারই পরিচয় দেয়। অন্যের অপরাধে যে অপরাধী মনে করে, যে

অপরাধের সাথে আক্ষরিক অর্থেই যার কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে তার মানবিক উদারতা ও অ-সাধারণ আদর্শবাদিতার পরিচয় ফুটে ওঠে। শশী এতোটাই উদার ও আদর্শবাদী তথা নীতিনিষ্ঠ যে গোপালের কৃতকর্মের অঙ্গারগুলো সে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করে। হয়তো সফল শশী হয় না, কিন্তু তার জন্য সে দায়ী নয়। তার এই চেষ্টাকে আমরা বিফল ভেবে দূরে ঠেলতে পারি না একেবারেই। আমরা কি সবকাজে সবসময় সমান সফল হই? সফলতাই কি জীবনের একমাত্র মাপকাঠি? চেষ্টার কি কোন মূল্যই নেই? আমরা প্রথমেই তো আগুন জ্বালাতে শিখি নি, পাহাড়ে চড়তে পারি নি। প্রথমেই কি আমরা চাঁদে পৌঁছেছিলাম? চেষ্টা ক'রতে ক'রতে, হোঁচট খেতে খেতে, রকেট ভাঙতে ভাঙতে তবে তো, এই সভ্যতার জন্ম হয়েছে। কত পাথর ঠুকেছি, তবে তো আগুন জ্বলেছে। শশী পথপ্রদর্শক, তাকেই যে লক্ষ্যভেদ করতে হবে, তার তো কোনো কথা নেই। 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।' তবু সাহস জোগায় ক'জন? চেষ্টা করে ক'জন?

আমরা শুধু সাফল্যটুকু দেখি, কিন্তু তার পেছনে যে র'য়েছে কতশত সৈনিকের রণক্লান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস, তা দেখি না, দেখতে চাইও না, এ আমাদেরই অপরাধ, আমাদেরই অবিবেচক খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক। শশী এই রণক্লান্ত সংগ্রামী। তাই বিন্দুকে সুস্থ সামাজিকতায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েও শশী ব্যর্থ হয়। মনে মনে বিন্দু যে নন্দের তৈরী করা আবহাওয়ার সাথে মিশে গিয়েছিলো, অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলো নেশার মদিরায়, শশী এটা বুঝতে পারেনি। বিন্দুও বুঝতে পারেনি নাগরিক বৈভব ও বিলাস ছাড়া সে বাঁচবে না। তার সমস্ত রক্তের সাথে মিশে যাওয়া রক্ষিতার নষ্ট জীবনকে সে অনুভব ক'রতে পারলো গ্রামে এসে। শশীও বুঝলো তা। বিন্দু সম্পর্কে শশীর মনে একরকমের বৈরাগ্যের ভাব এলো। দেখাদিল উদাসীনতা। বিন্দু যখন প্রথমবার মদ খেলো, শশী যখন শুনলো বিন্দু মরে যাচ্ছে, তখন শশী অনুমান ক'রলো বিন্দু বিষ খেয়েছে। শশী তখন ভাবলো, '... বিন্দুর এ ইচ্ছা সফল হইতে দিলে মন্দ হয় না। ... কিন্তু কী হইবে বাঁচাইয়া? বিন্দু ছেলেমানুষ নয়, জীবন সম্বন্ধে দুষ্প্রাপ্য অভিজ্ঞতা তাহার, ভাবিয়া চিন্তিয়া দুঃখের হাত এড়াইবার চরম পন্থাই সে যদি অবলম্বন করা ঠিক করিয়া থাকে, বাধা দেওয়া কি উচিত হইবে?' কিন্তু এই ভাবনা পলকের জন্য। পরমুহূর্তেই শশীর এই ঔদাস্য কেটে যায়। বিন্দুর এই মাতলামির জন্য শশী তার ওপর রাগ করে না— 'বিন্দুর উপরে কিন্তু তাহার রাগ হইল না।' বিন্দুর এই ঘটনাটায় গ্রামে যে কলঙ্ক রটে, তারজন্য শশী নিজেকে অপরাধী মনে করে। 'বিন্দু যে বীভৎস কীর্তি করিয়া লোক হাসাইয়াছে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অকথ্য দুর্নাম রটনা হইতেছে, এ জন্য শশী নিজেকে অপরাধী মনে করে। তারই দোষ। যে-বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভ্যাস্তাইয়া যায়।' এইখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি মন্তব্য করেন যার সূত্র ধরে নিয়তির অবিরাম প্রবাহের

স্বপক্ষে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা রসদ পেয়ে যান। 'একটি অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে।' নিয়তি সম্পর্কিত আলোচনার সময় এই কথার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা যাবে। শেষপর্যন্ত শশী পরাজয় স্বীকার ক'রে নেয়। বিন্দুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেই ভালো না লাগা অপছন্দের গলিটাতে। সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত ভেঙে মদ ঢেলে দেওয়া সেই লোকটার জিম্মায়। শশী চেয়েছিলো বিন্দুর অন্তর্লোকের জলবায়ুটাকে স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলতে। ক'রতে গিয়ে দেখলো অন্তরটা তার উত্তেজনাময় অস্বাভাবিক বিলাসিতায় মশগুল, বিন্দুর-ও নিজস্ব ঘৃণা আছে, আছে আত্মগ্লানির আধমরা মলিনতা, তবু তার দুর্বল মানসিকতা নেশার অভ্যাসকে ছাড়তে দিলো না। আমরা যখন কোনো কিছুতেই মারাত্মক রকমের অভ্যস্ত হ'য়ে উঠি, তখন সেই অভ্যাস ছাড়তে গেলে সুদৃঢ় মানসিকতার প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা ও হতাশায়, লজ্জা-দুঃখ ও অনুতাপে বিন্দুর মনের জোর নিস্তেজ হয়ে গেছে।

মনের জোর আসে আশায়, ভরসায়। গোপাল বিন্দুর কোনো খবর-ই রাখেনি। না গাওদিয়ার থেকে না কলকাতার থেকে বিন্দু কোনো রকমের আশার আলো দেখে না। তার মনের সবটুকু জুড়ে অনেকদিনের ব্যথা। শশী যখন তাকে সুন্দর ও অপূর্ব মনোলোক উপহার দিতে চায়, তখন দেরি হ'য়ে গেছে অনেক। তাই শশী ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা নিয়তির মায়ায় নয়, পরিবেশের প্রতিকূলতার কারণে। কেউ কী চেষ্টা করলেই সবকিছু ক'রতে পারে? শশী তো প্রথমে বুঝতেই পারে নি, অসভ্য গলিটার নোংরামিটা মিশে গেছে বিন্দুর জীবনে, যদি পারতো, তাহলে হয়তো নিয়েই আসতো না তাকে গাওদিয়ায়। বিন্দুর এই পরিবর্তনটা পরিবেশের ফলেই। নগরের পরিবেশ এমনিতেই শোষণমূলক। সেখানে প্রাণের সজীবতাগুলো সব বিশীর্ণ হ'য়ে যায়। নগর অজগরের মতো এতোটাই গিলে ফেলে মানুষকে যে সেখান থেকে সুস্থ হ'য়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও থাকে না। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পে রতন চিনতে পারে না তার দিদিকে। ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও পারে না। তার দিদি বলে 'আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!' এই মহানগরেই কদমফুলের রেণুগুলো মানুষের পায়ে চাপে থেঁতলে নোংরা হয়ে যায়। বিন্দুর মতো মেয়েরাও নোংরা হয়ে যায় এখানে। নেমে আসে তাদের জীবনে সন্ধ্যা 'বিস্মৃতির মতো গাঢ়।' এই প্রয়োজনের বৃত্তহীন লোভের পরিবেশ তৈরী করেছি আমরাই। বিন্দু বা চপলার জন্য দায়ী-ও আমরাই। আমরা আমাদের-ই কাজগুলিকে কি নিয়তি ব'লে চালিয়ে দিতে পারি? শশীর ব্যর্থতা নিয়তির জন্য নয়— আমাদের জন্য।

শশীর জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে হারু ঘোষের পরিবার। হারুর মৃত্যু শশীর জীবনের বেশ কয়েকটি স্পন্দনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমতঃ হারুর মৃত্যুর পর শশী দুঃখ পেলেও 'গভীর ভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা।' দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু ধ্রুব, এই সুপ্রাচীন দার্শনিক প্রত্যয়ে শশী বৈরাগ্য কাতর না

হ'য়ে 'জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য, অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়, মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেককিছুই যেন তাহার অপচিত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনে এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।' তৃতীয়তঃ হারুর পরিবার সম্পর্কে শশীর মনে একরকমের সমপ্রাণতার সঞ্চার হলো, যার ফলে একটা আলাদা দায়িত্ববোধ তৈরী হলো; 'হারু ঘোষের পরিবারের ভালোমন্দের দায়িত্ব শশীকে কেহ দেয় নাই, তবু চিরদিন ওদের মঙ্গল করিতে চাহিয়াছে বলিয়া আপনা হইতে দায়িত্ব যেন তাহার জন্মিয়াছে।' কিন্তু এই দায়িত্ববোধ জন্মানোর কারণ কি? 'হারুর পরিবারের ক্ষতি ও বেদনা'-র প্রকৃত উপলব্ধিই কি সব? গাওদিয়ায় আরো অনেক পরিবার আছে। তাদেরও পরিস্থিতি ভালো নয়। কিন্তু সেখানে শশীর দায়িত্ব অনেকটা ন্যায়-নীতি সাপেক্ষ, হারুর পরিবারের মতো সমপ্রাণতার নিবিড় সখ্য সেখানে দেখা যায় না। আসলে সেখানে যে কুসুম নেই, তার সুবাস নেই। শশীর কাছে হারুর পরিবার যেন 'সুবজ ঘাসের দেশ' 'দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর।' কুসুমের চোখ তো পাখির নীড়', আর শশী দিশাহারা নাবিক। শশী সেই আশ্রয়ের নীড়ে মনের হাওয়াবদল ঘটায়। কুসুমের প্রতি তার তৃপ্তিদায়ক আকর্ষণ এই দায়িত্ব নেওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। এছাড়া পরান শশীর খুব ভালো বন্ধু। বন্ধুত্বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যারা পরস্পরের মধ্যে ত্যাগ বা বিচ্ছেদ সহ্য ক'রতে পারে না, তারা বন্ধু— 'অত্যাগসহনো বন্ধু'। সুতরাং হারুর মৃত্যুতে সংসারের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এবং তার ফলে যে পরান বেশ অসহায় হ'য়ে পড়েছে, এই অসাময়িক বিপন্নতার কথা ভেবে শশী যথার্থ বন্ধুর মতোই পরানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তাই দেখা যায়, কুমুদের বোহেমিয়ান সত্তার ঝোড়ো চাহিদাকে অমঙ্গলজনক ভেবে শশী মতিকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছে। কুসুমের 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল' প্রেমকে স্বীকৃতি জানাতে পারেনি। তার ওই একটিই কারণ, দায়িত্ব ও বন্ধুত্ব। আমরা যেমন আমাদের অবিচ্ছেদ্য কোনো বন্ধুর সামান্যতম ক্ষতিও ক'রতে পারি না, শশী-ও তাই পরানের অসহায় অবস্থান ও তার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের কথা ভেবেই কুসুমের সুবাসে মাতোয়ারা হ'তে পারেনি। প্রথমে মতির কথাই ধরি। যৌবনে সেই রঙিন হ'য়েছে সে। মাঝেমাঝেই যাচ্ছে তালপুকুরে, উতলা ক'রে গা, মজা পাচ্ছে খুব। তালপুকুরের নির্জনতায় রোমান্স তার ঐটুকুই। যৌনতার এই রোমান্টিক খেলায় শশী এসেছে তখন যখন মতি-র খেলা জমছে না একা একা। তাই শশীকে নিয়ে শুরু হয়েছে তার স্বপ্নিল রোমান্স। শশীর কাছে মতি বোনের মতো, বন্ধুর বোন সে বোনই হবে, লেখক-ও তাই জানাচ্ছেন, 'মতির জন্য তার মনে বাৎসল্য মেশানো এক প্রকার আশ্চর্য মমতা আছে।' কিন্তু মতিকে কেন্দ্র করেই শিশির ভেজা ভোরের স্তিমিতালোকে শশীর মনে জেগে উঠেছিলো কাম— 'শিশিরে একপশলা বৃষ্টির মতো চারিদিক ভিজিয়া আছে।

মতির বিবর্ণপাড় শাড়ির আধভেজা কাপড়ের মতো কোমল দেখাইতেছিল। শশীর মনে হয়, শাড়ির নমনীয় স্পর্শে মতি ভারী আরাম পাইতেছে। সকালবেলা রাত-জাগা চোখে মতিকে যেন তার বয়সের চেয়ে অনেক বড়ো মনে হইতে লাগিল। ওকে দেখিতে দেখিতে সকালবেলা বিড়ি টানার আলস্য আরও মিষ্টি লাগিল শশীর।' এই দর্শকামে শশীর চরিত্রে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তা হ'লো তার রূপমুগ্ধতা। সেনদিদি, পাগলদিদি, ও মতির ক্ষেত্রে একথার প্রমাণ মিলবে। সেনদিদিকে প্রথমে দেখেই তার অনবদ্যরূপে বসন্ত যে কলঙ্ক লাগিয়ে দেবে, শশী তার জন্য দুঃখ পেয়েছিলো; তাছাড়া রূপসী সেনদিদির সঙ্গস্বাদও শশী পছন্দ করতো— 'গ্রাম্য রমণীর আবেগপূর্ণ মমতায় সেনদিদি শশীকে আকর্ষণ করিত বটে এবং লাবণ্যবতীর স্নেহ স্বাভাবতই মানুষ একটু বেশি পছন্দ করে বলিয়া সে মমতা দামিও ছিল শশীর কাছে।'

পাগলদিদিকে দেখেও শশীর মনে ভেসে উঠেছে রূপকল্পনার আবিলতা। 'আঙুর খাইতে খাইতে শশী পাগলদিদির মুখখানা নীরবে দেখিতে থাকে। রেখাগুলিকে তাহার মনে হয় কালের অঙ্কিত চিহ্ন— সাংকেতিক ইতিহাস। কী জীবন ছিল পাগলদিদির যৌবনে? শশী তখন জন্মে নাই। ন্যুব্জ বিশীর্ণ দেহটি যখন সুঠাম ছিল, মুখের টানকরা ত্বকে যখন লাবণ্য ছিল, তখন পাগলদিদি— মুখের রেখায় আজ কি তাহা সে পড়িতে পারিবে?' এই রূপানুভূতির আবেদনে শশী নারীদের সম্পর্কে একটু কমনীয় মনোভাব পোষণ করে। নন্দলাল সম্পর্কে শশী যতোটাই বিরক্ত, বিন্দুর সমস্ত মালিন্যকে মেনে নিয়েও শশী তার প্রতি রুষ্ট হ'তে পারে না। একইভাবে যামিনী কবিরাজের পাশেই সেনদিদি, কুমুদের পাশে মতিকে যেন একটু বেশি হাল্কা কোমলতার চোখে দেখে। যাদব পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করলেও পাগলদিদির সম্পর্কে শশীর মনে একটা আলাদা সহানুভূতির মায়া তৈরি হ'য়ে যায়। বাসুদেব বাঁড়ুজ্যেকে যতো বিশ্রী লাগুক, তার বিধবা বউটি সম্পর্কে শশীর মন করুণায় ভ'রে যায়। কুসুমের আবেদন তো আছেই। নারীদের নিয়ে শশীর এই স্বতন্ত্র আবেদন যতোই সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যকারণের সাথে গ্রথিত হোক না কেন, সেখানে অল্প হলেও তার যৌন মনস্তত্ত্ব সক্রিয়, এটা বলা যায়। আসলে শশীর কামনাম্লাত স্বপ্নে একটি নারীর দামি ব্লাউজে ঢাকা বুক, তার যুগলস্বর্গে ক্ষণিকের অধিকার ও তার চরিতার্থতার বাসনা লক্ষ্য করা যায়। এই অবদমিত কাম ক্লান্ত অলস রাতজাগা চোখে মতির মিষ্টি রূপের মৌতাতে জ্বলে ওঠে। শশী যখন মতির সাথে কথা বলে তখন তার গেঁয়ো স্বভাবে বিশেষকিছুই ফুটে ওঠে না। কিন্তু পরক্ষণেই শশীর মনে হয়, 'এমন গেঁয়ো স্বভাব, দেখতে তো গেঁয়ো নয়?' এই রূপানুভূতির অলস চোখ মতির কামিনী মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। মতি ভাবে, 'শেষের দিকে ছোটোবাবু আমাকে কী করে দেখছিল? আমাকে দেখতে দেখতে কী ভাবছিল ছোটোবাবু? 'কী'— অনাবশ্যক দীর্ঘ নয়, বিস্ময়ের মূক শিহরণ ও অবতারণা। শশীকে কেন্দ্র ক'রে কুসুম যখন মতিকে

চিমটিকাটা কথা বলে, মতি তখন যতো অস্বীকারের বাহানাই করুক না কেন, মানসিক সুখ কিন্তু পায়। শরতের দাম্পত্য নিবিড়তায় আসে কুমুদ। শশীর কাছে যে ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতীক, সেই কুমুদ যখন যাত্রার দলে ভিড়ে যায়, শশীর কাছে তখন সে অনেক নীচুস্তরের লোক। কিন্তু কুমুদের রাজকুমার সাজা, তার মনভোলানো কথায় গ্রাম্য মতি ভিজে যায়। তবুও শশীকে সে মুছে ফেলতে পারে না; কুমুদ রাজপুত্র, মহা-মহা প্রেমিক, মহাবীর্যবান, কিন্তু মতির কাছে শশী 'পৃথিবীর সেরা লোক'। কুমুদ যখন শশীকে নিজের মনের কথা জানায়, শশী বিস্মিত না হ'য়ে পারে না। শশী খুব ভালো ক'রেই জানে যে কুমুদের এই নীড়প্রেম সাময়িক, শহুরে কুমুদ গেঁয়ো মতির সাথে কম্প্রোমাইজ্ ক'রতে পারবেন না, তাছাড়া কুমুদের ছন্নছাড়া অনিশ্চিত বোম্বেটে জীবনে মতিও টিকতে পারবে না; তাই শশী কুমুদের এই ঝোড়ো খেয়ালের গতি পরিবর্তনের জন্য মতিকে নিজে বিয়ে করতে চায়। এই বিয়ে ক'রতে চাওয়ার মধ্যে দায়িত্ববোধের প্রশংসাযোগ্য সার্টিফিকেট থাকলেও মতির কচি যৌবন-ও শশীর রূপানুভূতিতে কাজ ক'রে থাকতে পারে। মতিকে বোঝানো কিন্তু শশীর কাছে মারাত্মক কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলো না। শশী পরানকে দিয়েও কুমুদের ইচ্ছেটা ভেস্তে দিতে পারতো। বিশেষত মতি বা পরান শশীকে বিশ্বাস করে খুব। পরান তো শশীর ওপর নির্ভরশীল ও একান্তই অসহায়। আর মতির কাছে শশী তো অদ্বিতীয় পুরুষ। কিন্তু শশী মতি বা পরান কাউকে দ্বিতীয় কোনো উপায়, অন্য ভালো পাত্র বা অন্য কোথাও বিয়ের কথা বলে না, বলে কেবল কুসুমের কাছে, যার কাছে ব'লে শশী তৃপ্তি পায়। কুমুদকে কুসুম যা চেনে ও জানে তার ওপর নির্ভর করে তার সাথে আলোচনা অর্থহীন। আসলে শশীর সমস্যাটা অন্য জায়গায়, যেটা স্বচ্ছ ক'রে সে কখনোই কোথাও প্রকাশ ক'রতে পারবে না। মতি শশীর কাছে বোনের মতো একথা সত্য; কিন্তু এটাও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সত্য যে, মতির রূপটিকে শশী কুমুদের হাতে সঁপে দিতে চায় না। একথার সমর্থন মিলবে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যখন কুমুদের প্রেমে বুঁদ মতির রাঙা রূপ দেখে শশীর মনে হয়: 'খনিগর্ভের হীরার মতোই বটে মতি'—, তাকে একদিন অনুপমা ও জ্যোতির্ময়ী করিয়া তোলাও সম্ভব, কিন্তু কুমুদ তাহা পারিবে না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার প্রতিভা আছে কুমুদের,— স্বপ্নকে সফল করিবার তপস্যা নাই। ... মনটা শশীর খারাপ হইয়া থাকে। কুমুদের প্রতি সে বিতৃষ্ণা বোধ করে সীমাহীন।' এখানে দায়িত্ববোধ বা মাঙ্গলিক চিন্তাভাবনার প্রকাশের বদলে ফুটে উঠেছে নবাঙ্কুরিত মতির রূপের জন্য চিন্তাভাবনা। এই রূপানুভূতির সূত্র ধরেই শশীর মনে দেখা দিয়েছে মতির অন্য আর একদিনের জীবন ও তার কুসুমিত পেলবতা। স্বপ্নকে সফল করার তপস্যা কুমুদের নেই একথা সত্য, কিন্তু তার পরেই দেখা দিয়েছে বিতৃষ্ণা। কেন? মতি সম্পর্কে শশীর ভাবনাটা যদি দায়িত্ববোধের জায়গাতেই পড়ে থাকতো, তাহলে একটু বাড়াবাড়ি আচরণ হতো। যে বিবাহের মধ্যে পারিবারিক কোনো বাধা নেই, সেখানে নেহাত কর্তব্যের

খাতিরে শশীর তাতে বাধা দেওয়া মানায় না। অন্যদিকে শশী এতোটা জানল কি করে যে কুমুদ মতিকে নিয়ে স্বপ্নের নীড় বানাতে পারবে না। কুমুদ সম্পর্কে শশীর এই মনোভাব যদি কর্তব্যের নিরিখেই হয়, তাহলে তা ঠিক নয়। বিয়ের পর স্বভাব চরিত্রের বদল তো হতেই পারে। কাজেই সামাজিক ন্যায়-নীতির বিচারে শশীর এতোটা অসন্তোষ একটু আতিশয্য বইকি। কিন্তু আসলে যে তা নয়। মতি সম্পর্কে শশী খুব একটা আবেগপ্রবণ নয়, যতোটা কুসুম সম্পর্কে। কিন্তু কুমুদ মতির মতো সুন্দরী তিলোত্তমাকে গ্রহণ করবে, শশী এটা মেনে নিতে পারছে না। আমরা যেমন বন্ধুর অপকারও করতে পারি না, ঠিক তেমন বন্ধুর সাফল্যও আমাদের দুঃখ দেয় মারাত্মক যদি না আমরা সেই সাফল্যকে স্পর্শ করতে পারি। এই সাফল্যহীনতা থেকেই সীমাহীন বিতৃষ্ণা। যে রূপানুভূতিতে শশী মশগুল তারই আবেশে শশীর মনে হয় 'মতির মুখের পেলব ত্বকে দুদিনে সে দুঃখের রেখা আঁকিয়া দিবে।' 'পেলব ত্বকে' এই শব্দদুটিতে দৈহিক সচেতনার সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। কোথাকার পেলব ত্বক? মুখের। এই মুখ শশী দেখেছিলো মতির অসুস্থতার সময়— 'শশী মতির মুখের দিকে তাকায়'।

ভাঙা লণ্ঠনের রাঙা আলোতে মতির রং যেন মিশিয়া গিয়াছে।' দ্বিতীয় বাক্যটি স্বতন্ত্র, আলাদাভাবে উপন্যাসের শরীরে ঝুলছে। এটার একটা আলাদা আবেদন আছে। এছাড়া এই দেখাটাও মর্ষকামের, মতি তখন শ্বাস নিচ্ছে, জোর কদমে, স্টেথোটা তার বুকে, আর ডাক্তার শশী দেখছে। 'রাঙা আলো' কথাটা সেই রক্তিম কামনাকেই রাঙিয়ে তুলছে। মতির সমস্ত স্নায়ুতে বিপরীত স্পর্শের অগ্নিবন্যা আর শশীর চোখে ফুটফুটে একটি তরুণীর লাল মুখ। কিন্তু শশী সংযমী। তাই ওইখানেই তার পরিসমাপ্তি। কুসুম কিন্তু চিনে ফেলে এই হাওয়াটা। তাই সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে 'অত পরীক্ষে কীসের?' শশী কি একটু বেশিই পরীক্ষা করছিলো? মনে রাখতে হবে, শশী মতিকে পরীক্ষা ক'রতে গিয়েছিলো সন্ধ্যাবেলায়, মতির ঘরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, লণ্ঠনটিও ভাঙা— পুরো আবহাওয়াটা যৌনগন্ধী। কুসুমের ওই ঝাঁঝটা কিন্তু সহজ নয়। শশীর ওই পেলব ত্বক ভাবনাটাও সহজ নয়। এরপরই শশী কুমুদ সম্পর্কে একটু নোংরা ধারণা পোষণ করে, ভাবে, 'হয়তো মতির বুকভরা প্রেমই শুধু নয়,— কুমুদকে বিশ্বাস নাই, জীবনটা কুমুদের আগাগোড়া অসংগতিতে পরিপূর্ণ।' বোঝা যায়, শশী ভাবছে, হয়তো কুমুদ মতির বুকভরা রূপের জন্যই বিয়ে করতে চাইছে। যারা অন্যের ভালো চায়, তাদের মনে এই সমস্ত খারাপ চিন্তাভাবনা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই শশী-ই যখন কুসুমকে বলে 'কুমুদ অবশ্য একেবারে অমানুষ নয়, রোজগার পতিও মন্দ করে না—' তখন শশীর ভাবনায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে যায়। কুসুমের সাথে কথা বলেই শশীর মনটা হাল্কা হ'য়ে যায়। বিয়েটাকে সে সমর্থনও করে নয়। এক তীব্র মানসিক বিকার থেকে মুক্তি পায় শশী। সেনদিদি— পাগলদিদির মতো মতিও চলে যায়, দেহ ছেড়ে নয়, দেহ নিয়ে অন্য দেহের সাথে মিশে যেতে। শশীর

কাছে পড়ে থাকে খালি কুসুম।

আমরা আগেই বলেছি, শশীর কাছে কুসুম 'সবুজ ঘাসের দেশ', 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।' শারীরিক ও মানসিক ভাবে শশী যখন হ'য়ে পড়ে 'ক্লান্ত প্রাণ এক' কুসুমের 'পাখির নীড়ের মতো' স্বস্তির ঠিকানায় 'দু-দণ্ড'-ও শান্তি পায় সে। শশী তো সত্যি করেই হালভাঙা নাবিক। পৌঁছতে পারেনি তার স্বপ্নে ভরা সাত রাজার ধন মানিকের দেশে। সব নাবিক কি পারে, সব্বাইকে পৌঁছতেই হবে; সেই দিশাহীন ঝোড়ো পথে, জীবন সমুদ্রের মায়া-মরীচিকায় উদভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত শশী কুসুমের গন্ধে ভরে নেয় মন; কিন্তু কুসুম তো সমুদ্র মরীচিকা, সে তো—

'একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতারধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে
স্থির।'

কুসুম ওই নদীর জলের ছায়া। তাকে ছুঁতে চাইলেই তার সমস্ত স্থির অস্তিত্ব বিপন্ন-বিষন্ন। যে চিত্রকল্পের অনিবার্যতা দিয়ে শুরু হয়েছিলো নায়কের পথ চলা, যেখানে মিশে ছিলো স্বপ্নভঙ্গের দারুণ শিহরণ, তারই সর্বোচ্চ উপস্থিতি কুসুমকে কেন্দ্র করে দেখা দেবে, ফুটে উঠবে নিষ্ঠুর-নির্মম ট্রাজেডি।

উপন্যাসের শরীরে শশী কুসুমকে প্রথম দেখেছে সন্ধ্যাবেলায়, আলো-আঁধারের অস্বচ্ছ মুহূর্তে, যখন সে গিয়েছে মতিকে দেখতে। মতির অসুস্থতায় কুসুম চিন্তিত নয় একেবারেই। আরো লক্ষ্যণীয়, শশী আসার পর কুসুম অপ্রস্তুত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। যে কাজগুলো না করলেও চলতো, তাই করেছে। ভারী জলচৌকি অবলীলায় তুলে নিয়ে শশীকে বসতে দিয়েছে, মিথ্যে কথা বলেছে, মতি ওষুধ খায়নি, তবু বলেছে মতি ওষুধ খেয়েছে; শশীর তখন মনে হয়েছে, ধরা পড়বে জেনেই কুসুম এই সরল মিথ্যে কথাগুলো তার কাছে বলে। 'এ যেন তার একধরনের পরিহাস। কালোকে সাদা বলিয়া আড়ালে গিয়া সে হাসে।' কিন্তু কেন? এই আটপৌরে পরিহাসের কারণ কি? মনে রাখতে হবে, কুসুম 'তেইশ বছরের বাঁজা মেয়ে।' বিয়ে হ'য়েছিলো তার চোদ্দ বছর বয়সে। সেটা তখন ফুটে ওঠার রঙিন সকাল। সে-সময়েই হঠাৎ করেই অপরিচিত শ্বশুরবাড়িতে এসে পড়ায়, সাংসারিক কাজের চাপে, মানিয়ে নেওয়ার অতিরিক্ত দায়িত্বে কুসুমের 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ'-এর মতো নেশালু যৌবন থেকে একটু একটু ক'রে পিছলে যাচ্ছিল বিচ্ছুরিত রোমান্স। আরো লক্ষ্যণীয়, পরান রুগ্ন, 'সব বিষয়ে উদাসীন।' আর কুসুম শক্তপোক্ত, এবং তেইশে পৌঁছেও সে সন্তানহীনা। একটি যৌবনস্নাতা নারী, দেহে ও মনে সন্তানহীনতার কারণে যার অতৃপ্তি আসা স্বাভাবিক, সেখানে নতুন কোনো পর-

পুরুষ তার দেহে ও মনে উষ্ণ চাঞ্চল্য নিয়ে আসতে পারে, এ-কথা মনস্তাত্ত্বিক বিচারে সত্য। অন্যদিকে, পরানের সাথে কুসুম মনখুলে কথাও বলে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা, যেখানে মিশে থাকে হার্দিক সুখ ও ভালোবাসা, সে রকম কোনো ছবি আমরা পাই না। পরানকে কুসুম কেমন যেন অবহেলা করে। সারাদিন পরিশ্রমের পর পরান সন্ধ্যা বেলায় হ'য়ে পড়ে ক্লান্ত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে এমনই একটি ছবি আছে যেখানে মতি ও কুসুম কুমুদের যাত্রা দেখার জন্য সন্ধ্যার সময় যত ব্যস্ত হয়ে পড়ে 'সে যেন ততই ঝিমাইয়া যায়।' রান্নাঘরে বসে দৈহিক ও মানসিক (যাকে বলতে পারি স্নায়বিক) আলস্যজনিত কারণে কুসুমের সাথে পরান একটু গল্প জমাতে চাইলেও 'কুসুম তাহাকে আমল দেয় নাই।' এই আমল না দেওয়ার কারণ সে-সময় হয়তো সময়াভাব, যাত্রা দেখার তাড়া। কিন্তু এরপর লেখক যা জানান, তা মারাত্মক: 'কুসুমের ভর্ৎসনায় চিরকাল পরানের খারাপ লাগে।' কুসুম কি ঠিক কাজ করে? পরানের অসহায় অবস্থানের নিরীখে কুসুমকে ক্ষমা করা যায় না। হয়তো পরান তার ঔদাস্য ও বৈরাগ্য দিয়ে কুসুমকে তৃপ্ত ক'রতে পারে না, তার মনটা বুঝতে পারে না, এর জন্য কুসুম বোধ করে নির্জনতা। সেজন্য ঘরের কাজে মন না বসলে খিড়কি দরজা দিয়ে সে বের হ'য়ে যায়। তারপর 'তালবনে তালপুকুরের ধারে ভূপতিত তালগাছটার গুঁড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে।' কি ভাবে কুসুম? আসলে ওই সঙ্গীহীন জায়গাটায় চুপচাপ বসে থাকার মধ্যে তার অন্তরের নিঃসঙ্গতা দুলে ওঠে। তার মনে হয় শশী সেই সঙ্গী, যে পারবে মুছে দিতে তার একাকীত্ব, তার তরমুজ মদের মতো যৌবনের তীব্র দাহ, আর তার মনের ক্লান্তি। তাই শশীকে দেখে, কথা বলে, তার সামনে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখিয়ে কুসুম স্বস্তি পায়। কুসুম সত্যিই মিছে কথা বলে। কিন্তু এই মিছে কথায় আছে মানসিক তৃপ্তি ও সুখ। কিন্তু কুসুম শশীর কাছেই তার অন্তরের দুর্বলতা অনুভব করে কেন? শশীর কাছে সে কি এমন ইঙ্গিত বা স্পন্দন পেয়েছে যার জন্য তার মন এমন উদ্বেল। ইঙ্গিত যে পেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই; কিন্তু কুসুম সম্পর্কে শশীর কোমল অবস্থান তার সার্বিক দুর্বলতাকেই চিনিয়ে দেয়। 'গড়গড় করিয়া মুখস্থ বুলির মতো একরাশ তোষামোদের কথা কুসুম বলিয়া যায়' শুনিতে মন্দ লাগে না শশীর। কত বছর আজ সে কুসুমের এমনি পাগলামি দেখিতেছে। ওর এইসব খাপছাড়া কথায় ব্যবহারে একটি যেন মিষ্টি ছন্দ আছে।' 'কত বছর আজ'— অনেক বছর ধরে, একরাশ তোষামোদের পাগলামিগুলিকে, খাপছাড়া কথার আনাগোনায় শশী বারবার স্বাদ পায় সেখানে মিষ্টত্ব। এই মিষ্টত্ব প্রেম নয়তো কি। শশীর মনের এই স্পন্দনটা কুসুম বুঝতে পারে। শশীর চুপচাপ শুনে যাওয়া, 'আমাকে না হয় দাও দুটো গাল' এই রকম আত্মনিবেদনের সুরে কুসুম স্পন্দিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই কথা ঘুরিয়ে ফেলে সে। 'পরানের বউ' এই ডাক তার কাছে আহ্বানসূচক বলে মনে হয় না। তার গোসা হয় খুব। সে চায় শশী নামধরে তাকে আহ্বান করুক। কুসুম নামটিও তো

প্রেমময়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বেগুনখেতে ঘটে চলা এই লিরিকে মূর্ত হ'য়ে ওঠে কুসুমের অনাবিল নিবিড় রোমান্স। এখানেই মানিক বাবু একচিলতে দেখিয়ে দেন, ওই লিরিক্যাল রোমান্সের 'নির্জন স্বাক্ষর', যেখানে শশী চলে যাওয়ার পর, অন্ধকার বেগুনখেতে দাঁড়িয়ে সামনে গাছের মাথায় একটু চাঁদের আভা দেখার আগ্রহে নেচে ওঠে কুসুমের মন। 'লাজরক্ত' হ'য়ে যায় সে। মানিক বাবু লেখেন: 'কে সে কিশোরী, ভিনদেশি পুরুষ দেখিয়া যার লজ্জাতুর প্রেম জাগিত? সে কুসুম নয়, হে ভগবান, সে কুসুম নয়।' সে তো কুসুম-ই। যে রোমান্স 'বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—/ নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে/ কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।'— তা-ই নিবিড় হ'য়ে উঠছে কুসুমের মনে। তবুও মনোবয়নের মারকামারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বলে নেই নাকি কুসুমের মন। রোমান্স হয় কোথায় তারা তা জানে কি?

নিজের সংসারটি নিয়ে কুসুমের তেমন কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। তোয়াক্কা করে না সে কাউকে, একরকমের অসংযম ও অসামঞ্জস্য, অসংলগ্ন ও অবাধ্য আচরণে সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টিছাড়া হ'য়ে যায়। রান্নার সময় বাইরে চলে যায়, জেনেই সে যায় যে চুঁয়ে যাবে তরকারি, কখনো পুড়ে যাওয়া ডালের হাঁড়ি সে সচেতন ভাবেই উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে, হল্লা করে যখন পরান, রূঢ় বাক্যস্রোতে ভাসিয়ে দেয় যখন মোক্ষদা; বুঁচি, মতি যখন হইহই করে, তখন 'কিন্তু কী নির্বিকার কুসুম!' মুহূর্তেই হাসিমুখে বাইরে আসে। দাঁড়ায় শশীর কাছে। বলে, 'জ্বর এল না কি, দেখুন দিকি ছোটোবাবু।' জ্বর তার আসে নি। জ্বর এসেছে তার মনে। শশীকে দেখলেই সে যেন কেমন একরকম হ'য়ে যায়। হঠাৎ করেই কলশি নিয়ে স্নানে যায়। ভিজে কাপড়ে উঠোনের রোদে পায়ের ছোপছিটিয়ে পুবের ঘরের ছায়ার মধ্যে ডুবে যায়। শশী তখন সুদেবের সাথে মতির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আধখানা মন নিয়ে ব্যস্ত। আর আধখানা পড়ে থাকে কুসুমের দিকে। 'পরানের কথা শুনিতে শুনিতে প্রতি মুহূর্তে শশী আশা করে— পুবের ওই ঘরের ভিতর হইতে হয়তো দু চোখে গাঢ় স্তিমিত ছায়া সঞ্চার করিয়া কুসুম হঠাৎ বাহির হইয়া আসিবে,—...' শশীর কল্পনায় কুসুমের চোখের গাঢ় স্তিমিত ছায়ার সঞ্চারে যে নেশালু মাদকতা আছে তা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অন্যদিকে কুসুমও রান্নাঘরে রান্নাচড়িয়েও শশীর প্রত্যেকটি কথার উৎসাহব্যঞ্জক আস্বাদনে রান্নাটাই পুড়িয়ে দেয়। তারপর স্থির থাকতে পারে না। চলে আসে শশীর কাছে জ্বর আসার নাটক নিয়ে। সে যে প্রেমজ্বর। যে জ্বরে পুড়েছিলো একদিন শকুন্তলা, 'সমন্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-

নর্তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥'

শকুন্তলা বা কুসুম দুজনের এই অবস্থায় কাম ও প্রেম প্রকাশিত। এই কাম ও প্রেমের প্রকাশ অসাধারণ ব্যঞ্জনার সাহায্যে খুব অল্প কথায় মানিকবাবু চতুর্থ পরিচ্ছেদে ফুটিয়ে তুলেছেন। সময়টা তখন কার্তিক মাস। অর্থাৎ শরৎকাল। যে কালে দাম্পত্য বোধন হয়,

সেই কালে তালপুকুরে হলুদ রংয়ের একটা ঢোঁড়া সাপ ছোবল মারলো কুমুদকে। সেই পুকুরে নগ্ন হ'য়ে স্নান করছিলো মতি। সাথে ছিল কুসুম। কুমুদের আর্তনাদে 'ভিজা শরীরে শুকনো কাপড়টা কোনোমতে জড়াইয়া' ছুটে এলো মতি। খানিক পরে এলো কুসুম। মৃত্যুভয়ে ভীত কুমুদ মতিকে শশীর কাছে যেতে বললো। এরপর কুমুদের সাথে কুসুমের যে কথোপকথন হ'লো সেখানে কুসুমের কথায় যৌন মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। 'ঢোঁড়া সাপের বিষ থাকে না কেন' এই প্রশ্নের উত্তরে কুসুম বললো:

> 'সব সাপের কি বিষ থাকে? ঢোঁড়া হল জলের সাপ।
> আমায় একবার কামড়ে ছিল। হয়তো ওই সাপটাই হবে
> হবে! একদিন খুব ভোরে এই পুকুরে নাইছি,
> বেড়াতে বেড়াতে ছোটোবাবু এসে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে
> গল্প করতে লাগলেন। এমনি সময় সাপটা এইখানে
> কামড়ে দিল, কুসুম তাহার লিভারটা দেখাইয়া
> দিল' তাহার বোধ হয় ধারনা ছিল মানুষের হৃদয়ের
> অবস্থানটা ওইখানে, ছোটোবাবুকে বললাম, সাপে
> কামড়েছে ছোটোবাবু। শুনে ছোটোবাবুর মুখ যা
> হয়ে গেল!

এখানে সাপ- বিষ- জল- ভোর ও হৃদয়— এই পাঁচটি শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাপ যৌনতার প্রতীক। যাকে আমরা বলতে পারি কাম বা কামনা। বিষ এখানে তাই কামবিষ। জল-ও যৌনতার প্রতীক। যাকে আমরা বলতে পারি প্রজনন বা সহবাসের সঙ্গম। এই জলের দেবতা বরুণ। বরুণ আবার অন্ধকার-প্রজনন ও মহাজাগতিক প্রেম বা cosmic love এর দেবতা। বরুণের কন্যার নাম বারুণী। বারুণী আবার মদ বা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং জলের সাথে কাম- কামনা- প্রজনন- ভালোবাসা ও মত্ততা মিশে আছে। সাপটি এই জলের সাপ। সুতরাং সাপটির সাথেও এই পঞ্চ উপাদান মিশে আছে। অর্থাৎ এখানে সাপটি কাম ও প্রেমের প্রতীক। ভোর এই শব্দটিতে আছে স্তিমিতালোকের আবেশ। ভোর আবার খুব ভোর। অর্থাৎ তখন পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই মিস্টি অন্ধকারে যখন 'আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল' তখন নামলো কুসুম নাইতে সেই মদমত্ত জলে। এমনি নেমেছিলো 'শিকার'-এর সেই সুন্দর হরিণটা 'নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে।' 'সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে' 'ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে' নদীর জলে ডুবিয়েছিলো 'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য।' আর ছিলো সেখানে সাধ, 'হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার' কামনা— সবই ওই শীতল নদীর জলে। জলের সাথে তাই কাম ও প্রেমের সম্পর্ক নিবিড়। সেই রামায়ণ

থেকে যেখানে পম্পার রমণীয় তীরে রামের অতৃপ্ত বিরহাতুর কাম; সেই মেঘদূত, আষাঢ়ের জলদ মেঘ, মন্দাকিনীর জল; শীলাভট্টারিকার সেই 'যঃ কৌমারহরঃ' কবিতা, রেবানদীর কোমল তীরে সুরতস্বপ্ন; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বারুণীর তীর, 'একরাত্রি' গল্পের সেই অশ্রুলবণাক্ত দ্বীপ, আর 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' তালপুকুর— সর্বত্র কাম ও প্রেমের প্রতীক হিসেবে লেখকেরা জল বা জলাশয়-কে বেছে নিয়েছেন।

এই জলে যখন কুসুম নামলো, ভোরের বেলা, শশী এসে বসলো সেখানে। শশী আসলে বসে নি, কুসুম-ই বসিয়েছে তাকে মনে মনে, শৃঙ্গার তৃষ্ণায়, কল্পনায়। শশীর বসার পরেই হলুদ রঙের সেই সাপটি তার হৃদয়কে মারে ছোবল বোঝা যায়, সাপটি ছোবল মারেনি, কুসুমের কন্দর্পপীড়িত প্রেমতাপিত কল্পনায় সাপ হ'য়ে ছোবল মেরেছে শশী ওই হৃদয়ে, ঢেলেছে বিষ, কামবিষ, তুলেছে ঢেউ, প্রেমের ঢেউ। হৃদয় তাই ভালোবাসার একলা ঘর, যার ভেতর ভরে রয়েছে ওই হলুদ সাপের বিষ। এই হৃদয় নিয়েই সে শশীকে চেয়েছে। আর আমরা ভেবেছি শরীর। মন নাকি নেই তার। 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' একজনের মন ছুঁয়েছিলো যার এই কাঁচা বয়সের মায়া, তার নাকি মন নেই? উপন্যাসে অনেকগুলি ইঙ্গিত আছে যার খেই ধরে আমরা এই মনের কথা বুঝবো।

(ক) চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ কুমুদের যাত্রা হবে রাত্রে। কুসুম ও মতি খুব উৎসুক। কিন্তু পরানের এসেছে ক্লান্তি। রান্নাঘরে বসে সে গল্প জমানোর চেষ্টা ক'রেছে। ঝাঁঝিয়ে উঠেছে তখন কুসুম। পরানের তখন মনে হয়েছে, 'চোদ্দ বছর বয়সে তার বউ হইয়া এতকাল কুসুমের শরীরটাই যেন বড়ো হইয়াছে, মনের বয়স বাড়ে নাই।' তাই কুসুমকে তার ভারী 'ছেলেমানুষ' বলে মনে হয়। পরানের চোখে তাহলে কুসুমের মন আছে। তবে তা কাঁচা, পাকা নয়। কিন্তু সত্যিই কি কাঁচা? যে মন বুঝে নেয় মতির নির্জন যৌনস্পন্দন শশীর উপস্থিতিতে, স্পর্শে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), যে মন খুঁজে বেড়ায় তালপুকুরে তার অনাবিল, প্রেমাস্পদ (ঐ), যে মন 'মেয়েমানুষের আঁচল-ধরা পুরুষকে' দেখতে পারে না দুচোখে, চাই যার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ (চতুর্থ পরিচ্ছেদ), তার মন তো কাঁচা হ'তে পারে না। আসলে পরান সরল, সাদামাটা। তাই সে তার মনকে দেখেছে তরলভাবেই।

(খ) পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ শীতকালের অন্ধকার রাত। পেটে ব্যথা কুসুমের। শশী এসেছে, দেখেছে, বাড়ি ফিরে পরানের হাতে পাঠিয়েছে ওষুধ। নিজে আর যায়নি। পরের দিন খবর নিতে গিয়ে দেখে রেগে আগুন হ'য়ে আছে কুসুম। শশী ওষুধ নিজে নিয়ে আসেনি, এই হলো তার অপরাধ। ওষুধ খেয়ে কুসুমের ব্যথা কমলেও অকৃতজ্ঞের মতো তাকে অপরাধী দেগে দেওয়ায় শশী ভাবলো, 'ওষুধ খাইয়া ব্যথাও কমিল, তবু কুসুমের মন ওঠে নাই।' শশী বিরক্ত বোধ করলো। বললো, তোমার সব বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি

আছে বউ।' কুসুম তখন খোঁচা দিয়ে সেই মতির বুক পরীক্ষার রাতটার প্রসঙ্গ তুললো, বললো, 'এক ঘণ্টা ধরে বুক পরীক্ষা, ম্যালেরিয়া জ্বর হলে, আমি করি না। চিমটি কাটা এই শ্লেষ শোনার পর শশীর তরফে লেখক জানালেনঃ 'কুসুমের মনটা শশীর বোধগম্য হয় না? পরানের কাছে মনটি তার কচি। শশীর কাছে অবুঝ। তাহলে মনটা তার কেমন?

(গ) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদেই থেঁতলেছে কুসুম গোলাপের চারা প্রথমবার। শুধু থেঁতলায়নি, দু-পায়ে মাড়িয়ে পুঁতে দিয়েছে মাটির ভেতর। চারাটি আবার পাতা মেলেছে শশীর যত্নে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার চারাটি থেঁতলেছে কুসুম। সময়টা তখন ভোর। আবছা আলো-আঁধারের মাঝে ঘুম ঘুম চোখে শশী এই থেঁতলানো ছবিটি দেখে ভাবে, 'কাঁটা ফুটিবার ভয়ও কি নাই কুসুমের মনে?' আসলে শশী ভালোবাসা বা জীবনকে করে লালন, যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে কুসুম করে দলন। জীবনকেও সে তো দলনই করে। তাই নিজেরই সংসার, নিজেরই বর, কাউকে কোনকিছুকে সে পাত্তা দেয় না। কিংবা তার এই দলন কষ্ট ভোলার জন্য। শরীরকে কষ্ট দিয়ে মনের কষ্ট কমানোর জন্য। মনের কষ্ট কমাতে আমরা কতকিছুই তো করি। তেমনি হয়তো একটা উপায় কুসুম বেছেছে। 'গীতবিতানে'র একটি গানে দেখি, সকল কাঁটা, সকল ব্যথা ধন্য ক'রে রঙিন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে ফুটে ওঠার কথা আছেঃ

'আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হ'য়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।'

কুসুম হয়তো কাঁটা ফুটিয়ে শশীর মনের বাগানে রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটে উঠতে চায়। হয়তো এটা তার কণ্টকাভিসার। ওই রাধার মতো 'কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল।' তবে রাধার পায়ে কাঁটা ফোটে নি, পা টিপে টিপে এগিয়েছে সে। তার চলায় আছে প্রাপ্তি জনিত উৎসাহ, উদ্দীপনা। কিন্তু কুসুমের? যে শশীর কাছে জীবন এতো লালিত ললিত, তার কাছে কি এই দলিত বোধ নিয়ে কুসুম পৌঁছতে পারবে? পারবে না বলেই কি গোলাপের চারাটির অবস্থান জানালার বাইরে; বাইরে থেকে দেখে শশী কুসুমকে? মনের ভেতরে নয়, মনের বাইরে অবস্থান তার? দলিত বোধ কি সেখানে পৌঁছোনোর বাধা? তাই কি জানালা? তাই কি ভোর? ওই গোলাপটি কি শশীর ভোরের স্বপ্ন? কুসুম কি সেই স্বপ্ন চূর্ণ করে, তার ঘুম ভাঙিয়ে? হয়তো তাই। তবু কুসুম আবছা আলোতেও সেই জানালা ভাঙতে চায়। তারপর দলন করতে চায় তার সমস্ত শরীর দিয়ে শশীর আশিরপদনখে।

কুসুম এসেছে ভোরবেলা বিন্দুর খবর নিতে। শশীকে নিয়ে গিয়েছে উপযাচিকা

অভিসারিকার মতো তালপুকুরে। একান্ত ব্যক্তিগত এই সাংসারিক ঘটনা শোনার আগ্রহে তালপুকুরের শৈত্য নির্জনতায় ডেকে নিয়ে আসার কারণে শশী অবাক হয়েছে। ভেবেছে, 'ও কথা সে তো যেখানে খুশি বলিতে পারিত কুসুমকে।' কুসুমকে বলেছে সে, 'ওর কথা শুনে কী করবে বউ?' কুসুম তখন সবিস্ময়ে যেন কত আপনার লোকের মতো বলেছে, 'আমাকে বলবেন না?' সব কিছু যেন তাকেই বলা যায়। তার কাছে গোপনের ফাঁকি চলে না যেন। যেন সে শশীর জোছনামত্ত সরোবরের শুভ্র রাজহংসী। কুসুমের এই সবিস্মিত কৌতূহলের খেই ধরে শশী তাকে চিনে নিল নতুন ক'রে; সে আবিষ্কার করলো:

'একটি যেন বালিকা আছে কুসুমের মধ্যে, মতির চেয়েও যে সরল, মতির চেয়েও নির্বোধ। সংসারকে দেখিয়া শুনিয়া কুসুমের যে অংশটা বড়ো হইয়াছে, এই বালিকা কুসুমটি তার আড়ালে বাস করে। ... শশী বুঝিতে পারে,. এতকাল কুসুমের যেসব পাগলামি সে লক্ষ করিয়াছে,— ওর শান্ত সহিষ্ণু প্রকৃতির সঙ্গে যা কোনোদিন খাপখাওয়ানো যায় নাই,— সেসব বহুদূর অতীতের ছেলেমানুষ কুসুমের কীর্তি,— কুসুমের এখনকার পরিণত দেহমনে যার অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন।' শশীও মেনে নিলো, একটা 'ভোরের দোয়েল পাখি' কুসুমের 'ছাতার মতো বড়ো পাতাটির' পরিণত জীবনের নিচে ব'সে আছে চুপচাপ। তাই এ-সময়েও সে মাঝে মাঝেই হ'য়ে ওঠে চঞ্চল। এই কথা ভাবতে ভাবতে শশী সেই নগ্ননির্জন দুপুরবেলাটার শুধু দুজনার ঘরটাতে পৌঁছে যায়। ভাবে তখন, 'সব তাহার মন ভুলানোর জন্য বয়স্কা রমণীর প্রণয় ব্যবহার।' কি হয়েছিলো সেই দুপুরে? পঞ্চম পরিচ্ছেদের এই দুপুরবেলার ঘটনাটি কুসুমের মনটিকে ও সেই মনের তৃষ্ণাটিকে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য ক'রবে আমাদের।

শীতকালের অনুষ্ণ দুপুর তখন। গোলাপ চারাটি থেঁতলে কুসুম শশীর কাছে অপমানজনক কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছে। শশী ক্ষমাও করেছে। তারপরই কুসুম শশীর ঘরটা দেখতে চেয়েছে। শশী জানত, সামাজিক শালীনতাবোধের বাইরে মাঝদুপুরে কুসুমকে একলাটি তার ঘরে নিয়ে আসা উচিত নয়, তবু সে বাধা দিলো না। শশী 'ভাবিল, ওর যদি বদনামের ভয় না থাকে, আমার বয়ে গেল। আমি তো ডাকিনি।' শশী ডাকে নি ঠিক কথা, কিন্তু সমাজের চোখে তার তো কোনো প্রমাণ নেই। কেউ ছিলো না সেখানে, তারা দুজন ছাড়া। কাজেই বদনাম যদি লাগতো, বাদ যেতো না শশীও তার তাপ থেকে। যাইহোক লাগেনি, কেউ বুঝতে পারেনি, লেখকও সে-দিকে নিয়ে যান নি। ঘরটিকে কুসুম এমনভাবে দেখে, যেন তার কোনো তাড়া নেই, পিছুটান নেই, বেশ অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলেই হলো। তারপর একটা চমকানো প্রশ্ন ক'রলো কুসুম,— 'এ ঘরে আপনি একা শোন ছোটবাবু?' শশী উত্তর দিলো, 'একাই শুই।' কুসুম আবার প্রশ্ন ক'রলো,— 'তা, বউ আসতে আর দেরি কত! শিগগির বাপের বাড়ি চলে যা ছোটোবাবু। আর আসব না।' 'একাই শুই' এই কথায় যে স্নায়বিক নিঃসঙ্গতার স্পন্দন আছে মেয়েমন

বুঝে যায় তার তরঙ্গটা। তাই বউ-এর প্রসঙ্গ টেনে আনে কুসুম। কিন্তু হঠাৎ করেই, তারপরেই, বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার উল্লেখে বউ আনার প্রসঙ্গ অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। বউ তখন কুসুমের যন্ত্রণার দিকটি ফুটিয়ে তোলে। তাই কুসুম বাপের বাড়ি চলে যেতে চায়। কাছে থাকলে, কাছে থাকায় যে মর্মান্তিক আত্মযন্ত্রণা আছে, বাপের বাড়ি গিয়ে তা ভুলতে চায় কুসুম। ভুলতে সে না পারলেও, শান্তি পাবে কিছুটা। আমরা যেমন আঘাত করে যে, তার দেওয়া কোনো উপহার বা তার কোন স্মৃতি ভেঙে ফেলি, তেমনি কুসুম শশীর এই সুন্দর স্মৃতিকে ভাঙতে চাইছে বাপের বাড়ি চলে গিয়ে। তবে কুসুমের মনে এই ভেঙে ফেলার পর্যায়টা এখনো দৃঢ় হ'য়ে ওঠে নি। এরপর দাওয়াতে গোপালের অসময় অতর্কিত উপস্থিতিতে অবিচলিত অভীক কুসুম ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতে বলে। আমরা জানি সেই শৈত্য মধ্যাহ্নের উষ্ণ মুহূর্তে বিপদজনক কিছু ব্যাপার ঘটে নি। কুসুম ছিলো তার মেলেধরা মনটি নিয়ে, শরীরের প্রতিটি শোষণ গ্রন্থি নিয়ে; কিন্তু পারেনি শশী পৌঁছতে সেখানে, শৃঙ্গারদ্বীপের গোলাপি আভায়। কেন পারেনি, তার উত্তর আগে দিয়েছি। এই দুপুরটার কথা ভেবেই, শশী কুসুমের প্রণয় ব্যবহারকে বয়স্কা রমণীর সাথে তুলনা করেছে। শশী ঠিক বিচার করেনি। আসলে কুসুমের মন, তার সৃষ্টিছাড়া অনিয়মিত গতি শশী বুঝতে পারছে না। শশী দেখছে কুসুমকে দু-ভাবে— একদিকে তার পৌঢ় পারাবতীতুল্য রমণীয় বাক্‌চাতুর্য; অন্যদিকে তার ছলকে ওঠা, ঝিলিক দেওয়া মেয়েবেলার খেলাকরা ভাব। শশী এই মেয়েবেলার চঞ্চল কুসুমের সাথে খেলা করতো, কিন্তু চিনে নিতে পারতো না। সে যে আসলে 'মন ভুলাইতে চাহিতেছে' শশীর, তা শশী বুঝতে পারতো না। 'তাই ভাবিত, এত বয়সেও পাগলামি গেল না কুসুমের।' এটা কি পাগলামি? কিংবা তাও বা নয় কেন? কোন ভালোবাসাটা পাগলামি নয়। সব প্রেমিকাই তো পাগলি। পাগলি বলেই তো তারা এক নিবিড় ঔদাস্যে আর অমিল আবেগে ভুল করে মাঝেমাঝেই। কি করে তারা, হয়তো বা জানে না তারা নিজেরাই। তাই তো পাগলি এই বউটা, নালিশ করাটা যার অভ্যাসে পরিণত হ'য়েছিলো, ভুলেছে আজ সে সে-সব। কেমন একটা অন্যমনস্কতায় সে বুঁদ হয়ে থাকে। একদিন ফাল্গুনি জ্যোৎস্নায়, সমস্ত অন্যমনস্কতায় সে বলে শশীকে সেই পাগলি মনের কথা,— 'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।' চলে যাওয়া এই দুর্লভ সাধের মধ্যে যে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক ক্ষুধা আছে, আর 'চাঁদনি' শব্দে আছে যে রোমান্স, তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছে কুসুমের এই পাগলামিতে। কিন্তু তখনই 'গভীর দুঃখের সঙ্গে শশীর মনে হয়, এ কথা কুসুমের বানানো। মতিকে পাছে সে আবার নিজে বিবাহ করিয়া কুমুদের হাত হইতে বাঁচাইতে চায়, তাই কুসুম এই মন-রাখা কথা বলিয়াছে।' এ-কথা কুসুমের মন-রাখা কথা নয়। এ কথা বানানো-ও নয়। আর যদি কথাগুলি হয় বানানো 'তো দোষ কি', ঠিকই তো 'হীরে বসানো সোনার ফুল কি

সত্য' 'তবুও কি সত্য নয়?' শশীর মনের এই দ্বান্দ্বিক অভিঘাতের মাঝেই পাগলি কুসুম তার কামনার গভীরতায় পৌঁছে যায়। হিমবন্ত বিবর ছিঁড়ে যেমন বেরিয়ে আসে কবেকার ঘুমন্ত নির্ঝর, ঠিক তেমন করেই কুসুমের ভেতর থেকে ছলকে এলো এই কথা,— 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?' কুসুমের এই দীর্ঘশ্বসিত কামনার পরই ভর্ৎসে উঠেছে শশীর বকলমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গর্জন।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষাংশের পাণ্ডুলিপির সাথে প্রচলিত বর্তমান সংস্করণের পাঠ যদি মিলিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে কুসুমের তীব্র মদমুকুলিত কামনার তাপটা আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। সেখানে দেখি, আকাশে তখন কৃষ্ণপ্রতিপদের চাঁদ। শিউলী গাছের তলায় জ্যোৎস্নার ছায়া। আর কুসুমের ওই কথা,— 'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা হয়, ছোটোবাবু। এই কথা বলিয়াছে কুসুম। লিক্‌পিকে মৃদু ছোঁয়াচ লাগানো ঠোঁটের নিজস্ব এই কথা।' পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে শব্দটা 'ইচ্ছা', বর্তমান সংস্করণে তা হয়েছে 'সাধ।' পাণ্ডুলিপিতে 'ইচ্ছা হয়' এর পর কমা (,) বসেছে, 'ছোটোবাবু' শব্দটা সেখানে স্বতন্ত্র। একটু থেমে, মনের এই চিরতৃষিত 'ইচ্ছা'র কথা বলার পর, যেন অনেকটা পথ অভিযানের পর একটু জিরিয়ে ইষ্ট বস্তুতে পৌঁছনো, সেইরকম 'ছোটবাবু', মানে শশী। তাই শব্দটি একটু একাকী। বর্তমান পাঠে কিন্তু কোনো ছেদ নেই। একটাই পূর্ণ যতি। পাণ্ডুলিপির এই বিরাম কেটেছে এখানে। কুসুমের তৃষ্ণা এখানে আরো বেশি, সে কোনো বিরাম মানে না। অন্যদিকে পাণ্ডুলিপির 'ইচ্ছা' বর্তমান পাঠে হয়েছে 'সাধ'। 'ইচ্ছা' শব্দে যে স্পৃহা আছে, আছে যে অভিলাষ, 'সাধ' শব্দে স্পৃহা ও অভিলাষের বাইরেও আছে কোমল সাধনা। সুতরাং কুসুমের আন্তরিক চাওয়াটা 'সাধ' শব্দেই ভালো ফুটেছে। আবার এই কথা বলার পর পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত যা আছে, ওই লিকপিকে ঠোঁট, বাদ পড়েছে তা বর্তমান পাঠে। আরো অনেককিছুই বাদ পড়েছে, কিন্তু কুসুমের ওই মারাত্মক কথাটার একটা শব্দ খালি বদলে গেছে। পাণ্ডুলিপিতে আছে, 'আপনি ছুঁলেই আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' বর্তমানপাঠে 'ছুঁলেই' শব্দটা নেই। তার বদলে হয়েছে 'আপনার কাছে দাঁড়ালেই আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?' ছোঁয়াতে যে স্পর্শানুভূতি আছে, কাছে দাঁড়ানোতে তা নেই। সেখানে আছে দৃশ্যানুভূতি। স্পর্শানুভূতিতে জৈবনিক শিহরণ প্রবল। কিন্তু দৃশ্যানুভূতিতেও সেই শিহরণ, এখানে কুসুমের কাম ও কামনার অতিপ্রাবল্য প্রকাশিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কুসুমের এই কামনার বাড়াবাড়িটা দেখেছে শুধুমাত্র, মনটার হদিস পায়নি। এই ঘটনাটির পরে কুসুমের মনের হদিসটা বারবার চিনে নেওয়া যায়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের আগেও আমরা তা পেয়েছি, পরেও পাবো।

(ঘ) অষ্টম পরিচ্ছেদ: এক গ্রীষ্মের দুপুরে কুসুম এসেছে শশীর কাছে, মতির খবর নেওয়ার জন্য নয়, আপনজনের কাছে প্রতীপূর্ণ কিছু উপহার লাভের আশায়। কুসুম

হয়তো জানে, হয়তো জেনেই এসেছে, আনবে না শশী কলকাতা থেকে কোনোকিছুই তারজন্য, তবু এসেছে। আসলে এই উপহার-এর ব্যঞ্জনা বস্তুগত নয়, মনোগত। কুসুম বলেছে, 'কী আনলেন আমার জন্যে?' 'কী'— এই বিস্ময়বোধক অব্যয় ব্যবহারে শব্দকুশলী শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুমের বিস্মিত ব্যঞ্জক মনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে মন দাবি করে 'আমার জন্যে' কিছু অযাচিত উপহার, অথচ যার কাছে দাবি করে কার্যত সেই দাবি করার উপযুক্ত সম্পর্ক নেই তেমনকিছু, সে মন বিস্মিত ব্যঞ্জক বৈকি। শশী খুব স্বাভাবিকভাবেই বলে, 'তোমার জন্যে? কিছু আনিনি বউ।' সাথে সাথে অন্য চালে কথা বলে কুসুম 'কী ভুলো মন মাগো! কত করে যে বলে দিলাম আনতে?' কুসুম কিছুই বলে নি আনতে। কোনো সাধের কথা বলেনি। তাই শশী যখন ধরে ফেলে এটা, তখন কুসুম আরো নিবিড়তায় গিয়ে বলে, 'ওমা, বলিনি বুঝি? তা হবে হয়তো! বলব বলে বলিনি শেষপর্যন্ত! কিন্তু না বললে কি আনতে নেই?' না বললেও যে নিয়ে আসে, না চাইলেও যে দেয়, শশী সে ছাঁচের নয়। অযাচিত উপহারের মধ্যে আছে যাচিত বিলাস, ব্যঞ্জিত ভালোবাসা এবং আকর্ষণের মৌতাত।

এই 'অকৃত্রিম ছেলেমানুষি' একটি গ্রামীণ নারীর মধ্যে তখনই ফুটে ওঠে যখন সে ছেলেমানুষি করার সুযোগটুকু পায়। শশী সেই সুযোগ দিয়েছে। প্রথম থেকেই বেশ কোমলতার চোখে দেখেছে তাকে। এখানেও দেখা যায়, কুসুমের এই কথা শোনার পর, তার 'নির্মল হাসি' শশীর মনেছিলো। এমনি এমনি মনে থাকেনি 'জোর করিয়া মনে রাখিয়াছিল।' কেন? 'ভাপসা গুমোট, শুষ্ক ডোবা— ... এই সমস্ত পীড়নের মধ্যে কুসুমের খাপছাড়া হাসিটুকু ভিন্ন মনে করিবার মতো আর কিছু শশী খুঁজিয়া পাই নাই।' সুতরাং কুসুমের মনের আবেদনটা, 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়'— এই সুরেলা স্পন্দনটা শশীর মনের গভীরতায় আস্তে আস্তে ঠাঁই করে নিচ্ছে— অথচ শশী সেটা বুঝতে পারছে না। বেশ তৃপ্তিদায়ক মনে হচ্ছে, তার আকর্ষণটা এখনো অনুভব ক'রতে পারছে না। অথচ একটা অভ্যাস তৈরী হচ্ছে নিজের অজান্তেই, যে অভ্যাসের নেশায় শশী কুসুমকে সবকিছু বিচিত্র কথা পরানকে বলার ছলে শুনিয়ে দিচ্ছে। যাদব পণ্ডিতের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র ক'রে এক অপরাধী মন নিয়ে শশী কুসুমকে বলেছে, 'মনটা ভালো নেই বউ।' কুসুম উদ্‌বিগ্ন হ'য়ে বলেছে, 'ওমা, কী হল মনের?' কুসুমের এই ব্যক্তিগত প্রশ্নে শশী বিরক্ত হয়েছে। কুসুম আবার বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা তুলেছে। কিন্তু এই চলে যাওয়া প্রসঙ্গে শশী গুরুত্ব না দেওয়ায় কুসুম বলেছে, 'যেতে যে পারি না।' তারপরেই কথা বদলে দিয়েছে। সত্তরবছরের বুড়ো যাদবের মৃত্যুকে নিয়ে গ্রামের মাতামাতির ওপর কটাক্ষ করেছে! শশীর তখন মনে হয়েছে, কুসুমের এই সহজ ভাবনা যেন 'খোলাবায়ু' যা তার মনকে হাল্কা ক'রে দিয়েছে।

এই অষ্টম পরিচ্ছেদেই আরেকটি মুহূর্ত তৈরি হ'য়ে যায়, যার খেই ধরে কুসুমের

মনের রহস্য ফুটে ওঠে। সময়টা বর্ষা। বর্ষা এমনিতেই বিরহী। এই 'তপনহীন ঘন তমসায়' হাতের ব্যথা নিয়ে কুসুম এসেছে শশীর ঘরে। তখন দুপুরবেলা। বৃষ্টি এসেছে ঝেঁপে। চারিদিক নির্জন। সে-সময় একা একাই এসেছে কুসুম। কুসুম সবসময় একটু একলা পেতে চায় শশীকে। শশী একলাই আছে ঘরে। কুসুম এসে বলেছে, 'সইতে পারি না ছোটোবাবু।' ভয়ানক এই কথা শোনার সাথেসাথেই বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে শশী। ভেবেছে তখন, 'চিরকাল এমনভাবে চলিবে না...।' কেননা 'একদিন ছেলেখেলায় আর কুলাইবে না।' শশী কি তাহলে কুসুমের সাথে খেলা করেছে? খেলা শশী করেনি। মিশতে মিশতে, কথা বলতে বলতে, কখন যে তার সাথে বাঁধা পড়েছে, এই অচেনা ছবিটা শশী টের পায়নি। কেন টের পায়নি? প্রথমত; অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার জন্য সে মানসিক ভাবে বেশ ক্লান্ত হয়ে প'ড়তো। কুসুম বেশ খোলামেলা। শশী তাই তার সাথে কথা বলে একটু হাল্কাবোধ ক'রতো। এইভাবে মনের ক্লান্তি মেটাতে মেটাতে সে তার মনের মাঝে নীড় বেঁধে ফেলেছে কখন যে, তা তার ওই ক্লান্তির চাপেই বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয়ত; শশীর মনে শুধু ক্লান্তি নেই, আছে স্বপ্ন। গাওদিয়া গ্রাম সেই স্বপ্ন পূরণের বাধা। সে তাই গ্রাম ছাড়তে চাইছে বারবার। এই স্বপ্নপূরণের দিনগুলি প্রতিদিনই চলে যাচ্ছে, তারই ব্যথায় শশী অন্যমনস্ক থাকতো অনেকসময়। সেই অসতর্ক মুহূর্তে তৈরী হওয়া এই একলা ঘরটা শশী দেখতে পায়নি। একটা রোমান্টিক জলবায়ু ছিলো সেই ঘরের মাঝে, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার কারণেই শশী বেশ হাল্কাচালেই নিয়েছে কুসুমকে।

তৃতীয়ত; যে 'ছেলেখেলা'-র কথা মানিকবাবু ব'লছেন, তা আসলে শশীর-ই মনের জগতের, বলা ভালো বোধের জগতের কথা। ছেলেখেলায় আছে অনাবিল মৌতাত। যে খেলায় দুষ্টুমি থাকে, হার-জিৎ থাকে, তার জন্য সুখ-দুঃখ থাকে, ঈর্ষা থাকে, যে খেলা খালি খেলার জন্যই, জীবনের বোঝাপড়া বা দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েনের জন্য নয়, তাই হ'লো ছেলেখেলা। কুসুমের সাথে শশী কি এই খেলা খেলেছে? যে শশী থেঁতলানো গোলাপচারা বারবার লালন করে, যে শশী একটি মুহূর্তও অপচিত করতে চায় না তার জীবন থেকে, যে শশী জীবনজিজ্ঞাসু, সে তো এইরকম সাংঘাতিক খেলা করতে পারে না। আসলে তা যে ছেলেখেলা নয়, টাইমপাস-ও নয়, মনের খেলা। তাই তো শশী লজ্জা পায়, তার মনে একটা অপরাধ বোধ দেখা দেয়— 'দীর্ঘকাল ধরিয়া কুসুমের প্রতি নিজের অন্যায় ব্যবহার করিয়া শশীর লজ্জাবোধ হইল।' ছেলেখেলায় কি লজ্জাবোধ থাকে? ছেলেখেলায় কার কি যায় আসে।

শশী এই মানসিক সংকটে বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। ভয়ানক অপরাধবোধে মনের থেকে ছলকে আসে সত্যিকথাগুলি। আমাদের যখন আর করার কিছুই থাকে না, তখন যেমন আমরা আত্মসমর্পণ করি, শশী-ও সেইরকম সমর্পণের প্রয়াস ক'রেছে। 'তোমার কাছে

সরে বসতে না পেরে আমার যা কষ্ট হচ্ছে'— এইরকম বিরহের বা আক্ষেপানুরাগের কথা শশী যখন বলছে তখন মুহূর্তে নাটকীয় পতন হয় ওই পটভূমিটার। কুসুম সবকিছু তোলপাড় করে ব'লে দেয়— 'হাতটার ব্যথা সইতে পারি না ছোটোবাবু।' খানিক আগের সইতে না পারার সাথে এই সইতে না পারার তফাৎটা অনেক। কুসুম কেন এই তফাৎটা তৈরী করলো? যে-কথা শোনার জন্য সে মুখিয়ে আছে, সে কথায় সে ছেদ টানলো কেন? কুসুমের এই জটিল ব্যবহারের অর্থ বুঝতে না পেরে শশী ভাবলো— 'গ্রাম্য মন কুসুমের, কিছু তার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।' কুসুমের মন কি সত্যিই গ্রাম্য? এ-সমস্ত সমস্যার উত্তর লুকিয়ে আছে শশীর ওই কথায়। সেখানে দেখি—

'... অনেকদিন থেকে তোমায় ক-টা কথা বলব ভাবছিলাম বউ। বলি বলি করে বলতে পারিনি।... আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝেসুঝে করা দরকার। এক তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর শুধু অপকারই করেছি। তবু, তা-ও আমি গ্রাহ্য করতাম না বউ। এই বৃষ্টিতে তুমি এলে, তোমার কাছে সরে বসতে না পেরে আমার যা কষ্ট হচ্ছে কারও মুখ চেয়ে আমি তা সইতাম না। কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকব না বউ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে। আর কখনও ফিরব না। এরকম অবস্থায় একটু মনের জোর করে—'

এখানেই শশীর মনের কথা থামিয়ে দেয় কুসুম। ঠিক কখন থামায়, যখন শশী তাদের দুজনের প্রেমটাকে আন্তরিক মর্যাদা দিয়েও বিচ্ছেদের কথা শোনায়। কুসুম এটাই শুনতে পারে না, মানতে পারে না। সহ্য করতে পারে না। তাই সে থামিয়ে দেয় শশীকে। শশী এই মনটাকেই ভেবেছে গ্রাম্য। কিন্তু তা গ্রাম্য নয়— বিরহী।

(ঙ) নবম পরিচ্ছেদ: কুসুম বাপের বাড়ি যাচ্ছে। মামলার কাজের জন্য শুধুমাত্র নয়, কুসুমের জন্যই শশী কুসুমের সাথেই নৌকায় চেপেছে। কুসুম যখন জানতে পেরেছে এটা তখন 'গভীর সুখে' মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এবং সাথেসাথেই বলেছে, 'ভেবেছিলাম বাপের বাড়ি গিয়ে কমাস থাকব, তা আর হবে না বুঝতে পারছি।' কুসুমের এই প্রণায়াকর্ষণের নিবিড়তায় লজ্জা পেয়েছে শশী। মানিকবাবু তখন লিখেছেন, 'ওইরকম বাঁকা তার মনের কথা বলিবার ধরন।' আসলে 'সে কিছু বুঝিবে না, কিছু মানিবে না। ... সেদিন কুসুমের ব্যবহারের মানে ছিল শুধু এই।' তাই শশীর ওই মনোলোভন কথার পর বিচ্ছেদের কথা সে বুঝতে চায়নি। তার মন তাই অবুঝ। সোজা পথে সে চলে না। তাই তার মনের কথাগুলিও বাঁকা। এই বাঁকা মনটাকেই পরান ভেবেছে ছেলেমানুষ, শশী ভেবেছে শিশু আর গ্রাম্য।

(চ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: এই পরিচ্ছেদেই কুসুমের অবুঝ মন শেষবারের মতো শেষচেষ্টা ক'রেছে শশীকে পাওয়ার জন্য। যখন ব্যর্থ হ'য়েছে, কোনো ইঙ্গিত, কোনো ঈশারা যখন সে চাওয়াকে পূর্ণ ক'রতে পারেনি, মনের মাঝে নেমে এসেছে তখন হতাশা। কোনো

কিছু অনেকদিন ধরে চাইলে যদি তা মেলে না, তখন যে প্রশমিত বিষণ্ণতা ছেয়ে থাকে মনে— তারই আভাস দেখা দিচ্ছে আস্তে আস্তে কুসুমের মনে। অন্যদিকে শশীও কিন্তু বুঁদ হ'য়ে যাচ্ছে কুসুম বনে। যে আকর্ষণটা ' গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ' হিসেবে সে মনে ক'রতো বা মনে করার চেষ্টা ক'রে তার দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকের স্বপ্নটা আরেকবার সজীব ক'রে তুলতে চাইতো, 'জীবনকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিবার পিপাসা'-কে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করতো, তবু সমস্ত ছক, ব্যাপ্তির চেতনা কোথায় যেন মিলিয়ে যেতো কুসুমের গন্ধে। এই পরিচ্ছেদেই দেখি, শশী ও কুসুমের প্রেমের আরোহন ও বিমোচন— একদিকে চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা, অন্যদিকে সহস্রাধিক উর্মিমালার উন্মুখ চাঞ্চল্যের পর ক্লান্ত বালুচর।

শশী আবার গিয়েছে পরানের বাড়ি দিনকুড়ি পর পড়ন্ত বেলায়। এই কুড়িদিন যেন 'দীর্ঘকাল'। যেন 'বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।' মতৃষ্ণ যক্ষের কাছে একবছরের বিচ্ছেদ যেমন দুঃসহ মনে হয়েছিলো, শশীর কাছে মাত্র কুড়িদিন মনে হলো 'দীর্ঘকাল'। পরিষ্কার বোঝা যায়— 'Love reckons hours for months and days for years; and little absence is an age.' (Dryden). ('মেঘদূত পরিচয়': ভূমিকা— পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য: পৃ: ১৬)। পরানের একলা বাড়িতেও শশী কুসুমকে স্বচ্ছ করেই নিজের মনের কথা বলেছে— 'তোমার হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় বউ। লোকজনের ভিড়ে জ্বালাতন হই, তুমি ছাড়া এমন করে আমার কাছে আর কেউ হাসে না। আমার একটিও বন্ধু নেই বউ।' শশী যখন প্রীতিপূর্ণ জলবায়ুতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন কিন্তু কুসুম একলা ঘরের সুযোগ নেবার জন্য 'উশখুশ করে।' একবার উত্তরের ঘরে ঢোকে, বাইরে এসে আকাশে বেলার দিকে তাকায়, তারপর সরাসরি তার এই কামনার দাহটা শশীর পিঠে চাবির গোছার আঘাত হয়ে ঝরে পড়ে। শশী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু উন্মত্ত গাভীর মতো কুসুম জ্বলে ওঠে। এতো স্পষ্ট আবেদনের পরেও শশী যখন পূর্বাবস্থানেই রইলো তখন আর থাকতে পারলো না কুসুম। বলে বসলো— 'সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক আধদিন নয়।' এই কথা বলে মুহূর্তে সরে গেলো কুসুম। এইখানেই তার স্পন্দনটা থামলো।

সুদীর্ঘ নয় বছরের স্পষ্ট-অস্পষ্ট আভাস যখন কার্যত কোনো কাজেই লাগলো না ওই তৃপ্তিদায়ক স্বীকৃতিটুকু ছাড়া তখন কুসুম সরে গেলো। তার এই সরে যাওয়ায় আছে মর্মান্তিক আক্ষেপ আর মর্যাদাবোধ। কিন্তু শশী ততোধিক আত্মহারা হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই নিজের এই আত্মহারা ভাবটিকে কাটানোর জন্য সে মনের মাঝে নির্মাণ ক'রলো অসাধারণ সম্ভাবনার এক বহুতৃষিত খোলস— 'জগতে সাগর-তরঙ্গ আছে।' কুসুম সেখানে তুচ্ছ, তার বুকে যে দামী ব্লাউজ নেই। কিন্তু এ শুধু তার মনের ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ। কুসুমকে ঘিরে সে যে তৈরী করে ফেলেছে একলা একটি ঘর— তার 'সংসারী, হিসেবি, সতর্ক, মন তাকে মানতে চায় না; তার 'জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতায় একটা গভীর

সহানুভূতিমূলক বিচারপদ্ধতি'-তে তাকে অস্বীকার-ও করতে পারে না; আবার তার 'কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধ'-এর মৌতাতে তার মন স্পন্দিত হয়।

শশী সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই তার মন শ্রীহীনতায় আক্রান্ত। কুসুমের অস্তিত্ব সেই শ্রীহীনতার মরুভূমিতে মরূদ্যান তৈরী করেছে। শশীর গভীর সহানুভূতিতে কুসুমের এই উপস্থিতি ও তাকে নিয়ে শশীর বিচারপদ্ধতি তাদের প্রেমের অনুকূলেই প্রসারিত হয়েছে। এই বিচারপদ্ধতিতেই শশী কুসুমকে বারবার বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছে।

শশীর কল্পনা ও রসবোধ কুসুমের গন্ধে বুঁদ ক'রে দেয় তাকে। কল্পনাতে দামী ব্লাউজ আসে কিন্তু তা অল্পসময়। কুসুম-ই এই স্বপ্নাঙ্গনাকে নির্জিত করে দিয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি গ্রাম ছাড়ার পরিকল্পনা কুসুমের জন্যই সার্থক হচ্ছে না শশীর। শুধু তাই নয়— 'শশীর কল্পনার উৎস সে যে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ... কল্পনার তাই একটি কেন্দ্র ছিল শশীর, এক অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীনা মানবী, কিন্তু তা অবাস্তব নয়: শশীর ভাবুকতা উদভ্রান্ত হইতে জানে না। কুসুম যেন তাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে— সেই মহা-মানবীকে।' সুতরাং কুসুম এখন শশীর কল্পনায় সত্য-মানবী। কিন্তু শশীর ভাবাবেগ ও রসবোধ সেখানে বিলাসের উপচার নিয়ে আসে। তখন শশীর মনে হয়— 'সুস্থ সুন্দর শরীর তার, অর্থ ও সম্মানের তার অভাব নাই এবং আর কারও না থাক তার জন্য অন্তত একজনের বুকভরা স্নেহ। যতদিন এখানে আছে এসব তো সে অনায়াসে উপভোগ করিতে পারে, জীবনে বজায় রাখিতে পারে মৃদু একটু রোমাঞ্চ।' কুসুমের মনকে নিয়ে শশীর এই রোমান্টিক বিলাস অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু তা তাৎক্ষণিক।

তাৎক্ষণিক বলেই শশী পরেরদিন পরানের বাড়ি যায় কিন্তু কুসুমের আর অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে না। শশী কিন্তু অপেক্ষায় থাকে তা দেখার জন্য। একদিন খুব ভোরে, ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল আকাশে, যে আকাশের তলায় কুসুম স্বপ্ন বুনতো হলুদ ঢোঁড়া সাপের, সেই সময়, শশীর সাথে সত্যি সত্যি দেখা হ'লো তার। কিন্তু এবার বাস্তবে পেয়েও সাপটা আর ছোবল মারলো না। কুসুম কেমন নির্লিপ্তের মতো দাঁড়িয়ে রইলো অস্পষ্ট অন্ধকারে। শশী-ই প্রথম বললো, 'তোমায় দেখে দাঁড়িয়েছিলাম বউ, ভাবছিলাম কাছে যাবে।' কুসুম তীক্ষ্ণতার সাথে বললো, 'আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি কাছে যাব?' শশীর বারবার অস্পন্দ প্রেমাস্পদ কুসুমের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছে। শশী স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে, 'আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল যেন কমে যাচ্ছে বউ।' কুসুমের এই তাৎপর্যপূর্ণ রূঢ় ব্যবহারে কষ্ট পেলো শশী। দীর্ঘ তৃষ্ণার পর অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে ক্ষুধামন্দা। কুসুমের এখন বৃন্তচ্যুত হওয়ার সময় এসেছে। এরই পরিণতি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আমরা লক্ষ্য করবো।

(ছ) ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: শশী খুব সংযমী। ঝোঁকের টানে কাজ করে না। বেশ ভাবে সব কাজের আগেই। কিন্তু কুসুম তার সমস্ত ভাবনাকে এমনকি তার সতর্ক চেতনাকে

পর্যন্ত এলোমেলো ক'রে তুলেছে। এই পরিচ্ছেদের সূচনাতেই সেই অনিয়ন্ত্রিত আবেশ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। কোনোকিছু না ভেবেই সক্কালবেলা সে কুসুমকে তালবনে আহ্বান ক'রেছে। কুসুম বেশ উৎফুল্লতার সাথে সেই ভূপতিত তালগাছটার কাছে এসেছে। গাওদিয়া ছাড়ার কোনোরকম বিষণ্ণতা কুসুমের চোখে-মুখে দেখা দেয় নি। নদী মোহনায় এসে মৃত্যুর আগে যেমন শান্ত থাকে কুসুম-ও ঠিক তেমনি শান্ত। কিংবা বৃষ্টি থেমে যাবার পর ঝোড়ো আকাশটার এককোণে সর্বশান্ত একফালি মেঘ— সে যেন ওই মেঘবালিকা। হঠাৎ করেই সে শশীকে বলেছে, 'হাসব?'। হাসির কারণ যখন জানতে চেয়েছে ভূপতিত বিবর্ণ শশী, কুসুম বলেছে, 'আমার হাসি দেখলে আপনার মন নাকি জুড়িয়ে যায়?' কুসুমের এই তীব্র তামাশায় 'শশীর একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হয়।' যে কুসুমের পাগলামিকে সে সাতবছর প্রশ্রয় দিয়েছিলো 'মৃদু স্নেহসিঞ্চিত অবজ্ঞায়,' আমরা যাকে বলেছি বিলাস, তার জন্য সীমাহীন যন্ত্রণা পায় শশী। কিন্তু কুসুমের এই নির্বেদ উপস্থিতিও সে সহ্য করতে পারে না। তার মনে হয় কুসুমকে ঝাঁকিয়ে দিতে, জোর করে চেপে রাখা জলের ফোঁটাগুলিকে চোখ থেকে ঝরিয়ে দিতে শিশিরের মতো। শশীকে আর ঝাঁকাতে হলো না, জল ঝরলো এমনিতেই। লেখক তখন জানালেন, 'শশীর কাছে মনের আবেগকে এমন স্পষ্টভাবে চোখের জলে কুসুম কোনোদিন স্বীকার করে নাই।'

শশীর অবহেলা (কুসুমের বিচারে), মন নিয়ে খেলার যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে তার কষ্টের কথা কুসুম গোপন করে না। অন্যদিকে কুসুমের এই অরন্তুদ মনের ব্যথা বলার সময় শশী তার 'অপার্থিব সুন্দর' শরীরটাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। এই শরীরটাই তো একদিন প্রেমাস্পদের উপস্থিতিতেও স্নায়বিক উষ্ণতা অনুভব ক'রেছিলো, আর শশীর বকলমে আমরা ভেবেছিলাম শরীরটাই নাকি তার সব। সে কতখানি ভুল ভাবা, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি বারবার। শশী কিন্তু কুসুমের হাতখানি ধরলো— 'নগ্ননির্জন হাত'। তবু কুসুমের আন্তরিক ঐকতান বাজলো না। শশী কুসুমকে নিয়ে আলাদা কোথাও ঘর বানাতে চাইলো। কুসুম কিন্তু চাইলো না, বরং ব'ললো তার বদলে যাওয়ার কথা। ইশারা করে অস্পষ্টভাবে আহ্বান করলেও যে কুসুম উল্লাসের সাথে ছুটে আসতো, সে গেছে বদলে। বয়স তার বেড়েছে, কিন্তু সেটাই সব নয়, আসলে তার মন ভেঙেছে— 'লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কী।' কুসুম বলেছে 'আমার জন্য আপনার মন কাঁদবে?' শশী বলেছে, 'ভয়ানক মন কাঁদবে বউ।' শশী স্পষ্ট করেই বলেছে, 'নিজের মন কি মানুষ সবসময়ে বুঝতে পারে বউ?' এখানে শরীর কোথায়? শশীর জড়িয়ে ধরতে চাওয়াতেও কামনার দাহ ফুটে ওঠে না। ওই শরীরটা সেইসময় শশীর হঠাৎ করেই মনে হ'য়েছিলো 'অপার্থিব সুন্দর।' শশী সৌন্দর্য প্রেমিক। কাজেই তার জড়িয়ে ধরতে চাওয়ার মধ্যে কাম নয় প্রেম প্রকাশিত। আর 'অপার্থিব সুন্দর' এই শব্দ দ্যোতনায় যে অশরীরী নান্দনিক সুর ওঠে তার অনুভূতি

কামে নয় প্রেমেই পূর্ণতা পায়। বস্তুজগতে নয় তার উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যলোকে শশী কুসুমকে অনুভব করেছে। শশীর এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যতৃষ্ণা পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষেরদিকে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। সেখানে দেখা যায় 'হারু ঘোষের বাড়ির অদূরে তালবনের ধারে' মাটির টিলার ওপর উঠে শশী সূর্যাস্ত দেখার সময় 'সহসা ভীত হইয়া পড়িল'। একটি দিনের মৃত্যুতে সে একটি জীবনের মৃত্যুশোক অনুভব ক'রলো। ভাবলো 'কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎও তাহার আর অবশিষ্ট নাই।' কিন্তু তারপরেই 'সামনে রূপধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে' শশী তা না জানলেও সূর্যাস্তের নীলাশ্লেষ আবীরে তার রোমাণ্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণা স্পন্দিত হয়। শশীর যে রূপানুভূতির পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি এখানে তার মাঝে এসে মিশেছে অনন্তের ছোঁয়া। ফলে কুসুমের এই বৈদেহী অস্তিত্বে, অপার্থিব সৌন্দর্যে রোমান্টিকতায় অনন্ত প্রেম প্রকাশিত। কিন্তু কুসুমের ঘটেছে আত্মিক মৃত্যু,— 'কাকে ডাকছেন ছোটোবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।' শশীও মরে গেলো। একটা বর্ণহীন, তৃপ্তিহীন, 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে 'ভরা অস্তিত্ব শুধু দাঁড়িয়ে রইলো। শশী বুঝতে পারলো এখন, নৈর্বেদ্যর নিবিড় সমর্পণ কেমন ক'রে বিলুপ্ত হলো কুসুমের সুন্দর মন থেকে: 'ঘরে আগুন লাগিলে আগুন নেভে— বাইরেও, মনেরও। কুসুমের মনের আগুন কেন চিরদিন জ্বলিবে?'

বিদায় নিতে এলো যখন কুসুম, শশীর আন্তরিক বাধা-য় পড়ে বললো, ' থেকে কী করবো ছোটোবাবু? তাতে আপনারও কষ্ট, আমারও কষ্ট।' মনের মানুষের কাছে থেকেও, মনে থেকেও যে সীমাহীন যন্ত্রণা, তার থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের খেই ধরে কুসুম চাইছে মনটার কষ্ট কমাতে। শশী তাই শেষপর্যন্ত সমর্থন করেছে কুসুমের গাওদিয়া ছাড়াটাকে, বলেছে, 'এত যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে মন, বাপের বাড়ি গিয়েই থাকো।'

কুসুম মনহীন নয়। কোনো ভালোবাসাই, সেটা যদি টাইমপাস বা ছিনালিপনা না হয়, তাহলে তা মনহীন হতেই পারে না। শশীর সাথেই আমাদেরও 'চোখের সামনে,' আমাদেরও 'অন্যমনস্ক মনের প্রান্তে' কুসুমের 'অমন ভয়ানক উপবাসী ভালোবাসা' 'ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে'। আমরা তা বুঝতে পারি নি।

শশীর আন্তরিক ও ঐকান্তিক অভিলাষে যে-যে বিষয়গুলি উঠে আসে (পড়াশুনো করা/ গবেষণা করা, বড়ো ডাক্তার হওয়া, বাইরে যেতে চাওয়া/ বিদেশে বাস, সুন্দরী নারী-বাংলো ও রোমান্স, আলো-গান-হাসি-আনন্দ ও আভিজাত্য), সেগুলির একটিও পূরিত হয় না। অনেকেই এখানে মানবভাগ্যের একটা নির্মম প্রভাব লক্ষ্য করেন। কিংবা অনেকেই শশীর ব্যর্থতাকে মধ্যবিত্তের পরাজয় হিসেবে দেগে দেন। এ-কথা ঠিক শশী-র স্বপ্নগুলি সার্থক হয় নি। সে গাওদিয়া-ই ছাড়তে পারে নি। বড়ো ডাক্তার বা গবেষণা

করা, এমন-কি সুন্দরী নারীর চাহিদাটাও তার সফল হয়নি। কিন্তু কেন? সে তো গ্রাম ছাড়তেই চেয়েছিলো। তার মতো মানুষের তো জলাভূমির কবিতা-র মতো গাওদিয়ায় প'ড়ে থাকা-র কথাও নয়। তাহলে তা হ'লো না কেন? দেখা যাক—

(১) **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** কলকাতা থেকে ফিরে গ্রামে ডাক্তারি করার সূচীমুখেই শশী 'হাঁপাইয়া উঠিল।' কলকাতার সুরেলা উদ্দাম জীবন ছেড়ে 'এইসব অশিক্ষিত নরনারী, ডোবা পুকুর বন জঙ্গল মাঠ'-এ তার জ্ঞানপিপাসু মন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। ভাবলো, 'ও ভগবান, একটা লাইব্রেরি পর্যন্ত যে এখানে নাই!' কিন্তু তার মন শান্ত হয়েছে। লেখক জানাচ্ছেন, 'হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য।' শহর তার মনে ছাপ দিয়েছে, দাগা দিতে পারে নি। সুতরাং সে যতই চিন্তাজীবী হোক, তার পিপাসা চরিতার্থ হচ্ছে না তারই গ্রাম্য মানসিকতায়। আরো লক্ষ্যণীয়, শশীর মনে কোথাও গ্রাম্য সংস্কারও আছে, এর প্রমাণ আমরা যাদবের বেলায় চিনে ফেলেছি।

(২) **পঞ্চম পরিচ্ছেদ:** যে শশী আগে কারও অপমান সহ্য করত না, প্রতিবাদ ক'রতো, এখন 'তাহার এক প্রকার অদ্ভুত ধৈর্য আসিয়াছে।' তাই যামিনীর টিটকারিকে সে পাত্তা দেয় না। পাত্তা দিয়ে কোনো লাভও নেই। কিন্তু যাদব-গোপাল-সেনদিদি ও যামিনীর পাল্লায় পড়ে, তাদের সাথে মিশে শশীর গ্রাম সম্পর্কিত ভাবনায় বদল এসেছে। শশী ভেবে দেখেছে, 'এই ডোবা আর জঙ্গল আর মশা ভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়।'

এরপরই লেখক জানাচ্ছেন, 'একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামে ডাক্তারি শুরুকরিয়া ক্রমে ক্রমে এ জীবন শশীর যে ভালো লাগিতেছে, ইহাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ।' এই ভালোলাগার সাথেও তৈরি হচ্ছে শশীর মনে অ-সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ। সংকীর্ণ-মলিন-দুর্বল-পঙ্গু 'সমস্ত জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশি।' তার কারণ, তার বোধ হয়েছে— 'জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।' শশীর শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোলাগায় গ্রাম নতুন রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই সে প্রথমেই গ্রামকে স্বাস্থ্যসচেতন করতে চাইছে। নিমের দাঁতন, মাটিতে মুড়িছড়িয়ে না খাওয়া, শিশুকে কম দুধ খাওয়ানো, শীতের দুপুরে না ঘুমুনো, জানালা খুলে রাখা, এ-সব স্বাস্থ্যনীতি যখন কেউ-ই মানছে না, বা বেশিদিনধরে মানছে না, তখন শশীর বোধের জগতে গ্রাম সম্পর্কে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে। গ্রামের লোকেরা অকারণে ম'রে আনন্দে থাকে। স্বাস্থ্যনীতির কোনো জ্যামিতি তারা মানে না। এ-সব ভাবতে ভাবতে শশী অবাক হ'য়ে যায়।

(৩) **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:** এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই দেখা যায়, 'গ্রাম্য জীবনে আবার শশীর বিতৃষ্ণা আসিয়াছে।' এর কারণ পঞ্চমপরিচ্ছেদের সূর্যাস্ত দেখার ঘটনা। সূর্যাস্ত শশীর কর্মময়দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। গ্রামে তা সম্ভব নয়। তাই এই বিতৃষ্ণা।

কিন্তু 'এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এ জন্যে দায়ী কুসুম।'

(৪) **সপ্তম পরিচ্ছেদ:** কলকাতায় গিয়ে শশী গ্রামে ফেরার তাগিদ অনুভব ক'রলো, চারিদিকে তার রোগীরা তার পথ চেয়ে রয়েছে। কিন্তু শশীর মুহূর্তে মনে হলো, 'এ কী বন্ধন, এ কী দাসত্ব?' রোগীদের জীবনমরণের সমস্ত দায়-দায়িত্ব সে অস্বীকার করে এক মাস গ্রামে না ফেরার প্রতিজ্ঞা নিলো।

(৫) **অষ্টম পরিচ্ছেদ:** এই পরিচ্ছেদের সূচনাতেই দেখা যায়, 'একমাস গ্রামে না ফিরিবার প্রতিজ্ঞা দুদিনের বেশি টিকিল না শশীর।' এর কারণ শুধু ওই বিপন্ন রোগীদের অসহায় অবস্থান নয়, কুসুমের সুবাস-ও দায়ী। কিন্তু গ্রামে ফিরে বৃষ্টিহীন গরমে শশীর দিনগুলি অপ্রীতিকর মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে কাটতে থাকে। যেখানে স্নানাহারের সময় নেই এত ব্যস্ততা, অথচ তেমন উপার্জনও হয় না, সেখানে শশীর বড়োলোক হওয়ার আহ্লাদ কেমন করে সার্থক হবে? তাই 'কিছু ভালো লাগে না শশীর, না গ্রাম, না গ্রামের মানুষ।' গাওদিয়ার স্বপ্নহীন পরিবেশে শশী উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে। তাই 'যতদিন যায়, গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জগতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে।' তার বৈপ্লবিক জীবন সাধনা সফল করতে হলে তাই জোর করেই গ্রাম ছাড়তে হবে। শুধু গ্রাম নয়, আত্মীয়-বন্ধু সকলের সাথেই সম্পর্কটাও ছেদ ক'রতে হবে।

(৬) **নবম পরিচ্ছেদ:** এখানে হাসপাতাল তৈরীর ব্যবস্থাপনায় ও যাদব কর্তৃক সমর্পিত দায়িত্বে শশীর মনে যে বড়ো কিছু করার আগ্রহ ছিলো তা মুক্ত ও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

(৭) **দ্বাদশ পরিচ্ছেদ:** 'যাদব মেমোরিয়াল হসপিটাল' যখন লোকের মুখে শশী ডাক্তারের হাসপাতালে পরিণত হয়, শশীর যশ ও সম্মানের বৃদ্ধি হয়, তখন শশীর এই আকস্মিক জনপ্রিয়তা তাকে অসংখ্য বন্ধনে বেঁধে গ্রামছাড়ার পরিকল্পনা চেপে দিয়েছে। কিন্তু শশীর তখনো মনে হয়, এ পুরস্কারের বদলে ঘুষ, সে যা চেয়েছিলো, তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ও সম্মান নেই। হাসপাতালের কাজে কোনো ফাঁকি না দিলেও শশীর মনে 'জীবনকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিবার পিপাসা সর্বদা জাগিয়া থাকে মনে হয়, 'অনেক কিছু চাহিয়া কিছুই সে পাইল না। ... জীবনটা তেমনি বাজে কাজে নষ্ট হইল।' এক মানসিক দ্বন্দ্বে শশী জর্জরিত হয়ে যায়। একদিকে তার চাওয়াগুলি, অন্যদিকে সেই চাওয়ার কারণে মনের উপভোগ করার ক্ষমতার ক্ষীণ হওয়ার সম্ভাবনা। সে তাই তার বর্তমানকে নীরস ও নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করাটাকে নিজেই সমর্থন ক'রতে চায় না। নৌকার ঘাটে কুসুমের বাবা অনন্তের মুখে নিয়তির অপ্রতিহত অচিন্তনীয় প্রভাবের কথা শুনে শশী জ্বলে ওঠে; বলে, 'তাঁকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম।' কিন্তু শশী এই কথা বলে 'একটু হাসিয়া'। এই হাসিটাই বুঝিয়ে দেয় কী তীক্ষ্ণ শ্লেষের ঝাঁঝ আছে সেখানে। একদিকে 'অনেক দূর দেশে, অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে' নীড়বাঁধার অসফল স্বপ্ন অন্যদিকে কুসুমের গাওদিয়া ত্যাগের সিদ্ধান্ত, শশী তাই হাঁটে অন্ধকারে।

(৮) ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: কুসুমকে যখন কোনোভাবেই কাছে টানতে পারলো না শশী, তখন স্বপ্নেভেজা পৃথিবীটা তার কাছে একটা প্রকাণ্ড জড় পদার্থে অসংখ্য অচেনা মানুষের ভীড়ে অনাবশ্যক বলে মনে হলো। গ্রাম ছাড়ার পরিকল্পনার পাশেই অনেকগুলি স্বপ্নও নিস্তেজ হয়ে গেলো। তবু হাসপাতালের সমস্ত শৃঙ্খলাকে কার্যত মেনে নিয়েও, নতুন ডাক্তারের নিয়োগ সংক্রান্ত কথা ভেবে তার মন কিন্তু গ্রামেই পড়ে থাকতে চাইলো না। সেনদিদির ছেলেহওয়ার পর ও তার প্রতি গোপালের নীরব নিরাপদ আশ্রয়দানে শশী দৃঢ়তার সাথেই গ্রামছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলো। যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে শশীর মনে হলো 'না গেলে তার যেন চলিবে না, যাইতে সে যেন বাধ্য। কে যেন গাঁ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছে, থাকিবার তার উপায় নাই।' গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা তার বাড়িয়ে দিলো গোপাল আর ওই ছেলেটি। শশীর মনে হ'লো, গোপাল তার অভিমানকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করেছে; গোপালের এই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে শশীর মর্যাদাবোধে আঘাত লাগলো। ফলে গ্রামছাড়ার পূর্বপরিকল্পিত বাসনা জেগে উঠলো তার। কিন্তু হঠাৎ করেই গোপালের কাশীবাস নেওয়ার পরিকল্পনায় শশীকে বাধ্য হয়েই থেকে যেতে হলো গ্রামে। গোপাল কিংবা শশী যে-কানো একজনের যাওয়া অনিবার্য ছিলো। কেননা 'জীবনের গতি দুজনের বিপরীতগামী।' একসাথে থাকা তাদের অসম্ভব।

সুতরাং গ্রাম ছাড়ার পেছোনে শশীর মধ্যেই সমস্যা আছে আছে, স্ববিরোধ। তার সিদ্ধান্তগুলি বহুস্তরিক, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কারণে সে নিজেই জোর পাচ্ছে না। কখনো জীবনের বৃহত্তর ব্যাপ্তি, কখনো অনাত্মীয় পৃথিবীতে বাস, কখনো কুসুম আবার কখনো একান্ত ব্যক্তিগত কারণে অভিমানে— বহুআয়তনিক এই সমস্যা শশীকে ব্যাকুল করে তুললেও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে দুঃখও থেকে যায়।

এক → 'গ্রাম ছাড়িবার কথা ভাবিলে কেমন করিয়া ওঠে মনটা।' মাতৃভূমির প্রতি, শিকড়ের প্রতি একটা টান সে অনুভব করে।

দুই → অমূল্যকে দায়িত্ব দিয়ে শশীর মনে হঠাৎ করেই 'অকারণে ক্ষোভ জাগিতে লাগিল।' শশীর তৈরী এই হাসপাতালে, তার রাজ্যে অমূল্য যেন বেদখল করতে এসেছে। 'যাওয়ার আয়োজন শুরু করিবার সময় দ্বিধা না করিবার গাফিলতি না করিবার প্রতিজ্ঞা-ই-বা কোথায় গেল শশীর? অমূল্যের মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধিকে দেখিয়াই মনটা এমন বিগড়াইয়া গেল?'

তিন → গোপাল যখন শশীর কাছে বিদায় নিতে এলো, শশীর মধ্যে কোনোরকম কোনো ক্ষোভ প্রকাশ পেলো না। গোপাল যে তার যাওয়ার পথ বন্ধ করছে, সে জন্য সে কষ্টও পেলো না। বরং বেশ সহজভাবেই বললো, 'বেশ তো আসুন গিয়ে— কদিন পরে গেলেও আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

সুতরাং শশী নিজেই গ্রাম ছাড়তে চাইছে না। এখানে গ্রামছাড়ার যে তাগিদ তার চেয়ে

শিকড়ের টানের তাগিদটা অনেক জোরালো।

গাওদিয়াতেই থেকে যায় শশী। 'এ ভার তো ফেলিবার নয়।' যে 'কাজ আর দায়িত্ব ছিলো জীবনে' হাসপাতালকে কেন্দ্র ক'রে সেই 'কাজ আর দায়িত্বে জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল।' এই তো সেই সাগরতরঙ্গ। এখানেই তো তার সকৃতজ্ঞ সম্মান, তার অধিকার জমা হ'য়ে আছে। হাসপাতালকে কেন্দ্র করে তার মনে এই অধিকারের মেজাজ এতোটাই তীব্র যে, সে সমস্ত নালিশকে অমান্য ক'রে নিজের জন্য একলা একটি ঘর তৈরী ক'রেছে এখানে। অসময়ে অপ্রয়োজনে হাসপাতালের এই খাসকামরায় শশী নিজেকে গুছিয়ে নিতে চেয়েছে। তাই তো নাদুসনুদুস অমূল্যকে তার জায়গায় দেখে শশী ক্ষুব্ধ হয়েছে। 'কত যত্নে কত পরিশ্রমে শশী যে গড়িয়া তুলিয়াছে তার এই হাসপাতাল, লোকে যে এটা শশী ডাক্তারের হাসপাতাল বলিয়া জানে।' গ্রাম ছাড়ার বাসনা থাকা সত্ত্বেও সে হাসপাতালটিকে বড়ো করে তোলার প্রয়াস করেছে। তাই যখন পদত্যাগপত্র লিখলো শশী, হায় হায় করে উঠলো গাঁয়ের লোক। শশীই বিচলিত হলো তখন। মনে হলো তার তখন 'কেবল ডাক্তার বলিয়া স্বার্থের খাতিরে তো নয়, মানুষ হিসাবেও মনের মধ্যে সকলে তাহাকে একটু স্থান দিয়াছে বইকি। তাকে কেন্দ্র ক'রে এতগুলি সাহায্যপ্রার্থির অসহায়ত্ব, তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ভাবা, তার উপস্থিতিতে অত্যন্ত সামান্য সাধারণ কারণেও সকলের উৎসাহ, 'এ তো অকারণে হয় না, কতবড়ো সৌভাগ্য শশীর, না চাহিয়া জনতার এই প্রীতি পাইয়াছে। ... এখন আশেপাশে দশটা গ্রামে শশীর চেয়ে বেশি প্রভাব আর কাহারও নাই।' একে কি ব্যর্থতা বা পরাজয় ব'লে? শশীকে সবাই ভালোবাসে, শশীও তাদের মেধাহীন জেনেও ভালোবাসে। জীবনদেবতার এই রীতিতে শশী তো প্রথম থেকেই বিশ্বাসী। তার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সাধ 'অনেক কমলারঙের রোদ,' 'বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল' তারই সকৃতজ্ঞ দায়িত্ববোধের জন্য পূরিত হয় না। একে কি নিয়তি বলে ভাবাটা ঠিক হবে খুব। লেখক জানাচ্ছেন— নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে মানুষের জীবনের স্রোত বইতে পারে না। কেননা, 'মানুষের হাতে কাটাখালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তণীয়।' খালটা কেটেছে তো মানুষ। আমরা কি আমাদের-ই তৈরী এই সভ্যতাকে তার অবুঝ গতিপ্রবণতাকে অদৃষ্ট বোধে নিয়তি বলে দেগে দিতে পারি। এই সভ্যতা তো মাধ্যাকর্ষণের মতোই টানে আমাদের। তাকে যারা বদলাতে যায়, 'সহজ লোকের' মতো না চলে, 'সহজ লোকের' মতো না থেমে এই 'আলোয় আঁধারে, তার এই সাহস ও প্রয়াসকে তো আমরা ব্যর্থ বলে দূরে ফেলে দিতে পারি না। অনেক প্রয়াসের পরই তো উদ্ভাসিত হয় মাঙ্গলিক সূর্য। জীবনানন্দ দাশের 'অন্ধকার' কবিতায় দেখি, কীর্তিনাশার দিকে অর্ধেক ছায়া পাণ্ডুর চাঁদ গুটিয়ে নিলেও, শতশত শূকরের চিৎকারের মাঝেও কবি দেখেছেন

'... রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;...'

তাই 'মানুষিক সৈনিক' 'শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের। আর যারা ছিল।' তাই তো সে বজ্রাহত হ'য়েও ওই বটগাছটার মতো 'শুকনো ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে'। ভেঙে সে পড়ে নি। মাটির টিলায় চেপে সূর্যাস্ত দেখার মধ্যে যে রোমান্স ছিলো তা না থাকলেও, রইলো শশী ডাক্তারের হাসপাতাল। বটগাছটার রস শুকিয়ে গেলেও রইলো তার উন্নতশীর অস্তিত্ব— তার 'স্থায়ী দরদী প্রতিবাদ।' মানুষের হাতে কাটাখালে পুতুলের মতো এগিয়ে চলার বিরুদ্ধে 'স্লোগানের বদলে' প্রতিবাদ।

—ঃ ঃ—

সহায়ক গ্রন্থ— i) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র— পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি— প্রথমখণ্ড
ii) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা'

সোনা মণ্ডল

বি.এ ডিগ্রিধারী মোহিতলালের স্বাভাবিক এক প্রকার ঈর্ষা ছিল উচ্চডিগ্রিধারী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। খানিকটা সেই ঈর্ষা প্রণোদিত হয়েই ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক পৌষ মাঘ সংখ্যাত্রয়ে মোহিতলাল, শ্রীকুমারের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-র সমালোচনায় বাস্তবতা'-র মোহে আবদ্ধ শ্রীকুমার সম্পর্কে লিখলেন—

'বিশ্লেষণ করিতে পটু, আশ্লেষণ করিতে জানেন না; কারণ—বোধ হয় সত্যই তিনি রসের—অর্থাৎ রূপ সমগ্রতার সম্বন্ধে নাস্তিক।'[১]

মোহিতলালের ঈর্ষাদুষ্ট নাস্তিকতাকে নস্যাৎ করে শ্রীকুমারের 'আশ্লেষণ পটু' মনের পরিচয়কে তুলে ধরতে, একটি প্রবন্ধই যথেষ্ট—'রূপকথা।'

অতি সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৫৩। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ, যা বৈশাখ ১৩৬৪-তে উক্ত প্রকাশনা সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয়, তার পরিবর্তিত শিরোনাম ছিল— 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা।'[২] স্বাভাবিকভাবেই, বাংলা সাহিত্যের পরিভ্রমণে অগ্রসর যে শ্রীকুমার, তাঁর পরিক্রমা শুরুই হয় 'রূপকথা' দিয়ে— গ্রন্থের আদি প্রবন্ধ এটিই। এও লক্ষণীয় যে গ্রন্থশেষের প্রবন্ধটির শিরোনাম— 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ'। বোঝা যায়, 'রূপকথা' থেকে পরিক্রমা আরম্ভ করে শেষাবধি শ্রীকুমার পৌঁছতে চাইছেন উপন্যাস নামক আধুনিক সংরূপের কাছে। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৪৫) নামক মহাগ্রন্থের নিহিত পরিকল্পনাটি কি এর মধ্যেই ক্রমপরিস্ফুট নয়?

দুই

মোহিতলালকে নাকচ করে, আমরা পূর্বেই বলেছি, নিছক বিশ্লেষণ নয়, শ্রীকুমারের আশ্লেষণপটু মনেরও পরিচয় মিলবে, তাঁর এই প্রবন্ধটিতে। কিন্তু, 'রূপকথা'কেই কেন আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুললেন শ্রীকুমার? উত্তর মিলবে প্রবন্ধের (১) চিহ্নিত অংশেই—

> 'আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে, উপেক্ষিতকে অতীতের আঁধার গুহা হইতে সূর্যালোকে টানিবার আয়োজন হইতেছে, কুণ্ঠিত, সংকুচিত গ্রাম্য সাহিত্যের সংগঠনমোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত হইয়াছে।

স্মরণীয় 'রূপকথা' প্রবন্ধটির গ্রন্থান্তর্গত প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৩-য়, অর্থাৎ, ইংরাজি আনুমানিক ১৯৪৬-৪৭-এ। সময়ের গুরুত্বকে স্মরণে রাখলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, কেন, 'অতীতের আঁধার গুহা' থেকে 'গ্রাম্য-সাহিত্য'-কে অনবগুণ্ঠিত করার প্রয়াস

নেওয়া হচ্ছিল সেদিন। এই প্রসঙ্গে এও লক্ষণীয়, যে স্বাধীনতা পরবর্তী দশকে একের পর এক লেখা হয়েছিল একগুচ্ছ ঐতিহাসিক উপন্যাসও। তারই অন্যতম— 'লালবাঈ'-এর রচয়িতা রমাপদ চৌধুরী এই সময়ের চাহিদাকে ব্যাখ্যা করে বলেন—,

দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর যে কোনো দেশ স্বাধীনতা পেলেই পিছনের ইতিহাস ফিরে দেখার একটা প্রবণতা খুব স্বাভাবিক।... 'আমাদের ছিল,' এই গর্ব, বা আমাদের কি ছিল তা জানার কৌতূহলবশতই হয়তো।'[৩]

ইংরাজি ভাষা-সাহিত্যের ক্ষুরধার পণ্ডিত শ্রীকুমার এই অবস্থাকে আরো সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করে জানান, এর দু'জাতীয় কারণ—

'প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্তমানের তীক্ষ্ণ জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায় আবিষ্কার...।'

সমকালীন জটিল-জীবন-যন্ত্রণা থেকে মধ্যবিত্তের পলায়নী মনোবৃত্তি যে অতীত কথার উদ্ধারে অন্যতম কারণ—তা শ্রীকুমারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। অবশ্য শ্রীকুমার উক্ত দ্বিতীয় কারণটি রমাপদর পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গেই প্রায় অভিন্ন—

আমাদের মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যে লুক্কায়িত আছে; তাকে খুঁজে বের করা সেই সময়ের 'পবিত্র কর্তব্য ছিল বলেই শ্রীকুমার মনে করেছেন। এতো গেল বিশ্লেষণ। কিন্তু, যখন সেই 'বিশ্লেষণ'লব্ধ সিদ্ধান্তকেই শ্রীকুমার, 'আশ্লেষণ' করেন,তখন তাঁর অনবদ্য ধ্বনি-মন্দ্রিত ভাষায় তাকে সাজিয়ে দেন এইভাবে—,

'এক স্বপ্ন প্রবণ বিরাম বিলাসীর দল অতীতের মধ্যে শান্তিকুঞ্জ রচনা করিতেছে; আর উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুর দল...নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।'

বলাই বাহুল্য, শ্রীকুমার এই দ্বিতীয় দলের। 'উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু'-রূপে 'রূপকথা' সম্পর্কিত তাঁর যাবতীয় অনুসন্ধিৎসা ও তার প্রাপ্তফলকেই তিনি সাজিয়ে দেন, তাঁর এই নাতিবৃহৎ প্রবন্ধে।

৩

স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকুমারের 'রূপকথা' সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা-র সূত্রপাত এর 'নামকরণ' সংক্রান্ত জিজ্ঞাসায়। 'রূপকথা' না 'উপকথা'—কি বলা হবে?

এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক কাজিয়ার কথা আমরা জানি। মনে পড়ে সুকুমার সেনের মন্তব্য—

'রূপকথা শব্দটি ' অপরূপকথা' থেকেই এসেছে!...সংস্কৃত অপূর্ব শব্দটি 'অপরূপকথা' থেকেই এসেছে!...সংস্কৃত অপূর্ব শব্দটি সুপরিজ্ঞাত। অপূর্ব সুন্দরী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতায় অপরূপ সুন্দরী হয়ে এসেছে কালক্রমে।[৪]

আর 'উপকথা'? তার সংজ্ঞা কি? আবারও দ্বারস্থ হওয়া যাক্ সুকুমার সেনেরই— 'উপকথা মানে ছোট সাইজের গল্প, অথবা কোন গল্পের মোড়কের

মধ্যে ভরে দেওয়া তার থেকে ছোট অথবা অবান্তর গল্প...'[৫]

অবশ্য বর্তমানে উপকথা' অর্থে যে পশুপাখি কথা বা Animal Tale-কে বোঝানো হয়—সে কথাও স্মরণীয়।

কিন্তু 'রূপকথা' বা 'উপকথা'-র এ হেন সংজ্ঞা বিচারেই শ্রীকুমার অনাগ্রহী—'রূপকথা বা উপকথা—কোনটি ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধরূপ তাহার বিচার বৈয়াকরণ করিবেন।'

শ্রীকুমারের অন্বিষ্ট, এই দুটি নামের পেছনে লুকিয়ে থাকা দু'ধরনের 'মনোভাব'—দু'প্রকারের চিন্তাধারা'। তাঁর মতে, 'উপকথা' নামটির মধ্যে, একধরনের 'প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব রয়েছে, পক্ষান্তরে রূপকথা' শব্দটির মধ্যে রয়েছে এক 'ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর'—'একটি রহস্যঘন মাধুর্য।' তাই, শ্রীকুমারের ধারণা—'সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।'

শ্রীকুমার যখন তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'রূপকথা'—তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, 'সমালোচক' নন, তিনি 'রসপিপাসু পাঠক' রূপেই এই প্রবন্ধে আমাদের কাছে উপস্থিত হতে চাইছেন। এরপরেও কি মোহিতলালের 'আশ্লেষণ' না করতে পারার অভিযোগকে যথার্থ বলে মনে করা সম্ভব?

সমালোচক নন, রসপিপাসু পাঠক তিনি, তাই, স্বাভাবিকভাবেই, 'রূপকথা'-র আলোচনায় ব্রতী হয়ে, শ্রীকুমার প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করেন আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতিকে—

'...রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে।'

আর, আশ্লেষণের ভঙ্গিতে জানান, রূপকথাকে বিচার করতে হবে, তার 'জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনীর' মধ্যে রেখে'। অনবদ্য কবিসুলভ ভাষায় সে জন্মমুহূর্তের বর্ণনা দেন শ্রীকুমার—

'বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিত প্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা চঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনাপ্রবণ আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুমার স্নেহাসক্ত, সরল, তরল কণ্ঠস্বর;'

মনে পড়ে যায়, শ্রীকুমার সম্পর্কে তাঁর ছাত্র সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা—'ধীরলয়ে সুনির্দিষ্ট শব্দযোজনার পর শব্দযোজনায় প্রতিটি কাব্যকে তিনি করে তুলতেন ধ্রুপদী শৈলীর এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন।'[৬]

অবশ্য, শুধু জন্ম মুহূর্তের বর্ণনা নয়, শ্রোতা রূপে যাদের জন্য জন্ম নিচ্ছে রূপকথা, তাদের মনোজগতের পরিচয়দানেই শ্রীকুমারের আগ্রহ বেশি। তাঁর মতে, পূর্ণবয়স্ক মানব, যিনি 'সম্ভব অসম্ভবের' মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে ফেলেছেন, তিনি পৃথিবীর রহস্যভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু, শিশু—যার মনের মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব—সবই মিশে রয়েছে, তার

হৃদয়ে 'পৃথিবীর সমুদয় রহস্য' যেন বাসা বেঁধে রয়েছে। পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনে, যার আশা ও কল্পনাকে' বাঁধতে পারে নি—

'রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্ত বিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনা রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে।'

স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকুমারের এই মনোবিশ্লেষণ আমাদের স্মরণে এনে দেয়, রবীন্দ্রনাথকে—

'বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ।... বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—যে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে।'[৩]

চার

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি আর শিশুমনের পার্থক্য যে তাদের 'রূপকথা'র রসাস্বাদনে পৃথকত্ব আরোপ করে, এই সত্য জানাবার সূত্র ধরেই, শ্রীকুমার রচনা করেন প্রবন্ধের (২) চিহ্নিত অংশটি।

যে পূর্ণবয়স্করা 'রূপকথা'র অনিঃশেষ রহস্য মাধুর্য আস্বাদনে অপারগ, তারা অভিযোগ করেন, 'রূপকথা'—অলীক ও অবাস্তব। একটু কুণ্ঠিত ভাবেই যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে শ্রীকুমার জানান যে, অবাস্তবেরও তো পৃথিবীতে স্থান আছে। বাস্তব না হলেই তা আমাদের 'পৃথিবী ও মানবমন' থেকে নিশ্চয় নির্বাসিত হয় না? উদাহরণস্বরূপ তাঁর মনে আসে 'নীল আকাশ'-এর কথা। তা অবাস্তব। তবু আমাদের তুচ্ছ বিড়ম্বিত জীবনের উপর তা কি এক স্নিগ্ধ শান্তিময় চন্দ্রাতপ নয়? ওকে অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করলে, মানবমনই কি তার সৌন্দর্যের এক অনবদ্য উপাদান হারিয়ে ফেলবে না? সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, রূপকথাও প্রয়োজনীয়।

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। সত্যিই কি রূপকথা অবাস্তব নাকি? এতক্ষণের আত্মপক্ষ সমর্থনের ছল ছেড়ে দিয়ে এবার শ্রীকুমার সরাসরি অবতীর্ণ হন যুদ্ধে। দৃঢ় কণ্ঠে জানান—

'...রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।'

যা 'স্থূল' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য'—তা-ই মাত্র বাস্তব—এ কথাকে অস্বীকার করেন শ্রীকুমার। মনে পড়ে আমাদের, বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশক থেকে শুরু হওয়া বাস্তবতার আন্দোলনকে, যা, নিতান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, একমাত্র তাকেই বাস্তব বলে মনে করতে চেয়েছিল একদল, কবি-লেখক। তাদের ইস্তেহার—

'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে।'[৮]

এই ছিল এদের বাস্তব, আর একে ঠাট্টা করে শনিবারের চিঠির ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় লেখা হয়।

'বস্তি-কথা রচিলেই কাব্য তব হইবে বাস্তব।
সহসা লেখনী কাঁপে রবীন্দ্রনাথের উত্তর অয়নে।'[৯]

স্মরণীয়, ঠিক সমভুক্ত না হলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু পরবর্তীকালে এই শনিবারের চিঠির পাতাতেই প্রবন্ধ লিখেছেন।[১০] বোঝা যায়, পূর্বোক্ত স্থূল বাস্তবতার প্রতি শ্রীকুমারের অনীহার স্বরূপটি। তাই, তিনি ভিন্ন এক বাস্তবের উল্লেখ করেন তার প্রবন্ধে। তাঁর মতে, যে সব 'সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' যারা কোনো এক মুহূর্তে মাত্র জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেছিল—তারাও বাস্তব। তাই শ্রীকুমারের মতে বাস্তব জগতের বিভিন্ন অনুভূতি—

'...পরিপূর্ণ সুখের সন্ধানে...শক্তি সম্পদলাভ, পাপপুণ্যের জয় পরাজয়...।' এইসব চিরপুরাতন অনুভূতিগুলিকে নিয়ে যে 'রূপকথার রচিত, তা অবশ্যই এক অর্থে বাস্তব।

' শ্রীকুমারের মনোজ্ঞ বাচনে, 'বাস্তব' আর রূপকথার বাস্তবের পার্থক্যের বিশ্লেষণ—

'পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়'।

শ্রীকুমার তার নিবিড় পাঠে দেখিয়ে দেন, কীভাবে, পৃথিবীর দস্যু-দুর্বৃত্ত পরিণত হয় রাক্ষসে; কিংবা দৈব 'অতিরঞ্জিত' হয়ে ওঠে, 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী'র রূপে। বর্তমান 'পরিকল্পিত বিবাহ'-কে ধিক্কার জানিয়ে 'আদর্শ প্রেমিক'-এর অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস-যেন শ্রীকুমার শুনতে পান, রূপকথার রাজপুত্রের নিজ প্রিয়াকে পাওয়ার মধ্যে। সর্বোপরি থাকে, শ্রীকুমারের সেই অনবদ্য অন্বেষণ—

'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবাল পালঙ্কে নিদ্রামগ্ন থাকেন, তিনি আমাদের গোপন অন্তঃপুর শায়িনী প্রেয়সী;'

স্পষ্টতই আমাদের মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের 'নিদ্রিতা' কবিতার কথা—

'একদা এক ঘুমের সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
...
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।
...ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা।
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।'[১১]

আপাতভাবে যে লেখক সমালোচককে আমরা ক্লাসিকরীতির বলেই জানি, এ যেন তার ভিন্ন এক পরিচয়। স্মরণ করা যেতে পারে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত'র স্মৃতিচারণা—

'বি. এ. ক্লাসে প্রথমেই তিনি প্রথম পত্রের পাঠ্য কবিতা—Golden Treasury Forth Book পড়াইতেন এবং রোমান্টিক কাব্যের মাধুর্য আবেশ আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করিলেন।'[১২]

পাঁচ

যাঁরা 'অতীতের' মধ্যে 'শান্তিকুঞ্জ' রচনা করেন, শ্রীকুমার যে তাঁদের দলভুক্ত নন, তা তো এতক্ষণে বোঝাই গেছে। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় দলভুক্ত শ্রীকুমার প্রবন্ধের (৩) চিহ্নিত অংশে এসে 'উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু'-র মতো রূপকথার নামহীন রচয়িতা আর রূপকথার বিবৃত সমাজ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করেন।

শ্রীকুমারের মতে লৌকিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এখানে—'...লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন।...যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে।'

'রূপকথা-র ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন শ্রীকুমার। আর, সেই সূত্রেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে, যে রূপকথার মধ্যে কোনো ব্যক্তিস্বার্থের সীমার চিহ্ন নেই, রয়েছে এক 'উদার, বিশাল, অনাসক্ত' ভাবের লক্ষণ। রাজপুত্র বিপদে পড়ে দরিদ্রের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। আবার যখন তাঁর সৌভাগ্য সূর্য উদিত হয়েছে তখন, সেই দরিদ্র উপকারকও তার যথোচিত মর্যাদা পেয়েছে—'সর্বত্রই একটা সাম্যশান্তির ভাব'।

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি রূপকথার অবাস্তবতার অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীকুমার, বাস্তবতার এক ভিন্ন মাত্রায় রূপকথাকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। (৩) চিহ্নিত এই অংশে শ্রীকুমার কিন্তু 'রূপকথাকে দেখতে চাইলেন তার যথার্থ ঐতিহাসিক কালপর্ব ও সমাজ খণ্ডের মধ্যে রেখে। আমাদের মনে পড়ে, শ্রীকুমারের সমালোচনার ধরনের কথা—

> 'তিনি যখন বিদ্যাপতি পড়াতেন, তখন বিদ্যাপতির রোহভূমি, কালখণ্ড ও ব্যক্তিত্বের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে বিদ্যাপতির শক্তি ও সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধ ও সিদ্ধি আমাদের সামনে মেলে ধরতেন।'[১৩]

সেই বিশ্লেষণী মনোভাব থেকেই শ্রীকুমার দেখান যে, বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার কোনো কালখণ্ড রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত। তাঁর মতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার 'দৃঢ়ীকরণ' সমাপ্ত হওয়ার পর রূপকথার জন্ম। ফলে আলঙ্কারিক বাহুল্যের অন্তরালে, রূপকথায় রয়েছে বাঙালি সমাজের এক 'নিখুঁত' ছবি। বহুবিবাহ, সপত্নী-বিরোধ, সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার—ইত্যাদি বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্টগুলি, সবই রূপকথায় উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত।

এই বক্তব্যের উদাহরণ রূপেই যেন শ্রীকুমার টেনে আনেন একটি বিশেষ 'রূপকথা'-র প্রসঙ্গ—'শ্বেত-বসন্ত।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থে সংকলিত এই গল্পটির পক্ষান্তরে লালবিহারী দে'র 'Folk Tales of Bengali'-এ গল্পটির শিরোনাম—'দ্য স্টোরি

অব্ শ্বেত-বসন্ত'।[১৪] বোঝা যায়, ইংরেজির শিক্ষক শ্রীকুমার লালবিহারীর গ্রন্থে সংকলিত রূপকথাটিরই স্মৃতিচারণা করেছেন।

সেই, সূত্র থেকেই শ্রীকুমারের মন্তব্য, যে এই রূপকথাটির মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য' ও 'পারিবারিক সমস্যা'—একটা আদর্শ শান্তি সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত। তাই, শ্রীকুমার আপাতভাবে রূপকথার মধ্যে বিশেষ 'বাস্তব' সমাজের সন্ধান করেও, শেষাবধি ফিরে গেলেন তাঁর পূর্বের বক্তব্যের কাছেই। জানালেন, তথাকথিত 'বাস্তবজীবনের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে তুলে, 'নিষ্করুণ' দৈবের বিচারকে উল্টে দিয়ে, মানুষের স্বপ্নপূরণের এক মাধ্যম হয়ে ওঠে 'রূপকথা'-র বাস্তব।

ছয়

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, একদা একটি প্রবন্ধে জানান,—

> 'রোম্যান্টিক পন্থী সমালোচক হইলেও রোম্যান্টিক চিন্তাধারার অন্যতম চরম মতবাদ— Art for art's Sake অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবশ্য আস্থা ছিল না।'[১৫]

কলা কৈবল্যবাদে অনাস্থার জন্যই, শ্রীকুমার শুধুমাত্র রচয়িতা নন, 'রূপকথা'-র পাঠকদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের (৪) চিহ্নিত অংশের আলোচ্য বিষয় রূপকথার পাঠক।

শ্রীকুমার এই পাঠকদেরকে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করে নিয়েছেন। একদল যারা কবি প্রতিভার অধিকারী। তাঁরা অনেক সময় রূপকথা থেকেই তাদের কল্পনার খোরাক আহরণ করেছেন। চমৎকার মুন্সীয়ানার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীকে স্পর্শ করে শ্রীকুমার জানান,—

> 'রূপকথার দিগন্ত বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন...'

শ্রীকুমারের মতে আমাদের দেশে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অন্যান্য যে 'দুঃসাহসিকতা'—রূপকথা যেন প্রকারান্তরে আমাদের সামনে সেই সুযোগই এনে দেয়। আর, রূপকথার কল্প জগৎ কবিদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ'কেও যে জাগিয়ে তোলে, সে কথাও জানাতে ভোলেন না শ্রীকুমার। এই প্রসঙ্গেই শ্রীকুমার জানান, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর কথা—যিনি আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, রূপকথার কাছে তাঁর অকুণ্ঠ ঋণের কথা'। পাশ্চাত্যের কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতোই প্রাচ্যের কবি রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থেও যে রয়েছে রূপকথার 'মায়াময় স্পর্শ-তাও মনে করিয়ে দেন শ্রীকুমার।

এ তো গেল কবিদের কথা। কিন্তু, যারা অ-কবি। তারা কি রূপকথার মায়াময় স্পর্শ থেকে বঞ্চিত? শ্রীকুমারের উত্তর-না। কারণ, মানুষের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বোধের অতিরিক্ত তার অন্তরে যে, 'কুহেলিকাময়' প্রদেশ রয়েছে, যেখানে মানুষ তাঁর সমস্ত অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়—সেই কল্পলোকের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিল রূপকথা।

পাঁচ

যাঁরা 'অতীতের' মধ্যে 'শান্তিকুঞ্জ' রচনা করেন, শ্রীকুমার যে তাদের দলভুক্ত নন, তা তো এতক্ষণে বোঝাই গেছে। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় দলভুক্ত শ্রীকুমার প্রবন্ধের (৩) চিহ্নিত অংশে এসে 'উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু'-র মতো রূপকথার নামহীন রচয়িতা আর রূপকথার বিবৃত সমাজ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করেন।

শ্রীকুমারের মতে লৌকিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এখানে—, '...লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন।...যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে।'

'রূপকথা-র ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন শ্রীকুমার। আর, সেই সূত্রেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে, যে রূপকথার মধ্যে কোনো ব্যক্তিস্বার্থের সীমার চিহ্ন নেই, রয়েছে এক 'উদার, বিশাল, অনাসক্ত' ভাবের লক্ষণ। রাজপুত্র বিপদে পড়ে দরিদ্রের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। আবার যখন তাঁর সৌভাগ্য সূর্য উদিত হয়েছে তখন, সেই দরিদ্র উপকারকও তার যথোচিত মর্যাদা পেয়েছে—'সর্বত্রই একটা সাম্যশান্তির ভাব'।

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি রূপকথার অবাস্তবতার অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীকুমার, বাস্তবতার এক ভিন্ন মাত্রায় রূপকথাকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। (৩) চিহ্নিত এই অংশে শ্রীকুমার কিন্তু 'রূপকথাকে দেখতে চাইলেন তার যথার্থ ঐতিহাসিক কালপর্ব ও সমাজ খণ্ডের মধ্যে রেখে। আমাদের মনে পড়ে, শ্রীকুমারের সমালোচনার ধরনের কথা—

> 'তিনি যখন বিদ্যাপতি পড়াতেন, তখন বিদ্যাপতির রোহভূমি, কালখণ্ড ও ব্যক্তিত্বের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে বিদ্যাপতির শক্তি ও সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধ ও সিদ্ধি আমাদের সামনে মেলে ধরতেন।[১৩]

সেই বিশ্লেষণী মনোভাব থেকেই শ্রীকুমার দেখান যে, বাংলাদেশের সমাজ ব্যবহার কোনো কালখণ্ড রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত। তাঁর মতে আমাদের সামাজিক ব্যবহার 'দৃঢ়ীকরণ' সমাপ্ত হওয়ার পর রূপকথার জন্ম। ফলে আলঙ্কারিক বাহুল্যের অন্তরালে, রূপকথায় রয়েছে বাঙালি সমাজের এক 'নিখুঁত' ছবি। বহুবিবাহ, সপত্নী-বিরোধ, সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার—ইত্যাদি বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্টগুলি, সবই রূপকথায় উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত।

এই বক্তব্যের উদাহরণ রূপেই যেন শ্রীকুমার টেনে আনেন একটি বিশেষ 'রূপকথা'-র প্রসঙ্গ—'শ্বেত-বসন্ত।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থে সংকলিত এই গল্পটির পক্ষান্তরে লালবিহারী দে'র 'Folk Tales of Bengali'-এ গল্পটির শিরোনাম—'দ্য স্টোরি

অব্ শ্বেত-বসন্ত'।[১৫] বোঝা যায়, ইংরাজির শিক্ষক শ্রীকুমার লালবিহারীর গ্রন্থে সংকলিত রূপকথাটিরই স্মৃতিচারণা করেছেন।

সেই, স্মৃতি থেকেই শ্রীকুমারের মন্তব্য, যে এই রূপকথাটির মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য' ও 'পারিবারিক সমস্যা'—একটা আদর্শ শান্তি সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত। তাই, শ্রীকুমার আপাতভাবে রূপকথার মধ্যে বিশেষ 'বাস্তব' সময়ের সন্ধান করেও, শেষাবধি ফিরে গেলেন তাঁর পূর্বের বক্তব্যের কাছেই। জানালেন, তথাকথিত 'বাস্তবজীবনের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে তুলে, 'নিষ্করুণ' দৈবের বিচারকে উল্টে দিয়ে, মানুষের স্বপ্নপূরণের এক মাধ্যম হয়ে ওঠে 'রূপকথা'-র বাস্তব।

ছয়

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, একদা একটি প্রবন্ধে জানান,—

> 'রোম্যান্টিক পন্থী সমালোচক হইলেও রোম্যান্টিক চিন্তাধারার অন্যতম চরম মতবাদ— Art for art's Sake অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবশ্য আস্থা ছিল না।'[১৬]

কলা কৈবল্যবাদে অনাস্থার জন্যই, শ্রীকুমার শুধুমাত্র রচয়িতা নন, 'রূপকথা'-র পাঠকদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের (৪) চিহ্নিত অংশের আলোচ্য বিষয় রূপকথার পাঠক।

শ্রীকুমার এই পাঠকদেরকে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করে নিয়েছেন। একদল যারা কবি প্রতিভার অধিকারী। তাঁরা অনেক সময় রূপকথা থেকেই তাদের কল্পনার খোরাক আহরণ করেছেন। চমৎকার মুন্সীয়ানার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীকে স্পর্শ করে শ্রীকুমার জানান,—

> 'রূপকথার দিগন্ত বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন...'

শ্রীকুমারের মতে আমাদের দেশে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অন্যান্য যে 'দুঃসাহসিকতা'—রূপকথা যেন প্রকারান্তরে আমাদের সামনে সেই সুযোগই এনে দেয়। আর, রূপকথার কল্প জগৎ কবিদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ'কেও যে জাগিয়ে তোলে, সে কথাও জানাতে ভোলেন না শ্রীকুমার। এই প্রসঙ্গেই শ্রীকুমার জানান, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কথা—যিনি আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, রূপকথার কাছে তাঁর অকুণ্ঠ ঋণের কথা'। পাশ্চাত্যের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতোই প্রাচ্যের কবি রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থেও যে রয়েছে রূপকথার 'মায়াময় স্পর্শ-তাও মনে করিয়ে দেন শ্রীকুমার।

এ তো গেল কবিদের কথা। কিন্তু, যারা অ-কবি। তারা কি রূপকথার মায়াময় স্পর্শ থেকে বঞ্চিত? শ্রীকুমারের উত্তর-না। কারণ, মানুষের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বোধের অতিরিক্ত তার অন্তরে যে, 'কুহেলিকাময়' প্রদেশ রয়েছে, যেখানে মানুষ তাঁর সমস্ত অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়—সেই কল্পলোকের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিল রূপকথা।

জীবনে যা কিছু 'অপ্রাপ্য' যা মানুষের 'উন্মুখ আশাকে' নিয়ত আকর্ষণরত— তার সবেরই পরিতৃপ্তি রূপকথার কল্পনা জগৎ-এ। শ্রীকুমারের মতে, শৈশবশ্রুত রূপকথা আমাদের মনের মধ্যে জন্ম দেয় এক 'মায়াময় ইন্দ্রজাল'-এ ঘেরা পৃথিবীর। শৈশবের প্রতি তার স্মৃতির প্রতি মানুষের ব্যাকুল ঔৎসুক্য যখন ধাবিত হয়, তখন শৈশবের সেই রূপকথাগুলি মানুষের অন্তরে 'শুকতারা'র মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠে 'বৈচিত্র্যহীন' প্রৌঢ়ত্বকে ভরিয়ে তোলে আনন্দে। নিতান্ত অ-কবির পক্ষে তা-ও কি কিছু কম প্রাপ্তি?

সাত

রূপকথার লেখক পাঠক বা বাস্তবতার আলোচনার মধ্যে শ্রীকুমার কখনো কখনো সামান্য প্রসঙ্গান্তরে গিয়েও অন্যান্য বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মধ্যে একটি রূপকথার উপস্থাপন। লক্ষণীয়, রূপকথা যে একটি মৌলিক রীতির সাহিত্য তার উপস্থাপনার পদ্ধতি সম্পর্কে সেই ইঙ্গিতটি, প্রবন্ধের মধ্যে একাধিকবার রেখে গেলেন শ্রীকুমার। দু'একটি উদাহরণ চয়ন করা যাক্—

(ক) '...রূপকথাকেও ঠাকুরমার মুখ ও নিভৃত গৃহকোণ'...।

(খ) '...ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর'।

(গ) 'রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন বক্রীর করুণার্দ্র, অশ্রুতরল কণ্ঠে কথিত হয়...।

এই উপস্থাপন রীতি, যা রূপকথার প্রাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ছাপাখানার যুগে যে ব্যহত হচ্ছে, যথার্থভাবেই তা লক্ষ করেছেন শ্রীকুমার। তাঁর তীব্র ভর্ৎসনা, রূপকথায়—

> 'যে একটি অনুপম মায়াজাল যে একটির রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে, তাহা স্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বই-এর পাতায় সাহিত্য ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে।'

একদিকে শ্রীকুমার যখন রূপকথার আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, অন্যদিকে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে রূপকথার সমালোচনার পথটিকেও তিনি খুলে দিতে চাইলেন। ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যেও পণ্ডিত ছিলেন শ্রীকুমার। আর তাই, 'শ্বেত-বসন্ত'-এর রূপকথা পড়ে তাঁর মনে হয়, যে এই রূপকথাটির উপর 'রামায়ণ' এর ছায়াপাত ঘটেছে। বাংলা রূপকথা নিয়ে যে ধরনের তৌলন সমালোচনা আমরা পরবর্তীকালে সুকুমার সেনের'গল্পের গাঁটছড়া' গ্রন্থে দেখতে পাব—শ্রীকুমার তারই পটভূমিকায় রচনা করেছেন, দু-একটি আঁচড়ে।

আট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির ছাত্রেরা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষা সংক্রান্ত একটি সকৌতূক বাক্যবন্ধ রচনা করেছিলেন—'ফুটবল খেলার মাঠ সম্পর্কে।'

'পক্ষ্য, পক্ষ্য, গোলরক্ষকের দৃষ্টি বিভ্রান্তির অবকাশে চর্মীয় গোলক...'[১৭]

শ্রীকুমারের ভাষারীতির ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য যে কতখানি অপূর্ব, তা এর থেকে অনুমান

করা যায়। তাঁর এই রচনারীতিকে 'গেটড়ী' রীতি বলেও উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। শ্রীকুমারের বিশিষ্ট এই গদ্যরীতির পরিচয় এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধেও বিধৃত। সমালোচক যথার্থই লক্ষ করেছেন—

'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় বাক্যগুলি প্রায়ই দীর্ঘায়িত হইত'...।[১৮]

উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে আমরা অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারি এরকম কোনো পঙ্‌ক্তি—

'পাতালপুরের নাগকন্যার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আমরা এই চিরপরিচিত পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করি এবং তাহার মণিমাণিক্য দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর, পরিচিততম সূর্যালোকের দর্শন পাই।'

শুধু দীর্ঘায়িত বাক্য নয়, শ্রীকুমারের গদ্যের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য—

'...দুরূহ শব্দের আধিক্য, সমাস বহুলতা, অলঙ্কার প্রাচুর্য ইত্যাদি...।'

এই লক্ষণটিও রূপকথা প্রবন্ধে সহজ লভ্য—

'...বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবাল পালঙ্কে নিদ্রামগ্ন থাকেন, তিনি আমাদের গোপন অন্তঃপুরবাসিনী প্রেয়সী;'...

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনার এক স্থানে, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন—

'প্রত্যেক কাব্যের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এবং তাহার 'শিরায় শিরায় যে প্রাণ তরঙ্গ মালা রাত্রিদিন ধায়, তাহারই পরিচয় তিনি সমালোচনার মাধ্যমে দিয়াছেন।'

'রূপকথা' প্রবন্ধটি সম্পর্কেও উপরোক্ত মন্তব্যটিকে স্বস্তিবাচন রূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

উৎস ও টীকা :

১. পৃ. ৩৮৩, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা—সুদীপ বসু, পুস্তক বিপণী, এপ্রিল ১৯৯৭

২. পৃ. ১১৫, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপঞ্জী—শ্রাবণী পাল; সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (১৩৯৫-১৪০০) সম্পাদক : অলোক রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩. পৃ. ৫১০, উপন্যাস সমগ্র (২) রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ১৯৯৪

৪. P.VIII মলয় বসু, বাংলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা, কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮০

৫. ঐ. পূর্বোক্ত P.VIII.

৬. পৃ. ১২৯, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচার্য প্রণাম—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পূর্বোক্ত।

৭. পৃ. ৭৫২-৫৩, 'ছেলেভুলানো ছড়া ১, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য়)- বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০

৮. পৃ. ৪৭, কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, মাঘ ১৪০৯

৯. পৃ. ১৬১, শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য—যোগ্যমনি চক্রবর্তী, অরুণা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

১০. তার মধ্যে একটি —'বিবেকানন্দ ও বাঙালী জীবন' সংকলিত হয়েছে শনিবারের চিঠির 'প্রবন্ধ সংকলন'-৫, সম্পাদক রঞ্জনকুমার দাস, পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স।

১১. ঐ পৃ. ২২-২৩, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০৮

১২. পৃ. ১১৯, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাপূর্বোক্ত

১৩. পৃ. ১২৯-৩০, 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-আচার্য প্রণাম'—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-পূর্বোক্ত।

১৪. ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৯

১৫. বাংলার উপকথা— লীলা মজুমদার, পৌষ ১৩৯৪, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী।

১৬. সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা-পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের— আচার্য প্রণাম—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১৮. পৃ. ১১১, সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

১৯. পৃ. ৮৯, পূর্বোক্ত।

বাংলা অনুবাদে রুশ সাহিত্য

বিপ্লব মাজী

১৮৭০-এ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বাংলা পাঠকদের জন্য ক্রিলভের নীতিগল্পমালা অনুবাদ করেন। এ পর্যন্ত এই অনুবাদটিকেই বাংলা সাহিত্যে রুশ সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ বলে ধরা হয়। যদিও, এটা ধরে নেওয়াই ভালো অনুবাদক ইংরেজি থেকে এই অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। মূলের কতটা অনুগত ছিলেন? তাও বলা সম্ভব না। কিন্তু এই অনুবাদটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে, এই অনুবাদের মাধ্যমেই আমরা একটি নতুন দেশের সাহিত্যের স্বাদ প্রথম পেলাম। তাছাড়া ক্রিলভ রুশসাহিত্যের একজন সুপরিচিত লেখক ছিলেন। তাঁকে বলা হয় প্রথম রুশ বাস্তববাদী লেখক।

১৮৮০-৮১ সাল নাগাদ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলা মাসিক পত্র 'ভারতী'-তে 'রুশ ভাষা ও সাহিত্য' নিয়ে যে গদ্যটি লেখেন— সেখানেই আমরা প্রথম রুশ সাহিত্যের তিন দিকপাল লেখক (যাঁরা তখন জীবিত) তুর্গেনেফ, দস্তয়েভস্কি ও তলস্তোয়-এর পরিচয় পাই। 'ভারতী' বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের পত্রিকা।

১৯২০-তে অন্নদাশঙ্কর রায় মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর লেখক জীবন শুরু করেন তলস্তোয়-এর 'তিনটি প্রশ্ন' উপকথা বাংলায় অনুবাদ করেন— যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের পত্রিকা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন: তাঁর সাহিত্যের হাতেখড়ি তলস্তোয়-এর কাছে।

এরপরেই বাংলা অনুবাদে রুশভাষার বিখ্যাত লেখকদের গল্প বের হতে থাকে। লেভ তলস্তোয়ের প্রথম গল্প বাংলায় বের হয় 'দাসী' পত্রিকায়, তারপর অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়। ৎসারের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য এবং তাঁর লেখার মহৎ গুণে তলস্তোয় আমাদের কাছে 'ঋষি' বলেও পরিচিতি পান। 1905 থেকে গোর্কিও অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ঝড়ের পাখি হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকেন। তুর্গেনেফের 'শিকারীর রোজনামচা'-র এবং চেখফের কয়েকটি গল্পের অনুবাদ বাংলা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রুশ সাহিত্য আমাদের কছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, তার কারণ, আমরা যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিরুদ্ধে এ সময় স্বাধীনতার লড়াই করছিলাম, রুশ জনগনও রাশিয়ারের ৎজারের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদে আমরা দুটি বিষয়ে অসহায় ছিলাম:

১. রুশ ভাষার সঙ্গে সরাসরি আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই তার স্বাদ নিতে হত।

২. রুশ সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদও খুব কম ছিল এবং তা হাতে পাওয়া আরো কঠিন কাজ ছিল। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা চাইত না রুশ সাহিত্য প্রবেশ করুক।

১৯১৭-এ অক্টোবর বিপ্লবের পরে পরিস্থিতি বদলে যায়। অক্টোবর বিপ্লব আমাদের পরাধীন দেশগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রভুদের হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন আরো জোরালো ভাবে দেখাতে শুরু করে। বিশেষ করে শ্রমিক কৃষকরা যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে একটি দেশের ক্ষমতায় আসতে পারে, ভারতীয়দের মনে তা অন্তর্নিহিত প্রেরণার কাজ করে। রুশ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক ও দ্রুত পরিচিতি ঘটতে থাকে। তুর্গেনেফ, তলস্তোয়, দস্তয়েভস্কি-র গল্প ও উপন্যাস আমাদের মনের ভেতর আধ্যাত্মিকভাবে প্রবেশ করতে থাকে। চেখফ, গোর্কি যেন আমাদেরই লেখক। আমাদের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে গোর্কির 'মা' প্রেরণা হয়ে ওঠে। যদিও, এ-সময় পর্যন্ত পুশকিন, গোগল, লেরমনতফ-এর মতো কবি ও গল্পকার, বেলিনস্কি, চের্নিশেভস্কি, হারজেন, দব্রলিউবফ-এর মতো রুশ সাহিত্য সমালোচকরা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁরাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আমাদের পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন। রুশ বিপ্লবের সময়-এর কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকরাও আমাদের কাছে অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন— যেমন, আলেকসান্দর ব্লক, ভ্লাদিমির মায়কোভস্কি, সির্গেই এসেনিন, ব্যাবেল, কনস্তানতিন ফেদিন, গ্ল্যাদকভ, মিহাইল শলোকভ, ইভান বুনিন, পরবর্তীকালে আনা আখমাতোভা, মারিয়াৎসেতায়েভা, বরিস পাস্তেরনাক, সলঝেনিৎসিন প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা রুশ ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো ঘন করে তোলে। ১৯৩৩-এ রাশিয়া থেকে সাহিত্যের নতুন ডিসকোর্স 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র কথা ঘোষণা করা হয়। নাৎসি ও ফ্যাসিস্তদের উত্থানে ইউরোপ ছাড়াও গোটা মানবসভ্যতার যে সংকট ঘনীভূত হয় তার বিরুদ্ধে বাংলার কবিসাহিত্যিক-শিল্পীরা ফ্যাসিস্ত বিরোধী সঙ্ঘ গড়ে তোলেন— যেখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এবং পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী লেখকরা যেমন যোগ দেন, অন্যদিকে সমর সেন, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য-র মতো কবি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণময় মান্না, ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু-র মতো কথাশিল্পীরা, 'নবজীবনের গান' নিয়ে গায়ক ও সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, গণনাট্য সঙ্ঘে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখ ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। বাংলাসাহিত্যে ক্রমেই গোর্কি, শলোখভ, অস্ত্রোভস্কি ঘরোয়া নাম হয়ে উঠতে থাকেন। ব্যক্তিগত স্তরে যেমন মূল রুশ থেকে বা ইংরেজি থেকে রুশ সাহিত্যের অনুবাদ বাড়ল, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশী সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো থেকে রুশ সাহিত্য বাংলায় অনূদিত হয়ে এ-দেশে আসতে শুরু করল, যার ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। আর এইভাবে আপাতভাবে রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ আমাদের মনের আত্মিক স্তরেও পরিবর্তন আনল। অক্টোবর বিপ্লবের গভীর প্রভাব অনুভূত হল বাংলা সাহিত্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের ও ফ্যাসিস্তদের পরাজয়ের পর, রুশ সাহিত্যের

পরিধিও বেড়ে গেল, রুশ সাহিত্য থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সোভিয়েত সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ঘটল। যার ফলে নানা বৈচিত্র্যের, নানা জাতি উপজাতির সাহিত্যের স্বাদ আমরা রুশ → বাংলা, বা রুশ → ইংরেজি → বাংলা বা উপজাতি → ভাষা → রুশ → বাংলা-র মাধ্যমে আমরা পেতে থাকলাম— যুরি নাগিবিন, ভ্যাসিলি শুকসিন, চিঙ্গিজ আইৎমাতফ, ওলঝাস সুলেইমানভ, ইউরি রীতখেউ, এফগেনি এফতুশেঙ্কো, আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি, বেলা আখমাদুলিনা, রর্বেত রোজদেস্তভেনস্কি প্রমুখের লেখা আমরা বাংলা ভাষায় পেতে থাকলাম। অনুবাদে তৃতীয় কোনো ভাষার বেড়া ক্রমেই উঠে যেতে লাগল। রুশ সাহিত্য বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি ও লেখকদের মাধ্যমে, যাঁরা রুশভাষা মাতৃভাষার মতো শিখে নেন, অনূদিত হতে থাকল। অগ্রণী অনুবাদক হিসেবে মস্কোয় থেকে কাজ করতে শুরু করলেন ননী ভৌমিক, সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সোম, প্রফুল্ল রায়, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হায়াৎ মামুদ, খালেদ চৌধুরী প্রমুখ (বর্তমান প্রতিবেদকও এই দলে যোগ দিতেন, চুক্তিপত্রে সই করার পরও তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সতর্কতায় কাজে যোগ দেননি)। সোভিয়েত বিদেশী ভাষা প্রকাশালয় শুধু নিজেরা রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ শুরু করলেন না, বিদেশি প্রকাশনালয়গুলিকেও অনুবাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এখন আমরা বিশ্বায়ন বা মার্কিনি যে আউটসোর্সিং এর কথা শুনছি, রুশ সাহিত্যের বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে তা অনেক আগেই শুরু হয়ে যায়। এই আউটসোর্সিং-এর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ-বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে রুশ ভাষার ও সাহিত্যের সম্পর্ক ও সেতু তৈরি করা। এই অনুবাদকে কেন্দ্র করে যেসব সাহিত্য সভা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হত তা দু-দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মত ও দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের সুযোগ করে দিত। সাহিত্য সম্ভব করল সংস্কৃতির বিনিময়। অনুবাদকে কেন্দ্র করে উভয়দিক থেকে সাহিত্য পুরস্কার শিল্পী সাহিত্যিকদের আরো ঘনিষ্ঠ করল। নতুন পাঠক সমাজ তৈরি হল। বাংলা সাহিত্যে রুশ সাহিত্যের এক বিরাট প্রভাব পড়ল।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা সাহিত্য প্রধানত সাধারণ মানুষের জন্য। আমাদের চর্যাপদ, রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবতগীতা, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব কবিতা, পদাবলী, কথকথা, যাত্রাপালা, মুখফেরতা সাহিত্য— সবই প্রায় পুঁথিকেন্দ্রিক বা স্মৃতিধার্য সাহিত্য হিসেবে যুগের পর যুগ রসিকজনের মনকে বিমোহিত করেছে। ব্রিটিশরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করার পর থেকে আমরা সবকিছু পশ্চিমি চোখে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। কৃত্রিম স্রোতটি মূলস্রোতকে অন্তত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের চোখের আড়াল করে দিয়েছে। বাংলা ভাষার লোকায়ত সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডার গ্রামজীবনে অবহেলিত থেকে গেছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হয় আদিবাসী সাহিত্য— যা পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও বাংলা ভাষায় লেখা হত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ আমরা পেয়েছি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী উত্তরাধিকার। ফলে বাংলা সাহিত্য সহজেই রুশ সাহিত্যকে গ্রহণ করতে পেরেছে। পাঠকেরা রুশ সাহিত্য পাঠে নান্দনিক আনন্দ পেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত রাশিয়ার ট্রমা-র সঙ্গে স্বাধীনোত্তর দেশভাগের ট্রমা আমাদের বাংলা

সাহিত্যে সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হলেও, উদ্বাস্তুশিবিরগুলি যুদ্ধে আশ্রয়প্রার্থীদের শিবিরগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কবি বিষ্ণু দে এমনি বলেননি: গঙ্গায় পাই ভালসার প্রতিমান। রুশ যুদ্ধ সাহিত্যও আমাদের বাংলা সাহিত্যেপ্রভাব ফেলেছে— প্রধানত মানবিকতার ঐশ্বর্যে। ভারতবর্ষও যেহেতু নানা ভাষা, নানা জাতি উপজাতির দেশ, সোভিয়েত সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে যে বিতর্কই থাক— তা আমাদের মতো শতকরা ৮০ ভাগ গরিব মানুষের দেশের পাঠক সমাজকে প্রভাবিত করেছে। সোভিয়েত বা রুশ সাহিত্যের আত্মীয়তার বন্ধনই দিনে দিনে দৃঢ় হয়েছে। রুশ সাহিত্যের মহান কবি, গল্পকার, উপন্যাস লেখকরা আজ শুধু বাংলা সাহিত্যের সম্পদ না, ভারতীয় ও বিশ্বসাহিত্যেরও সম্পদ। প্রাচীন রুশ সাহিত্য, মধ্যযুগের রুশ সাহিত্য ও আধুনিক রুশ সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরম্পরাগত একটা সুন্দর মিল আছে— যা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়। দু'দেশের সাহিত্যে দানব দেবতা অপদেবতা যারাই থাক— কেন্দ্রে রয়েছে মানবোপম মানুষ।

অনুবাদ নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। রুশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে কবিতা অনুবাদের ব্যাপারে আমরা সেইসব মত নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি— যা অনুবাদ নিয়ে আমাদের ধারণা অনেক স্বচ্ছ করবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজের অনুবাদকর্মকে *প্রতিধ্বনি* বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন কবিতা কথা ও উপলব্ধির অদ্বৈত। অতএব তার রূপান্তর অসম্ভব। কেউ কেউ বলেন যা অনুবাদ করা যায় না তা হল কবিতা। অনুবাদ শুধু কবিতার অর্থ স্থানান্তর করে। কবিতার সত্তা মূল কবিতায় থেকে যায়। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু হ্যেল্ডার্লিনকে অনুবাদ করতে গিয়ে বলেন: 'জর্মান না হলে হ্যেল্ডার্লিনকে বোঝা যায় না', এই মন্তব্য জার্মান সমালোচকরা মাঝে মাঝে করে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো সৎ সাহিত্য-প্রণেতা শতকরা একশো পরিমাণে শুধুমাত্র স্বজাতীয় হতে পারেন না, এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে এই কবি, বহুদূর পর্যন্ত, অনুবাদে আমাদের অধিগম্য। বরিস পাস্তেরনাকের ডাঃ জিভাগো কবিতা অনুবাদের সময় লেখেন: 'রুশ ভাষা একবর্ণ জানি না, মূলের ধ্বনি বা শব্দের দ্যোতনা বিষয়ে কিছুই ধারণা নেই। তবু, আমি যেমন মোটামুটি ইংরেজি অনুবাদ থেকেও অনেককিছু পেয়েছি, তেমনি কোনো কোনো সংবেদনশীল পাঠক হয়তো এই চলনসই বাংলা থেকেও পাবেন। কবিতায় সারবস্তু যত বেশি থাকে ততই অনুবাদ তাকে কম জখম করতে পারে।' বিষ্ণু দে চিনে কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে লেখেন: 'চৈনিক থেকে অনুবাদ দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথমত, সে ভাষার অক্ষরের বা শব্দের মৌলিক চিত্রধর্ম এবং টেলিগ্রাফের ভাষার মতো শব্দ-সংক্ষেপ এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ ও ধাতুরূপ অন্য ভাষায় আনা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, ধ্রুপদী চৈনিক কবিতার ভিত্তি অত্যন্ত রূপকঠিন বিন্যাসের ঐতিহ্যে। শব্দের সংখ্যা পদে পদে স্থির, পদসংখ্যা ও বিন্যাস নির্দিষ্ট, মিলগুলিও বাঁধাধরা। তাছাড়া আছে স্বরমাত্রার ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাজিম হিকমত অনুবাদ করতে গিয়ে লেখেন (নাজিম হিকমত তুর্কি ও রুশভাষায় লিখতেন): 'কবিতায় অকৃত্রিম কিংবা অবিকল ভাষান্তর কখনও সম্ভব নয়। অনুবাদক শক্তিশালী এবং নিষ্ঠাবান হলে বড়জোর তিনি করতে পারেন অন্যের কবিতাকে নিজের ভাষায় যথাসম্ভব ঢেলে সাজাতে। এ কাজে খানিকটা সুবিধে হয় মূল ভাষা জানা থাকলে কিংবা তার খানিকটা আঁচ পেলে।'

হ্যেল্ডার্লিন অনুবাদে বুদ্ধদেব বসুর অবলম্বন ছিল হেল্ডার্লিনের ভিন্ন-ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ, মূল জার্মান লেখা এবং জার্মান-ইংরেজি অভিধান। অভিধানের সাহায্যে তিনি কবির অভিপ্রায় ও শব্দপ্রয়োগ বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। একই কবিতার বিভিন্ন ইংরেজি অনুবাদের পাঠ মিলিয়ে দেখেছেন। কখনো বা সমালোচকের ব্যাখ্যা বা টীকা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ-ভাবেই মূলভাষার জ্ঞানের অভাব পুষিয়ে নিতে চেয়েছেন। মূলের পঙতিসংখ্যা, স্তবক বিন্যাস অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। চিত্রকল্প যাতে অনাহত থাকে, কবিতার সারবস্তু যাতে বিকৃত না হয় এসব দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। সবচেয়ে যে বিষয়টিতে বুদ্ধদেব বসু গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হল: অনুবাদগুলি যাতে বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য হয়। বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন: 'কবিতার অনুবাদের পক্ষে কবিতা হয়ে ওঠাই সবচেয়ে জরুরি দরকার।' রাইনের মারিয়া রিলকের অনুবাদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। বিষ্ণু দে ও *হে বিদেশী ফুল*-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন: 'যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে।' পাবলো নেরুদার অনুবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই বইতেও মূল কবিতা আর স্প্যানিশ অভিধান পাশে রেখে আমার তর্জমায় ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ করেছি।' অন্যদিকে ফারসি না জেনেও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রেওতীলাল শাহ-র সাহায্যে সরাসরি বাংলা হাফিজ অনুবাদ করেছিলেন। একই পদ্ধতিতে সাহিত্য অকাদেমি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা থেকে সরাসরি অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করছেন। ১-৩ জানুয়ারি ওড়িয়া-বাংলা অনুবাদ ওয়ার্কশপে যোগ দিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই দুই পদ্ধতি আমি সালভাতোর কোয়াসিমোদো (ইতালি), পাবলো নেরুদা, গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল কবিতা অনুবাদের সময়প্রয়োগ করেছি। স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান ভাষা পড়তে পারি। ফলে মূল কবিতার সঙ্গে স্প্যানিশ অভিধান ও ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে অনুবাদের কাজ করেছি। ইতালিয়ান ভাষা পাঠের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছি। নোবেল জয়ী বরিসপাস্তেরনাক, আনা আখমাতোভা, এফগেনি এফতুশেঙ্কো, আন্দ্রেই ভজ্‌নেসেনস্কি, বেলা আখমাদুলিনা, রর্বেত রোজদেস্তভেনস্কি অনুবাদে রুশ ভাষাই আমার অবলম্বন হয়েছে। মস্কো-র প্রগতি প্রকাশনে জল কেন ভেজা শিরোনামে ছোটদের একটি বই মূলরুশ থেকে অনুবাদ করেছিলাম।

অন্য দেশের কবিতার ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, 'যাঁরা বিশুদ্ধ রস খুঁজতে যাবেন তাঁদের নিরাশ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা।' অর্থাৎ তিনি মনে করেন অনুবাদ কবিতার পক্ষে বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে বর্তমান প্রতিবেদকের সম্পাদিত 'গোলাপেরা, শিশিরচুম্বিত' নোবেল বিজয়ী

ছ'জন কবির অনুবাদ কবিতার বই-এর ভূমিকাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন; 'কবিতার সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়, একথা যেমন সত্য, সেইরকমই, কবিতা অনুবাদের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে, একথাও তেমনই সত্য। মূলের বদলে অনুবাদ পাঠ যদি মধুর অভাবে গুড়ের সঙ্গে তুলনীয় হয়, তা হলে একথাও বলতে হয় যে কিছু কিছু গুড়ের স্বাদও তো বেশ ভালো, লোভনীয়। মূল রচনা কিংবা মধু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করবো না, এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ করলে আমাদের অজ্ঞতা ক্রমশই পাহাড় প্রমাণ হবে। আমরা যারা ফরাসী-জার্মান-স্প্যানীশ জানি না, সেই পাঠকশ্রেণী বদলেয়ার, হাইনে, নেরুদাকে বড় কবি হিসেবে চিনলুম কী করে, অনুবাদ পড়েই তো। অনুবাদেই আমরা কালিদাস কিংবা রিলকে-কে প্রিয় কবি হিসেবে পেয়েছি।'

রবার্ট ফ্রস্ট মনে করতেন কবিতা নিজের ভাষার সীমানা ছেড়ে যেতে চায় না। এতই গোঁড়া জাতীয়বাদী শিল্প যে তাকে এক ভাষার সীমান্ত ছাড়িয়ে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া কঠিন।

একভাষা থেকে অন্যভাষায় রূপান্তর করলে অর্থ একই থাকে কিন্তু শব্দের ধ্বনি অন্যরকম হয়ে যায়। চিত্রকল্প অন্যরকম হয়ে যায়। অর্থাৎ রুশভাষা থেকে বাংলা ভাষার সমার্থক শব্দ বসালেই মূল কবিতার স্বাদ পাওয়া যাবে, তার কোনো মানে নেই। তাছাড়া একটি ভাষা অন্য ভাষার থেকে দুর্বল হতে পারে। সমার্থক শব্দ হলেও তাদের ক্ষমতা সমান না। এক এক ভাষার এক একরকম বুৎপত্তি, ইতিহাস সম্পৃক্ত অনুষঙ্গ এবং শৈলী। ফলে মূল ভাষার বাক্য যে আবেগ যে প্রেরণা জাগায় অনূদিত ভাষায় সে আবেগ সে প্রেরণা নাও জাগাতে পারে। তবু অনুবাদ না করে আমাদের উপায় নেই। একটু আগেই কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছি— অনুবাদে মধু না পেয়ে গুড় পেলেও চলবে। অনুবাদের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় পাই। শুধু ভারতেই ৭০০-র বেশি ভাষা উপভাষা আছে। পৃথিবীতে আছে প্রায় ৩৫০০ ভাষা। কোনো ব্যক্তির পক্ষে একজীবনে দু-তিনটের বেশি ভাষা জানা সম্ভব না। হাতে গোণা প্রতিভাবানরা বড়জোর ৭/৮টি ভাষা জানতে পারেন কিন্তু সব ভাষাতেই ভালো অনুবাদ করতে পারবেন তার কোনো মানে নেই। বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ পেতে হলে ভাষার সঙ্গে ভাষার সেতু অনুবাদের মাধ্যমেই বাঁধতে হবে। অনুবাদের মধু আর গুড় নিয়ে যে তত্ত্বই রচিত হোক রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়দ-ওদিসি, মেঘদূত, সেক্সপীয়র, দান্তে, বোদলেয়ার, রিলকে, নেরুদা, পাজ, পাস্তেরনাক, এলুয়ার আমরা অনুবাদের মাধ্যমেই পড়ি। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার গল্প, উপন্যাস, লোককথা, উপকথা অনুবাদের মাধ্যমেই পড়ি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় চর্যাপদ তর্জমা করতে গিয়ে লেখেন— 'অনুবাদ যে সন্দেহ নেই। তবে বাংলা থেকে বাংলায়-পুরানো থেকে নতুনে। হাজার বছর পরেও কি আজকের বাংলাকে সেদিনের তর্জমা করে দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথের বাংলা হয়ত এই পরিবর্তনের গতিবেগকে অনেকদিন অবধি ধরে রাখতে পারবে। তাও চিরদিন নয়।'

১৯৭৬-৭৭ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বান্ধবী এভানথিয়া রেখার কাছে রুশভাষা শেখার ফাঁকে যখন গ্রিক ভাষা শিখতে চাইলাম— সে জিগ্যেস করল কেন গ্রিক ভাষা শিখতে চাইছি? বললাম প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য মূল ভাষায় পড়তে চাই। উত্তরে সে বলল প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য যে গ্রিক ভাষায় লেখা তা আমিও জানি না। অতএব তোকে শেখাবো কিভাবে? মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আধুনিক গ্রিক-এর সঙ্গে প্রাচীন গ্রিকের এতই তফাৎ ঘটে গেছে যে একমাত্র তর্জমায় তা বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ গ্রিক থেকে আধুনিক গ্রিকভাষায় অনুবাদ করতে হবে।

মস্কো থেকে ফিরে এক বিদগ্ধ কবি বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম— রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। ব্যাপারটা ছিল যৌবনের দুঃসাহস! ইতিমধ্যেই আরো প্রায় তিরিশ বছর চলে গেছে। বিগত সত্তর বছরে বাংলা ভাষা অনেক বদলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাংলা থেকে বাংলায় অনুবাদ করাই যায়।

অন্যদিকে বর্তমান বাংলা ভাষাকে চর্যাপদের ভাষায় অনুবাদ করে নিতে পারলে, আমরা কিন্তু ওড়িয়া, হিন্দি, মৈথেলির আদিপর্বের ভাষায় চলে যাবো। অর্থাৎ একটা ভাষা শিখলে চারটে ভাষার কাজ চলে যাবে। অবশ্য যে কোনো অনুবাদে মুখের মিলের চেয়ে মনের মিলই পাড়ির টান তৈরি করে। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে কবির মনের সঙ্গে মনের মিল থাকা চাই।

প্রখ্যাত রুশ সাহিত্য সমালোচক বেলিনস্কি বলেছিলেন: 'অনুবাদ সাহিত্য মৌলিকের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' প্রিয় বিদেশি কবি বা লেখকের লেখা যে কোনো পাঠকই মাতৃভাষায় পড়তে ভালোবাসেন। এ-ক্ষেত্রে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটলেও কম না।

অনেক সময় অনুবাদ আমাদের মৌলিক রচনা ও অনুবাদের দিগন্তরেখা মুছে দেয়। অনুবাদে অন্য দেশের নিসর্গ দৃশ্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যবেশিরভাগ ক্ষেত্রে কবি বা লেখকের মৌলিক রচনার প্রেরণা হয়ে ওঠে। যেমন হয়ে বিখ্যাত রুশ কবি বরিস পাস্তেরনাকের কাছে যখন তিনি শেকসপীয়র অনুবাদ করেন। জীবনের এক কঠিন সময়ে হ্যামলেট অনুবাদ করেন। জীবনের এক কঠিন সময়ে হ্যামলেট অনুবাদে তিনি মনের শান্তি পেয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাজিম হিকমত অনুবাদ প্রসঙ্গেও একথা বলা চলে। নাজিম হিকমত অনুবাদের পর তাঁর কবিতার চেহারা বদলে যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: 'অনুবাদকে আমি সঙ্গের সাথী করেছি প্রধানত দুটো কারণে। এক, মৌলিক লেখার শূন্যস্থান পূরণের জন্যে; দুই, বাংলা ভাষার ওপর দখল আনতে।' অনেক সময় নিজের লেখার একঘেয়েমি কাটাতে আমরা অনুবাদে হাত দিই। অন্য ভাষার লেখা নিজের ভাষার ছাঁচে আনার মধ্যে যে লড়াই তাতে বেশ আনন্দ আছে।

রুশ থেকে বাংলা অনুবাদে একটা বড় সমস্যা বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যা। বাংলা ভাষায় রুশ নামের উচ্চারণ লেখা অসম্ভব। রুশীরা ভয়ঙ্কর শীতের দেশের মানুষ আর

আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের। ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালার সাহায্য নিয়ে এ-সমস্যা কিছুটা সমাধান করা গেলেও, রুশী উচ্চারণের সেইসব লিখিত রূপ-এ আমরা অভ্যস্ত নয় ফলে নামগুলি খটোমটো লাগবে। অন্য একটি সমস্যা দীর্ঘসময় ধরে দেখা দিচ্ছে রুশী নামগুলো আমরা ইংরেজি উচ্চারণে পাঠ করতে অভ্যস্ত। আমরা তলস্তোই বা তলস্তোয় উচ্চারণ না করে 'টলস্টয়' উচ্চারণ করি, দস্তয়েভস্কি - ডস্টয়েভস্কি, মায়াকোভ্স্কি - মায়াকোভ্স্কি, চোখভ বা চোখফ - চেখভ্, চেখফ্, শেখভ্, তুর্গেনেফ - টুর্গেনিভ, ইরমিলভ - ইয়েরমিলভ, স্তালিনগ্রাত বা লেনিগ্রাত - স্টালিনগ্রাড, লেনিনগ্রাড। রুশ থেকে বাংলা অনুবাদে একথা মনে রাখা ভালো রুশ ভাষায় 'ট', 'ড' বর্গের কোনো স্থান নেই। গেরাসিম ল্যেবেদেভ বা ল্যেভেদেফ কখনই হেরাসিম লেবেডেফ হতে পারে না। কিন্তু বাংলা ভাষার বিশিষ্ট পন্ডিতবর্গ এবং ইংরেজি থেকে রুশ সাহিত্য অনুবাদকরা দিনের পর দিন, ট, ড-ব্যবহারে 'টলস্টয়', 'ডস্টয়েভস্কি', 'টুর্গেনিভ' লিখে লিখে এমন পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছেন যে সঠিক রুশ উচ্চারণকে অনেক পাঠক ভুল উচ্চারণ মনে করেন। রুশ ভাষায় Ch, F, V-র উচ্চারণে আমরা যে 'খ', 'ফ' ও 'ভ' উচ্চারণ করি তা অনেকটা 'হ্ব'-র উচ্চারণের মতো। তবে, এক্ষেত্রে অনুবাদক খ, ফ বা ভ রেখে দিলে ক্ষতি নেই। মূলরুশ থেকে যাঁরা সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই— সমস্যা তখনই যখন কেউ ইংরেজি থেকে, বা ফরাসি থেকে কোনো রুশ কবি বা সাহিত্যিকের লেখা বাংলায় অনুবাদ করেন। একটু সতর্ক থাকলেই, এ-সমস্যার সমাধান তাঁরা করে ফেলতে পারবেন।

রুশভাষা থেকে কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্য একটি সমস্যা আছে। রুশভাষা জানলেই রুশ কবিতা অনুবাদ করা যায় না। এক্ষেত্রে অনুবাদককে হতে হবে মৌলিক স্রষ্টার মতন। অনুবাদ কবিতাকে একটা নতুন কবিতা হয়ে উঠতে হবে। মূল কবিতার ভাষার স্বভাব বা ধর্ম, কবির ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল ভাষার প্রকৃতি, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, ছন্দ-মিল সম্পর্কে যেমন অন্তত প্রাথমিক ধারণা রাখতে হবে, যে ভাষায় অনূদিত হচ্ছে সে ভাষার ও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে হবে— নতুবা শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়া হয়ে যাবে। ব্রের্টল্ট ব্রেশট মনে করতেন কবির ভাবনা ও চিন্তাই অনূদিত হওয়া উচিত। মূলের ছন্দ অনুবাদে ধরে রাখতে পারলে ভালো। যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সেই ভাষায় তা যেন কবিতা হয়ে ওঠে। একদল চান মূলের প্রতি দাসত্ব, অন্যদল চান মূলের থেকে মুক্তি, স্বাধীনতা। যাঁরা দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করেন তাঁদের অনূদিত কবিতা যতটা না অনুবাদ তার চেয়ে বেশি মৌলিক কবিতা। বিষ্ণু দে এলিয়ট অনুবাদে এরকম স্বাধীনতা নিয়েছেন, জীবনানন্দ ইয়েটস অনুবাদে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাবলো নেরুদা অনুবাদে— যেখানে অনুবাদ কবিতা হয়ে গেছে প্রায় মৌলিক কবিতা।

অনুবাদে একটি ভাষার সঙ্গে অন্য একটি ভাষার সেতু রচিত হয়। অনুবাদ একভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সীমানা মুছে দেয়। একভাষার সাহিত্য, সংস্কৃতি অন্য ভাষায় চলে আসে। লেনদেনে দুটি ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। অনুবাদ নিয়ে মজার মজার প্রবচন পৃথিবীর

প্রায় সব ভাষাতেই আছে। যেমন অনুবাদ সম্পর্কে ফরাসিরা মনে করেন: সুন্দরী কদাচ সতী হয়, সতী কদাচ সুন্দরী হয়। ইতালিয়ানরাও অনুবাদ সম্পর্কে প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করেন: বিশ্বস্ত কিন্তু কুৎসিত রমণী, সুন্দরী রমণী কিন্তু অবিশ্বাসী। অনুবাদে কবিতা স্বতন্ত্র সুন্দর কবিতা হয়ে উঠবে, না মূলের প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য রাখবে? — এ সমস্যায় সব অনুবাদককেই পড়তে হয়। পোগ্গিওলি সুবচন অনুযায়ী কবিতাটি যদি খাঁটি সোনা হয় অনুবাদে খাঁটি সোনাই বেরিয়ে আসবে। ভলাদিমির নবোকভের সূত্র অনুযায়ী বলা যেতে পারে: অনুবাদে গোলাপ গোলাপের-কাঁটা হয়ে গেলেও তা গোলাপের অংশ বিশেষ— গোলাপের সৌরভ তাতে থাকবেই। ভাবানুবাদে মূলের কিছু অর্থ যেমন হারিয়ে যায়, কিছু যোগ হয়। আভিধানিক অনুবাদে মূলের প্রাথমিক অর্থ ও বিন্যাস পাওয়া যায়। আক্ষরিক অনুবাদে মূলের প্রতি, প্রাসঙ্গিক অর্থের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করা যায়।

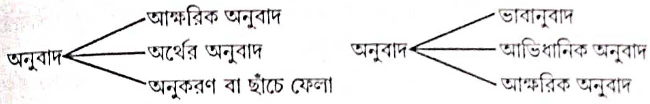

অনুবাদে অন্য যে সমস্যাটি আসে তা হল যে বিষয়টি অনুবাদ করা হচ্ছে তা কোন শতাব্দীতে বা কোন সময় রচিত? মানুষের জীবনযাত্রা, স্বরধ্বনি, শব্দের ব্যবহার, সংস্কৃতি প্রতি যুগে বদলে যাচ্ছে। দীর্ঘ সময় নিলেও ভাষাও বদলে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি বই যেভাবে অনূদিত হয়েছে (বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে) বিংশ শতাব্দীতে তার ভাষা ও স্টাইল বদলে যেতে বাধ্য, একবিংশ শতাব্দীর অনুবাদে অন্যরকম হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু সময়ের একই স্থানাকে দাঁড়িয়ে ইগরগাথা, পুশকিন, মায়াকোভস্কি অনুবাদ করি। অন্যদিকে কবির মেজাজ-মর্জি-অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অনুবাদের স্তরায়ণ বা বদল ঘটে। বরিস পাস্তেরনাককে বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক বা অরুণ সোম এক-একরকম অনুবাদ করবেন। যে পাঠকৃতি তৈরি হোক পাঠকেরা তাঁদের মেজাজ ও মর্জি অনুযায়ী তা বিনির্মাণ করে নেন ও পাঠ করেন।

বিগত শতাব্দীর চারের দশক থেকে রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদে বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিকরা মনোযোগ দেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের জয় যাত্রার প্রভাবে বাংলা ভাষাতেও রুশ সাহিত্য অনুবাদে একটা জোয়ার আসে। মস্কোর বিদেশি সাহিত্য প্রকাশনালয়— যেমন প্রগতি বা পরে রাদুগলা থেকে যেমন রুশসাহিত্য বাংলাভাষায় অনূদিত হয়ে প্রায় পঁচিশ কোটি বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকে— অন্যদিকে প্রথিতযশা বাংলাভাষার কবি সাহিত্যিকরা কিছুটা স্বেচ্ছায় কিছুটা সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করতে রুশ সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষায় রুশ সাহিত্যের আয়তন বাড়তে থাকে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন

সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনে, হঠাৎই রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদে ভাঁটা পড়ে যায়। যদিও বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য ভাষায় আজও পুশকিন, তুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্কি, তলস্তোয়, চেখফ, মায়কোভস্কি, ব্লক, এসেনিন, বুনিন, আখমাতোভা, শলোকভ, পাস্তেরনাক, সোলঝেনিৎসিন, ব্রদস্কি, এফতুশেঙ্কো,ভজনেসেনস্কি-র মতো প্রতিভাবান কবি ও কথাকারদের অনুবাদ হয়ে চলেছে। যতদূর জানি, ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমিও এ-ব্যাপারে তৎপর। রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করবে মনে হয়।

বাংলা অনুবাদে রুশ সাহিত্য সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে— সাহিত্য অকাদেমির এই আমন্ত্রণ পাওয়ার পর— ক'দিনের মধ্যে হাতের কাছে রুশ সাহিত্য বাংলা অনুবাদের যে তালিকা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা উল্লেখ করছি। এটা প্রাথমিক কাজ। অনুবাদকদের অনেকেই মূল রুশ থেকে অনুবাদ না করে ইংরেজি থেকে করেছেন। কেউ কেউ একটি বই সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন, কেউবা শুধু একটি-দুটি গল্প, বা একগুচ্ছকবিতা। আবার অনেক অনুবাদ মূল উপন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণ।

১. ইগরগাথা– জগন্নাথ চক্রবর্তী– সারস্বত।
২. পুশকিনের প্রেমের কবিতা– শৈলেন কুমার দত্ত– মডার্ন কলাম।
৩. আলেকসান্দর পুশকিন– পিটারের নিগ্রো– অরুণ চক্রবর্তী।
৪. আলেকসান্দর পুশকিন– ক্যাপটেন কন্যা– পাত্রজ।
৫. আলেকসান্দর পুশকিন– ক্যাপটেন মেয়ে– নীরেন রায়।
৬. নিকোলাই গোগোল– রচনা সপ্তক (মূলরুশ থেকে)– অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।
৭. তুর্গেনেভের গল্প ও কবিতা– অর্ধেন্দু চক্রবর্তী– মডেল পাবলিশিং।
৮. ইভান তুর্গেনেভ– গোধূলির রঙ– ন্যাশনাল্ বুক এজেন্সি।
৯. ইভান তুর্গেনেভ– পিতাপুত্র– (মূলরুশ থেকে)– অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।
১০. ইভান তুর্গেনেভ– শিকারীর রোজনামচা– ভস্তক।
১১. ইভান তুর্গেনেভ– শিকারীর রোজনামচা– বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
১২. ইভান তুর্গেনেভ– প্রথম প্রেম– দীপ প্রকাশন।
১৩. ইভান তুর্গেনেভ– গোধূলির রঙ– ন্যাশনাল পাবলিশার্স।
১৪. ল্যেভ তলস্তোয়– ককেশাসের বন্দী– ঋষি দাস– অশোক প্রকাশন।
১৫. ল্যেভ তলস্তোয়– দুটি বড়ো গল্প–(ইভানইলিচের মৃত্যু, ক্রুইৎজার সোনাটা)– সমর সেন– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
১৬. ল্যেভ তলস্তোয়– তলস্তোয়ের ছোটদের গল্প– খগেন্দ্রনাথ মিত্র– ইউ. এন. ধর।
১৭. ল্যেভ তলস্তোয়– আনা কারেনিনা– গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য– মিত্র ও ঘোষ।
১৮. ল্যেভ তলস্তোয়– ছোটদের জন্য তলস্তোয় ও অন্যান্য– অচিন্ত্য কুমার সাঁতরা– এবং নৈকট্য।

১৯. ল্যেভ তলস্তোয়– ওয়ার এন্ড পীস– অশোক গুহ– এ. কে. সরকার (কিশোর)।
২০. ল্যেভ তলস্তোয়– ওয়ার এন্ড পীস– অশোক গুহ– এ. কে. সরকার।
২১. ল্যেভ তলস্তোয়– রেজারেকশন– অচিন্ত্য কুমার সাঁতরা– এবং নৈকট্য।
২২. ল্যেভ তলস্তোয়– তলস্তোয়ের গল্প সংকলন– মনীষা গ্রন্থালয় প্রা.লি.।
২৩. ল্যেভ তলস্তোয়– তলস্তোয় উপন্যাস সমগ্র (১-৪)– মনীন্দ্র দত্ত– তুলিকলম।
২৪. ল্যেভ তলস্তোয়– তলস্তোয় গল্প সমগ্র– মনীন্দ্র দত্ত– তুলিকলম।
২৫. ল্যেভ তলস্তোয়– শিল্পের স্বরূপ– দীজেন্দ্রলাল নাথ– পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
২৬. ল্যেভ তলস্তোয়– রেজারেকশান– বীরেন্দ্র দত্ত– পুস্তক বিপণি।
২৭. ল্যেভ তলস্তোয়– গল্প সংগ্রহ– বিংশ শতাব্দী।
২৮. ল্যেভ তলস্তোয়– ক্রুয়েৎজার সোনাটা– মডেল।
২৯. ল্যেভ তলস্তোয়– রেজারেকশান– পত্রপুট।
৩০. ল্যেভ তলস্তোয়– শয়তান– বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়– পুথিপত্র।
৩১. ল্যেভ তলস্তোয়– বিপ্লবের আহুতি– চিরায়ত।
৩২. ল্যেভ তলস্তোয়– কশাক– গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য– চিরায়ত।
৩৩. ল্যেভ তলস্তোয়– তলস্তোয়ের ছোট গল্প– (মূলরুশ থেকে)– অরুণ সোম– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
৩৪. ল্যেভ তলস্তোয়– শিশুকাহিনী– ভস্তক।
৩৫. ল্যেভ তলস্তোয়– শিশুকাহিনী– র‍্যাডিক্যাল।
৩৬. ল্যেভ তলস্তোয়– শিশুকাহিনী– ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
৩৭. ল্যেভ তলস্তোয়– জীবিত শবদেহ– ঝরা বসু– প্রমা।
৩৮. ল্যেভ তলস্তোয়– আনা কারেনিনা– দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়– নাথ ব্রাদার্স।
৩৯. ল্যেভ তলস্তোয়– কশাক– সমর সেন– ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
৪০. ল্যেভ তলস্তোয়– ককেশাসের বন্দী– পত্রলেখা।
৪১. ফিওদর দস্তইয়েভস্কি– ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট– সুধীন্দ্র নাথ রাহা– দেবসাহিত্যকুটির (কিশোর)।
৪২. ফিওদর দস্তইয়েভস্কি– বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত (মূলরুশ থেকে)– ননী ভৌমিক– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
৪৩. ফিওদর দস্তইয়েভস্কি– অপরাধ ও শাস্তি (মূলরুশ থেকে)– অরুণ সোম– সাহিত্য আকাদেমি।
৪৪. ফিওদর দস্তইয়েভস্কি– দস্তইয়েভস্কির ছোট গল্প (মূলরুশ থেকে)– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
৪৫. আন্তন চোখভ– চোখভের সেরা প্রেমের গল্প– রূপা।
৪৬. আন্তন চোখভ– চোখভের প্রেমের গল্প– অসিত সরকার– রূপা।
৪৭. আন্তন চোখভ– চোখভের নির্বাচিত গল্প– সরোজ কুমার দত্ত– পত্রলেখা।

৪৮. আন্তন চেখভ- গল্প ও ছোট উপন্যাস- বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনালয়, মস্কো।

৪৯. আন্তন চেখভ- চেখভের ছ'টি একাঙ্ক- অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়- ভূপাবলী।

৫০. আন্তন চেখভ- চেখভের গল্প সংকলন- বিনয় মজুমদার- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৫১. ম্যাক্সিম গোর্কি- একদিন যারা মানুষ ছিল- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৫২. ম্যাক্সিম গোর্কি- গল্প সংগ্রহ- বিংশ শতাব্দী।

৫৩. ম্যাক্সিম গোর্কি- গোর্কি রচনাবলী (১-৪)- রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন।

৫৪. ম্যাক্সিম গোর্কি- গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প- কথা ও কাহিনী।

৫৫. ম্যাক্সিম গোর্কি- ডেকাডেন্স- পত্রপুট।

৫৬. ম্যাক্সিম গোর্কি- পৃথিবীর পথে- সত্য গুপ্ত- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৫৭. ম্যাক্সিম গোর্কি- পৃথিবীর পাঠশালা- সত্য গুপ্ত- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৫৮. ম্যাক্সিম গোর্কি- বিপ্লব, বিদ্রোহ, ভালোবাসা- মডার্ন কলাম।

৫৯. ম্যাক্সিম গোর্কি- মা- মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।

৬০. ম্যাক্সিম গোর্কি- শ্রেষ্ঠ গল্প- মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।

৬১. ম্যাক্সিম গোর্কি- পৃথিবীর পাঠশালায়- নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

৬২. ম্যাক্সিম গোর্কি- মা- দীপায়ন।

৬৩. ম্যাক্সিম গোর্কি- মা- নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়- ভারতী।

৬৪. ম্যাক্সিম গোর্কি-ম্যাক্সিম গোর্কির ছোট গল্প- (মূল রুশ থেকে) শুভেন্দু সরকার- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৬৫. ম্যাক্সিম গোর্কি-নানা লেখা- সরোজ কুমার দত্ত- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৬৬. ম্যাক্সিম গোর্কি- মা- পুষ্পময়ী বসু- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৬৭. ম্যাক্সিম গোর্কি-আমার ছেলেবেলা- সত্যগুপ্ত- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৬৮. ম্যাক্সিম গোর্কি-তিড়িক তিড়িক চড়ুই (মূলরুশ থেকে)- অরুণ সোম- মনীষা।

৬৯. ম্যাক্সিম গোর্কি-শীতদানবের পুরী (মূলরুশ থেকে)- অরুণ সোম- রাদুগা, তাশখন্দ।

৭০. ম্যাক্সিম গোর্কি- তিনজনা- (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম- প্রগতি।

৭১. ম্যাক্সিম গোর্কি- গোর্কি রচনাবলী (১-৪)- সম্পাদনা- কাঞ্চনবসু- রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন।

৭২. ম্যাক্সিম গোর্কি-গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প- অসিত সরকার- কথা ও কাহিনী।

৭৩. ম্যাক্সিম গোর্কি- পৃথিবীর পাঠশালায়- রবীন্দ্র সরকার- প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৭৪. ম্যাক্সিম গোর্কি-ইতালীর রূপকথা (মূলরুশ থেকে) ননী ভৌমিক- বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনালয়-মস্কো।

৭৫. ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি-মায়কোভ্স্কি শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মুকুল গুহ, সিদ্ধেশ্বর সেন- দে'জ পাবলিশিং।

৭৬. ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি-স্মৃতি- নীহাররঞ্জন রায় এবং জলার্ক।

৭৭. ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি-মায়কোভ্স্কি ডায়েরি- কার্তিক লাহিড়ী- অনুষ্টুপ।

৭৮. ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি-এলসা ত্রিয়োলে- অরুণ মিত্র- প্রমা।

৭৯. ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি- কবিতা কিভাবে তৈরি হয়- উদয় ভাদুড়ী- অনুষ্টুপ।

৮০. ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি-মায়কোভ্স্কির কবিতা- সিদ্ধেশ্বর সেন- মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।

৮১. ইভান বুনিন-ছায়াবীথি- সমর সেন- প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৮২. ইভান বুনিন-ছায়াবীথি- সমর সেন- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৮৩. মিহাইল শলোখভ- প্রশান্ত দন (৪ খন্ড) (মূলরুশ থেকে)- অরুণ সোম- প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৮৪. মিহাইল শলোখভ- শলোখভের নির্বাচিত গল্প- নিমাই দাস- ডেল্টা- ফার্মা (কিশোর)।

৮৫. মিহাইল শলোখভ-অদৃষ্ট ও অন্যান্য গল্প- দীপায়ন।

৮৬. মিহাইল শলোখভ-কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৮৭. মিহাইল শলোখভ- ধীরপ্রবাহিনী ডন- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৮৮. মিহাইল শলোখভ- প্রথম যুগের গল্প- বিংশ শতাব্দী।

৮৯. আন্না আখমাতোভা-কান্না ভাঙা গান- কৌশিক গুহ- স্ত্রী।

৯০. সির্গেই আইজেনস্তাইন-অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি- তপন দাস- বাকশিল্প।

৯১. স্তানিস্লাভস্কি-অভিনেতার চরিত্র নির্মাণ- ব্রজসুন্দর দাস- জাতীয় সাহিত্য।

৯২. সামুইল মারশাকের ছড়া-(মূলরুশ থেকে) শুভেন্দু সরকার- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৯৩. বরিস পলেভয়- শেষ বিচার- বিংশ শতাব্দী।

৯৪. বরিস পলেভয়-মানুষের মতো মানুষ- সমর সেন- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৯৫. বরিস ল্যাভরেনিয়ভ-ফর্টিফার্স্ট- গ্রন্থগৃহ।

৯৬. রুশী রূপকথা-তৃপ্তি ব্রহ্ম- সাহিত্য বিহার।

৯৭. রুশদেশের উপকথা-ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৯৮. ভ্লাদিমির আরসিনিয়েভ-দেরসুডি জালা- প্রদীপ দাশগুপ্ত।

৯৯. নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি-ইস্পাত- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

১০০. নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি-ইস্পাত- আদারবুক।

১০১. নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি-ইস্পাত- রবীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদনা অরুণ সোম- রাদুগা, তাশখন্দ।

১০২. আর্কাদি সাইগার-চুক আর সেক- ভস্তক।

১০৩. আর্কাদি সাইগার-নীলপেয়ালা- প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

১০৪. আলেকসান্দর কোনদ্রাতভ-তিন মহাসাগরের প্রহেলিকা- বিংশ শতাব্দী।

১০৫. ইলিয়া এরেনবুর্গ-পারীর পতন- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

১০৬. ইলিয়া এরেনবুর্গ-লেখক ও তার শৈলী- কালীদাস রক্ষিত- অগ্রণী বুক ক্লাব।

১০৭. ল. কসমোদিমিয়ানস্কায়া–জয়া ও শুরার কথা– শেফালি নন্দী।

১০৮. সোভিয়েত প্রাচ্যের দশটি গল্প–সমর সেন– ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

১০৯. ভাসিলি ইয়ান– চেঙ্গিজ খান– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

১১০. পি. কাদিরভ–বাবর– ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

১১১. আলেক্সি বেলায়েভ–উভচর মানুষ– ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

১১২. মারিনা স্বেতায়েভার কবিতা– কৌশিক গুহ– লীলা।

১১৩. নিকোলাই নাসোভ–ভিতিয়ার কান্ড– শেফালি নন্দী– পিপলস্ বুক সোসাইটি।

১১৪. বরিস পাস্তেরনাক–ডা. জিভাগো– বুদ্ধদেব বসু।

১১৫. বরিস পাস্তেরনাক–কবিতাগুচ্ছ– বিপ্লব মাজী– প্রকাশনা।

১১৬. আলেকসান্দ্র সোল্জেনিৎ সিন–ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন– সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১১৭. আলেকসান্দ্র সোল্জেনিৎ সিন–ক্যানসার ওয়ার্ড (১-২)– সুনীতি ভট্টাচার্য– অপর্ণা।

১১৮. আলেকসান্দ্র সোল্জেনিৎ সিন–শিকড়ের সন্ধানে– প্যাপিরাস।

১১৯. আলেক্সেই তলস্তোয়–গরিবের মারণরশ্মি– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২০. কনস্তানতিন সিমোনভ–জীবিত ও মৃত– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২১. চেঙ্গিজ আইৎমাতোভ–পাহাড় ও স্তেপের আখ্যান– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২২. চেঙ্গিজ আইৎমাতোভ–বিদায় গুলসারি!– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২৩. চেঙ্গিজ আইৎমাতোভ–জামিলা– খালেদ চৌধুরী– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২৪. সির্গেই আলেকসেই–রুশ ইতিহাসের কথা ও কাহিনী– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২৫. নিকোলাই নাসোভ–অনোড়ির কান্ড কারখানা– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২৬. আলেকসান্দ্র কুপ্রিন–কুপ্রিনের ছোটগল্প– (মূলরুশ থেকে) অরুণ সোম– রাদুগা, তাশখন্দ।

১২৭. মিহাইল শাৎরভ–লাল ঘাসে নীল ঘোড়া– সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১২৮. পঞ্চাশজন সোভিয়েত কবি–হায়াৎ মামুদ– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

১২৯. রুশ গল্প সংকলন (মিহাইল, শলোখভ, সির্গেই আন্তোনভ, ইউরি নাগিবিন, ভ্যালেরি ওসিপভ, ইউরি কাজাকভ, কনস্তানতিন পাউস্তোভ্স্কি)– (মূলরুশ থেকে) ননী ভৌমিক– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

১৩০. ওঝলাস সুলেমেইনভ– রোগা ঈগল– সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১৩১. এফগেনি এফতুশেঙ্কো–জিমাজংশন– অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী– কবিতীর্থ।

১৩২. নতুন দিনের রুশ কবিতা–মণীন্দ্র রায়– মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।

১৩৩. আজারবাইজানের কবিতা–বীতশোক ভট্টাচার্য– সারস্বত।

১৩৪. রসুল গামজাতোভের কবিতা–পিনাকীনন্দন চৌধুরী– মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।

এ তালিকা অসম্পূর্ণ। এর বাইরে আরো অনেকেরই অনুবাদ রয়েছে স্বাভাবিক, বিশেষত রুশ-ভারত মৈত্রী পর্বে।

বই প্রকাশিত না হলেও, বাংলাভাষার বিশিষ্ট কবি, লেখকরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রুশ কবিদের কবিতা ও গল্প, উপন্যাস অনুবাদ করেছেন। পত্রপত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন সংকলনে গ্রথিত করেছেন। তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরকম:

১. বুদ্ধদেব বসু– ডা. জিভাগো উপন্যাসে বরিস পাস্তেরনাকের একগুচ্ছ কবিতা অনুবাদ করেছেন।

২. বিষ্ণু দে– লুই জুকোভস্কি, মিহাইল ল্যেরমেনতভ, নিকোলাই আলেকসেইভিচ নেক্রাসভ, বরিস পাস্তেরনাক, ইলিয়া গ্রিগরিয়েভিচ এরেনবুর্গ, নিকোলাই তিখোনভ, কনস্তানতিন সিমোনভ-এর কবিতা।

৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র– আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি, ওসিপ মান্দেলস্তাম-এর কবিতা।

৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়– আলেকসান্দর ব্লক, আলেকসান্দর সোলজেনিৎ সিন, রর্বেত রোজদেস্তাভনস্কি-র কবিতা।

৫. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়– ইগরকথা।

৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়– অন্যদেশের কবিতা সংকলনে আলেকসান্দর ব্লক, আন্না আখমাতোভা, বরিস পাস্তেরনাক, ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি, সের্গেই এসেনিন, এফগেনি এফতুশেঙ্কো, আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি-র কবিতা।

৭. বিমল চন্দ্র ঘোষ– ইয়েভগেনি ভিনোকুরভর কবিতা।

৮. মণীন্দ্র রায়– বেলা আখমাদুলিনার কবিতা।

৯. তরুণ সান্যাল– আলেকসান্দর ব্লক, সের্গেই এসেনিন, আলেকসান্দর পুশকিন, মিখাইল ল্যেরমনতভ, মায়কোভ্স্কি, কনস্তানতিন সিমোনভ-এর কবিতা।

১০. সৌমেন্দ্র ঠাকুর– পুশকিনের কবিতা।

১১. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– পুশকিনের কবিতা।

১২. কামাক্ষ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়– পুশকিনের কবিতা।

১৩. চিত্ত ভট্টাচার্য– পুশকিনের কবিতা।

১৪. অমিয় চক্রবর্তী– বরিস পাস্তেরনাক-এর কবিতা।

১৫. বিনয় মজুমদার– পুশকিনের কবিতা।

১৬. দেবী রায়– এফতুশেঙ্কোর কবিতা।

১৭. সোমক দাস–পাস্তেরনাক-এর কবিতা।

১৮. সুব্রত মজুমদার- ইরিনা ফ্রালোবস্কিয়া ও কৈশান কুলিয়েভের কবিতা।

১৯. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়- আইজাক বেবেল-এর গল্প।

২০. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- পুশকিনের গল্প, গোগলের গল্প।

২১. অসীম কৃষ্ণ দত্ত- এফগেনি এফতুশেঙ্কোর কবিতা।

২২. অরুণ মিত্র- লেনিনের কবিতা।

২৩. কমলেশ সেন- যোশেফ স্তালিনের কবিতা।

২৪. কাজল চক্রবর্তী- আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কির কবিতা।

২৫. কিরণ শঙ্কর মৈত্র- মুসা জলিল, মার্গারিতা অ্যালিঘের, কৈশিন কুভিয়েভ, রসুল গামজাতভের কবিতা।

২৬. রেবা ঘোষ- মিখাইল লেরমনতভ।

২৭. বিপ্লব মাজী- আলেকসান্দর ব্লক, আননা আখমাতোভা, এফগেনি এফতুশেঙ্কো, আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি, বেলা আখমাদুলিনা, বরিস পাস্তেরনাক, রর্বেত রোজদেস্তভেনস্কি, ভ্লাদিমির মায়কোভ্স্কি-র কবিতা।

২৮. অর্ধেন্দু চক্রবর্তী- ইভান তুর্গেনেভের গল্প।

২৯. পূরবী রায়- মারিস চাকলইস-এর কবিতা।

৩০. অরুণা হালদার- গোপাল হালদার-এর *রুশসাহিত্যের রূপরেখা* বই-এ রুশকবিদের কবিতাসমূহের অনুবাদ অরুণা হালদার করেন।

বাংলা পরিভাষা: সমস্যা ও ইতিহাস

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা পরিভাষার সমস্যা বহুদিন থেকে প্রচলিত একটি জটিল সমস্যা। সমস্যাটি শুধুমাত্র ব্যক্তির সমস্যা নয়, সমাজগত সমস্যাও বটে। সাধারণভাবে এমন শোনা যায় যে, পরিভাষা অত্যন্ত কঠিন হয়; তাকে সহজ করা প্রয়োজন। শুধু বাংলা পরিভাষাই নয়, প্রায় সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই পরিভাষাগত সমস্যা দেখা যায়। পরিভাষার সমস্যা হল নতুন শব্দসৃষ্টির সমস্যা। বাংলা ভাষায়ও নতুন শব্দ গঠনের নিয়ম আছে। নতুন শব্দের গঠন নির্ভর করে তিনটি প্রবণতার উপর— ক. ভাষার প্রাণশক্তি, খ. ভাষা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও উদ্ভাবনী শক্তি, গ. অন্য ভাষা তথা অন্য ভাবধারার প্রভাব। নতুন শব্দ ব্যবহারের অন্তরালে পরিবার,সমাজ, ভাষাগোষ্ঠীর জীবন পরিবেশ, চিন্তা-ভাবনার জগতে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন ভাবের উদ্বোধন ও তার সঞ্চার ইত্যাদি ক্রিয়াশীল থাকে। যদি কোনো জাতি রক্ষণশীল হয় তবে নতুন শব্দ ব্যবহারে সে তত তৎপর হয় না। পরিভাষা-সমস্যা শুধু নতুন শব্দসৃষ্টির সমস্যা নয়, সমস্যা হল গ্রহণীয় ও সহনীয় করে তোলার সমস্যা।

পরিভাষা সম্পর্কিত ভূমিকার পর প্রশ্ন উঠবে— পরিভাষা কী? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের আশ্রয় নিতে হয় 'চলন্তিকা'-প্রণেতা রাজশেখর বসুর যিনি বলেছিলেন: 'অভিধানে পরিভাষা অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণ 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।' তাঁর মতে: 'পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই। আলংকারিকদের কথায় বলা যেতে পারে পরিভাষার অভিধা শক্তি আছে; কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নেই, পরিভাষা ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। পরিভাষা বলতে বোঝানো হয় কোন জ্ঞানক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞা; আর শব্দ বলতে বোঝানো হবে যে কোনো ভাষার রূপমূলীয় উপাদানের সমাহার। পরিভাষা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন সমন্বয় ও সম্মতি। পরিভাষার সমস্যা নতুন শব্দসৃষ্টির সমস্যা। নতুন কোনো বস্তু বা কোনো ধারণার আবির্ভাব হলে নতুন ধ্বনি সংকেতের প্রয়োজন হয়। এই ধ্বনি-সংকেতের যে কোনো নামই হোক্ না কেন তাকে নতুন চেতনার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করবার সমস্যা আছে। বাংলা ভাষায় এই সমস্যার সমাধান করতে হলে তার ধ্বনিগত ও অর্থগত দিক থেকে তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। সমান্তরাল শব্দ সৃষ্টি করে তার মধ্যে মূল পরিভাষার অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। তাছাড়াও দেখতে হবে, নবসৃষ্ট

শব্দ থেকে অর্থটি অনুধাবন করা যাচ্ছে কি না। পরিভাষা সৃষ্টির সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিন ঘটে। অনেকদিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হোলো। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বারবার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।' খটকা লাগা, অসঙ্গত এবং সঙ্গতি লাভ করা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মনে করেছেন, অপরিচিত বলে এগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করা নিয়ে বেকায়দায় পড়তে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংস্কৃত পরিভাষার ইতিহাস আলোচনা করে পরিভাষা গঠনে সাংগঠনিকতার তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তিনি মনে করেছেন, পরিভাষা নির্মাণে সুবিধা, সরলতা ও শ্রুতিসুখকরতা থাকা উচিত। তিনি বলেছেন, প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত ছিল তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সহজ কথায় পরিভাষা সৃষ্টি, নতুন শব্দ সৃষ্টি করা সাংগঠনিকতার প্রতীক। কিন্তু যদি কেউ সেই পরিভাষা গ্রহণে ব্যবহারে অনিচ্ছুক, অস্বীকৃত হন, তাহলে সে সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? নবসৃষ্টিকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া যদি উদ্ভাবিত হয় তাহলে সমস্যার জটিলতা হ্রাস পাবে বলে মনে হয়।

বিজ্ঞান, মানববিদ্যা ও কারিগরি বিদ্যায় উন্নত আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলিতে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্ট ও উদ্ভাবিত হওয়ায় শব্দের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঐ সমস্ত উন্নত দেশের ভাষা আনীত হচ্ছে। সমাজে এই সমস্ত শব্দ পরিচিতি অর্জনের চেষ্টা করলেও তা অনেক সময় সমাজ বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে। উন্নত দেশের ধারণা উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত দেশে আসছে, অথচ ঐসমস্ত ধারণাবাহী শব্দ অপরিচয়ের ব্যবধান দূর করে সমাজে সর্বসাধারণ্যে গৃহীত হচ্ছে না। সমাজতাত্ত্বিক ভাষাবিদ্‌রা মনে করেন যে, এর পটভূমিকায় রয়েছে দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ। অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক শোষণের কথাও উঠবে।

আমাদের দেশে বিদেশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌঁছানোর পর পরিভাষা বিষয়ক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্যাকরণ, অভিধান রচনার কালে, অনুবাদ ও অন্যভাষায় কাহিনি রূপান্তরের কালে পরিভাষা সৃষ্টির সমস্যার আবির্ভাব হয়। উইলিয়াম কেরী, ফেলিক্স কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য তাঁরা যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেননি, এমন নয়; তবে তাঁদের চিন্তা প্রণালীবদ্ধ হয়ে

আমাদের সামনে আসেনি। ফলে পরিভাষার সমস্যা, ইতিহাস ইত্যাদিকেন্দ্রিক কোনো তথ্য আমাদের হস্তগত হয়নি। স্কুল বুক সোসাইটি, দি সোসাইটি ফর ট্রানস্লেটিং ইউরোপিয়ান সায়েন্স, শ্রীরামপুর মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড জন ম্যাক নামে এক শিক্ষক আসেন শ্রীরামপুর কলেজে। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রও ভালোবাসতেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজে রসায়নবিদ্যা প্রবর্তন করলেন এবং উইলিয়াম কেরীর আদর্শে শিক্ষকতার প্রয়োজনে বাংলা শেখেন। কলেজে তিনি ইংরাজি, বাংলা উভয় ভাষাতেই পড়াতেন। তিনি ছাত্রদের কাছে যে বক্তৃতা দিতেন তার নোট রাখতেন। সেই নোটই 'কিমিয়া বিদ্যার সার' নামে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি পরিভাষা সমস্যার মুখোমুখি হন। ফেলিক্স কেরীও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনিও 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাভিধান' অর্থাৎ এ্যানাটমির পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। ফেলিক্স কেরী পরিভাষা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফেলিক্স কেরী মনে করতেন পরিভাষা সৃষ্টিতে সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব হলে নতুন পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ করা চলে। ফেলিক্স কেরীর রচনায় ব্যবহৃত পরিভাষার কিছু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। যেমন: Anatomy – ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। Solid – ঘন। Liquid – দ্রব। Muscle – মাংসপেশী। Nerve – নাড়ী। Vein – শিরা। Surgery – অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা। Pharmacy – ঔষধনির্মাণবিদ্যা ইত্যাদি। [দ্রঃ গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: নবেন্দু সেন।] ফেলিক্স কেরী তাঁর 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' গ্রন্থে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টিতে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন: Anarchy – অপ্রভুত্ব। Aristocracy – কুলীন প্রভুত্ব। Board of Trade – বাণিজ্য নিমায়ক সভা। Chairman – সভাপতি। Despotism – একাধিপত্য। Elector – মনোনীতকর্তা, পসন্দকর্তা। Militia – লৌকিকসৈন্য। Parliament – মহাসভা ইত্যাদি।

ফেলিক্স কেরীর পঁয়ত্রিশ বছর পরে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে পরিভাষা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি নর্মাল স্কুলের প্রধানশিক্ষক থাকাকালীন ছাত্রদের পাঠদানকালে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে পরিভাষা সমস্যার সম্মুখীন হন। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন: 'পদার্থবিদ্যা, সমাপ্ত হইলে আপনার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্রবিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই, একে নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সংকলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যাসাধ্য যত তাহা আপনার অবিদিত নাই, যেরূপ বলবীর্য্যবিহীন প্রকৃতি, তাহাতে এ সকল বিষয়ে কোনো মতেই সাহস করা যায় না।' লক্ষণীয় বিষয় এই

যে, এ চিঠি তিনি লিখছেন ১৮৫৬-তে তাঁর পদার্থবিদ্যা প্রকাশের পর।

অক্ষয়কুমার দত্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে পরিভাষাগুলি সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেনি এবং তিনি এর অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির সমস্যায় তিনি বুঝেছিলেন 'নূতন ভাষায় নূতন শব্দ, সংকলনের সমস্যা।' ফেলিক্স কেরী ও অক্ষয়কুমার দত্তের পঁচিশ বছর আগে 'বিদ্যাহারাবলি' (সংস্কৃত ভাষায় রচিত) রচনাকালে লিখেছিলেন: 'অমর, হেম, মেদিনী, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অদ্যাবধি পরিভাষা নির্মিত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষ সমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দ সকলের মিলনের দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমল বুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন। এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্যাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের ও সজ্জনগণের সম্মত, প্রসিদ্ধ বোধগম্যরূপে পরিবর্তিত করিবেন। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদগত বিষয় ও তাহার বিশেষ জানিয়া, তাহারা আমাকে ও অন্যান্যকে অবশ্যই পরমানন্দিত করিবেন।' [দ্র: গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: নরেন্দ্র সেন।] অক্ষয়কুমার দত্ত মূলত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে তাঁর পরিভাষা মূলত বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়।

(ক) যেমন: Magnet – চুম্বক। Solid – কঠিন। Microscope – অনুবীক্ষণ যন্ত্র। Botany – উদ্ভিদবিদ্যা। Physiology – শরীর বিদ্যা। Chemistry – রসায়নবিদ্যা। Electricity – তড়িৎ। Telescope – দূরবীক্ষণ। Compass – দিগদর্শন। Astrology – জ্যোতিষ। Meteorology – মানমন্দির। [এগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা।]

(খ) Planet – গ্রহ। Lake – হ্রদ। Valley – উপত্যকা। Fog – কুজ্ঝটিকা। South Pole – কুমেরু। North Pole – সুমেরু। Coral – প্রবাল। Solar Rainbow – সৌররামধনু। [এগুলি ভূগোলবিষয়ক পরিভাষা।]

(গ) Type – অক্ষর। Table – অঙ্কন্যাস। Historian – ইতিহাস বেত্তা। Benevolence – উপচিকীর্ষা। Eventuality – ঘটনানুভাবুকতা। Lust for life – জিজীবিষা। ইত্যাদি [এগুলি সাধারণ পরিভাষা।]

এছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত এমন অনেক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন যেগুলি তাঁর পূর্ববর্তী ফেলিক্স, কেরী ও জনসন অপেক্ষা অনেক মৌলিক। 'অক্ষয়কুমারের পূর্বে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও পরিভাষা-নির্মাতা হিসাবে অক্ষয়কুমারের একটি স্বতন্ত্র স্থান বাংলা ভাষার ইতিহাসে অবশ্যই আছে।' [গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: নরেন্দ্র সেন]

মনে হয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রই প্রথম পরিভাষা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা গভর্নমেন্ট কলকাতা মেডিকেল কলেজের জন্য বাংলাভাষায় পুস্তক প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির সদস্যরূপে ২৭ জুলাই ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় পরিভাষা রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ইংরাজিতে উক্ত প্রবন্ধে তিনি লেখেন: 'The language of a nation in its intellectual atmosphere; and we can not interface with it to any large extent without serious consequences. This interference is to be apprehended, first from want of idiomatic propriety; and second, from the manner in which we load it with a large numbers (in the case of medical works at the lower computation about thirty thousand) of technical terms new to it.' [পুনরুদ্ধৃত: রাজেন্দ্রলাল মিত্র: অলোক রায়। ১৯৬৯।]

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সারস্বত সমাজের সভাপতি রূপে পরিভাষা প্রণয়নের কতকগুলি নীতির কথা বলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উক্ত বক্তব্যের বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সূত্র উপস্থাপিত করেন: অনেক সময় সাধারণ শব্দ পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও সাধারণ শব্দগুলির প্রত্যেটিরই দেশিয় প্রতিশব্দ আছে। এমন অনেক শব্দ আছে যা সাধারণ বা বিশেষ বুঝে ওঠা যায় না; সেখানে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হবে অথবা শব্দসৃজন করতে হবে। বিভিন্ন বস্তুর বৈজ্ঞানিক নাম হুবহু গ্রহণ করতে হবে। বহু শব্দকে তিনি গ্রহণ করার, অনুবাদ করার, উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিভাষা তিনি অবিকল গ্রহণের জন্য বলেছেন।

বিপিনবিহারী দাস (১৮৫২-১৮৮২) এমন অনেক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন যা পরবর্তীকালে গ্রহণযোগ্য হয়নি। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি সহজেই বোধগম্য হবে। যেমন— Hydride – আবায়জ। Nitric – যাবক্ষারিক। Phosphite – প্রস্ফুরফরাম্লজ ইত্যাদি।

বাংলা পরিভাষা সৃজনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) অবদান অনস্বীকার্য। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ (প্রায় পাঁচটি) লিখেছেন সেগুলি দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পরিভাষা তত্ত্ব; দ্বিতীয়ত, পরিভাষার যাথার্থ্য। রাসায়নিক পরিভাষা কীভাবে সৃষ্ট হওয়া উচিত সেকথাও বলেছেন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: 'যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ স্পষ্ট তাৎপর্য থাকে। প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে। সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দ প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।' পরিভাষার সমস্যা যে নতুনশব্দ সৃষ্টির সমস্যা সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন: 'জ্ঞানবৃদ্ধি

সহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতনভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সংকলন করিতে হয়, নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়।' তিনি এতথ্যও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদে যতদূর সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল ততদূর সাবধান হওয়া যায়নি। তিনি এ কাজটিকে অত্যন্ত দুরূহ বলে মনে করেছেন। তিনি জানতেন যে বিজ্ঞানের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; বিজ্ঞানের ভাষা অন্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর মতে: 'বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা না হইলে বিজ্ঞান পুষ্টি লাভ করে না; অঙ্গে বল পায় না; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় বিজ্ঞানের উন্নতি যেমন প্রতিভা দ্বারা সাধিত হইয়াছে বিজ্ঞানের ভাষা সংগঠনেরও সেইরূপ সময়ে সময়ে অসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত হইয়াছে।' তিনি অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে বিজ্ঞানের ভাষা ও বিজ্ঞানের উন্নতির মধ্যবর্তী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ইতিহাসের কথা বলেছেন। পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের কোনো ছুঁৎমার্গ ছিল না। শব্দগ্রহণে তাঁর মনোভঙ্গি যথেষ্ট উদার ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং বলেছেন: 'বোধ করি কোনো ভাষাতে এমন কোনো শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত ভাষার অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করি না— এমন পণ ধরিয়া বসার কোনো প্রয়োজন দেখি না।' তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সংস্কৃত শব্দ গ্রহণের কথা বলেছেন এবং গ্রীকভাষা থেকে ইংরাজী শব্দগ্রহণের প্রসঙ্গ আনয়ন করেছেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের ভাষা সার্বোভৌম হওয়া উচিত এং বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশ বা জাতিগত ভেদের সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়। সর্বাংশে সঙ্গতিযুক্ত সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পরিভাষা প্রণয়নও যে অসম্ভব, একথা তাঁর অজানা ছিল না। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ত্রিবেদী উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরিভাষায় স্থায়িত্ব গুণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত: 'পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ; উহা কল্পিত ভাষা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত ভাষা। স্থিতিশীলতা ভাষামাত্রেরই সর্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য। ভাষা নিত্যপরিবর্তনশীল হইলে তাহাকে আর ভাষা বলা চলে না। নিত্য পরিবর্তনশীল ভাষায় মানুষের কাজ চলে না। অধিকন্তু উহা একটা যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং পরিভাষা স্থায়ী হওয়া আবশ্যক।' পরিভাষা সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যদিও পরিভাষা কিভাবে নির্মিত হবে সে সম্বন্ধে তিনি কোনো বক্তব্য রাখেননি, তবু একথা সত্য যে তাঁর পরিভাষা সম্পর্কিত যুক্তি ও প্রতিযুক্তি চিন্তা-ভাবনায় পরবর্তীকালে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। পরিভাষা সম্পর্কিত সুদীর্ঘ আলোচনার পরে উপসংহারে তাঁর বক্তব্য: 'পারিভাষিক নামের অধিকাংশই খেয়ালের উপর আবিষ্কৃত সুতরাং তাহাদের কোনো সার্থকতা নাই। *** আমাদের দেশে এ পর্যন্ত পরিভাষা সংকলনের যে কিঞ্চিত চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে নামের সার্থকতার জন্য একটা উৎকট প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এ কার্যের জন্য এতটা

পরিশ্রমের কোনো দরকার ছিল না। পারিভাষিক নামের সার্থকতা থাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই— একথাটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থেকে পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন উদ্দীপনাময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তেমনি তিনি স্বয়ং বহু পরিভাষা সৃষ্টি করে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায়ে পরিভাষার তত্ত্ব অর্থাৎ নতুন শব্দ সৃজনের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর 'শব্দতত্ত্বের অন্তর্গত 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধেও তিনি শব্দসৃজনের তত্ত্বগত নির্দেশ প্রদান করেছেন: 'ভাষার প্রকৃতির মধ্যে একটা গৃহিণীপনা আছে। নতুন শব্দ বানাবার সময় অনেক স্থলেই একই শব্দে কিছু মালমসলা যোগ করে কিংবা দুটো তিনটে শব্দ আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়, নইলে তার ভাণ্ডারে জায়গা হত না। এই কাজে সংস্কৃত ভাষার নৈপুণ্য অসাধারণ ব্যবস্থা-বন্ধনের নিয়মে তার মতো সতর্কতা দেখা যায় না। বাংলা ভাষার নিয়মের খবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলি নির্মাণ রীতি বানিয়েছে।' তিনি সমাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিত্ব শব্দ, জোড়া শব্দ ইত্যাদি শব্দরীতির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রীতি অনুসারে বেশ কয়েকটি নতুন শব্দ নির্মাণও করেছেন। এই সমস্ত সৃজিত শব্দের অনেকগুলি সাধারণ ব্যবহারের অন্তর্গত। নমুনা:

Non-resident – অনাবাসিক। Association – অনুষঙ্গ। Tradition – ঐতিহ্য। Progressive – প্রাগ্রসর। Juvinility – তরুণিমা। Driving – প্রণোদন। A Copy – প্রতিলিপি। Conversation – সংলাপ। Lithograph – মুদ্রালিপি। Model – প্রতিমান। Filtering – পরিস্রবণ। Accidental – আকতিক দুর্ঘটনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগের ফলে বাংলায় ধারাবাহিক, প্রণালীবদ্ধভাবে পরিভাষা সংকলন, আলোচনার সূত্রপাত হয়। পরিভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পরিণত হয়। নানা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকে সংগঠিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পরিষদের উদ্যোগের মূল্যায়নকালে রাজশেখর বসু 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় বলেছেন: 'এদেশে বহু বৎসর থেকে পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা হয়ে আসছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দপ্তরে অনেক পরিভাষা সংগৃহীত হয়েছে, 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিভাষা রচনা করেছেন। এই সকল পরিভাষার প্রায় সমস্তই প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রচলিত শব্দ অথবা সংকলয়িতার স্বরচিত সংস্কৃত শব্দ। *** একই ইংরেজি শব্দের নানা প্রতিশব্দ হয়েছে, কিন্তু কোনটি গ্রহণযোগ্য তার নির্বাচন হয়নি।'

পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি' 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের 'পরিভাষা সংসদ' গঠিত হয়। নানা সংস্থা পরিভাষা

নির্মাণের উদ্যোগে ব্রতী হয়। ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিভাষা নির্মাণের সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে বলেছেন: 'বাঙ্গালা ভাষা এখন সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্য সরকারী ভাষা *** সরকারী কাজের জন্য, বিভিন্ন বিভাগের কৃত্য ও কর্মচারীদের ইংরেজি নামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা নামের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল পর হইতেই স্বর্গত রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিচালনায়, বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'পরিভাষা সংসদ' এই প্রকার শব্দ চয়ন ও শব্দ গঠনের কাজ করিয়া আসিতেছেন। চারি খণ্ডে রাজ্যের বিভিন্ন কার্যবিভাগে ব্যবহৃত প্রায় ৪০০০ শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বহু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, বহু শব্দ আবার লোকসমাজে গৃহীত হইবার পক্ষে অন্তরায় দেখা দিতেছে। প্রথমত ইংরেজী শব্দটি বিশেষ পরিচিত এবং সর্বজন-ব্যবহৃত শব্দ হইয়া দাঁড়াইবার ফলে, সংস্কৃত শব্দটি সম্ভবত একটু অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সেইজন্য সুপরিচিত ইংরেজী শব্দ কেহ বর্জন করিতে চাহিতেছে না ও পারিতেছে না। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত শব্দটি একটু দুরূহ বা দুরুচ্চার্য্য হইলে তো কথাই নাই —***

তৃতীয়ত, একই ইংরেজী শব্দের জন্য ভারতের একতা সংরক্ষণের তাগিদে ইংরেজী শব্দ বর্জন করা যুক্তি এবং কার্যকরতা উভয় দিক হইতেই সংগত মনে হইতেছে না।'

প্রকৃতপক্ষে, পরিভাষা সৃজন, প্রচার, বহুল ব্যবহার, জনপ্রিয় করার জন্য সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন ভাষাভাণ্ডার থেকে নানা শব্দ গ্রহণ করে পরিভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। উন্নত জাতির পক্ষে যেটা সমস্যা নয়, ঔপনিবেশিক শাসনে দীর্ঘদিন শাসিত দেশে পরিভাষা সৃজন বেশ দুরূহ। অন্যান্য ভাষাভাণ্ডার থেকে শব্দ গ্রহণ করার মতো উদারতা ও সহিষ্ণুতা না থাকলে পরিভাষা ভাণ্ডার সৃষ্টি করা দুরূহ হবে বলে মনে হয়।

UDDALAK
VOL. 11 No. 2

DL. No. 55/JM/03
JULY-DEC 2011

উদ্দালক সাহিত্য প্রকাশনের বই

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত ও সম্পাদি

নেট-সেট বাংলা দ্বিতীয় পত্র : বৈকল্পিক - ৪০০ টাকা
নেট-সেট বাংলা তৃতীয় পত্র : আবশ্যিক - ৩০০ টাকা
রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য - ১০০ টাকা
রক্তকরবী : আলোকিত উদ্ভাসন - ২২৫ টাকা
বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে রবিকিরণে নবরত্ন - ৬০ টাকা

উদ্দালক সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ বিশেষ সংখ্যা :

মধুসূদন-দীনবন্ধু,রবীন্দ্র-উপন্যাস,চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্য, বাঙালির সংস্কৃতি,রবীন্দ্রনাটক, ইত্যাদি এখনো পাওয়া যাচ্ছে।সংগ্রহের জন্য পত্রিকার দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

দপ্তরের ঠিকানা :
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা
কলকাতা-৭০০ ০৪৯
ফোন : ০৩৩-২৫৪১-৪৬১৭

প্রাপ্তিস্থান

দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রজ্ঞাবিকাশ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯